স্মারক গ্রন্থ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৯

মুদ্রাকর : শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ
২৫, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীঅরবিন্দকে জানার শেষ নেই ও শ্রীঅরবিন্দের উপর লেখারও শেষ নেই। "অবঙ্ মানস গোচরা" তবু অনন্তকে জানবার জন্য বোঝবার জন্য অনাদিকাল থেকে মানুষের কত না আকুতি। এ অভিযানের শুরু হয়েছিল কবে থেকে তা জানিনা—তবে এটুকু জানি যে এ অভিযান কোনদিনই শেষ হবে না।

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ শ্রীঅরবিন্দের আদর্শকে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার চেষ্টা চলেছে—কালে সহস্র বা ততোধিক দৃষ্টিভঙ্গি গজিয়ে উঠবে। শ্রীমা বলেছেন—

"পৃথিবীর ইতিহাসের সূচনা থেকে জগতের যে সব মহৎ-রূপান্তর সাধিত হয়েছে, যে কোনরূপে যে কোন নামে তার অধীশ্বর ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ"

স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য হল—বাংলার সুধী সমাজ, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজবিদ, ঐতিহাসিক যাঁরা এক একটি তত্ত্ব নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের চোখে শ্রীঅরবিন্দ কিভাবে ধরা দিয়েছেন তা জানবার ও জানাবার প্রয়াস মাত্র। এখানে মতের মিল বা অমিলের প্রশ্ন নেই—আছে নানা দৃষ্টিভঙ্গির কথা।

আর একটি কথা এখানে না বললে ত্রুটি হবে। যাঁরা এই স্মারক গ্রন্থে লেখা দিয়েছেন তাঁদের সকলের সঙ্গে আমি নিজে দেখা করেছি বা চিঠির মারফৎ অনুরোধ জানিয়েছি এবং তাঁদের লেখা সংগ্রহ করেছি—দেখেছি। এই পুণ্য জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাঙালীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ এক মহৎ সম্ভাবনা দর্শন করেছেন। বাঙালীকেই জগতের শান্তি ও মঙ্গলসাধনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বাংলা যেদিন তার অন্তর দেবতার আভাস পেয়ে জেগে উঠবে সেদিন হবে সে ভবিষ্যত জগতের প্রতিমূর্তি। বাংলার এই অন্তরের শ্রদ্ধা যাতে ওজস্বান ভক্তিতে সার্থক হয় এই প্রার্থনা করে আমরা এই স্মারক গ্রন্থখানি শ্রীঅরবিন্দকে উৎসর্গ করে তুলে দিলাম তাঁর হাতে, যিনি আকৈশোর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দের সেবায় ও সাধনায় সিদ্ধ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, তিনিই নিবেদন করবেন বাংলার এই শ্রদ্ধা শ্রীঅরবিন্দের কাছে।

আমার চেষ্টার পিছনে যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন তাদের নাম নীচে দিলাম—তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীঅমলকুমার বসু	শ্রীনিত্যানন্দ বসু
শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য্য
শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত	শ্রীমানিক মিত্র
শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীপুলক ব্যানার্জি
শ্রীহিমাংশু নিয়োগী	শ্রীঅজিত বসু

শ্রীমতী পূর্ণিমা বসু

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রথম খণ্ড		
শ্রীঅরবিন্দের বাণী		৩
শ্রীমায়ের বাণী		৯
দ্বিতীয় খণ্ড		
নমস্কার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭
অরবিন্দ ঘোষ*	„	২১
বন্দে মাতরম্-এর শ্রীঅরবিন্দ	বিপিনচন্দ্র পাল	২৯
মানস সরোবরে অরবিন্দ	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	৩২
আমার প্রভু শ্রীঅরবিন্দ যেমন তাঁকে দেখেছি	চারুচন্দ্র দত্ত	৩৪
আমার স্মৃতি কথা	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	৩৯
শ্রীঅরবিন্দ	শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৪৪
শিক্ষাবিদ শ্রীঅরবিন্দ	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৪৮
শ্রীঅরবিন্দের-কথা	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৫১
যুগ পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ	প্রমোদকুমার সেন	৬৫
তৃতীয় খণ্ড		
শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭৭
ভারতের স্বাধীনতা ও শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব	স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী	৮৫
ঋষি-দৃষ্টি	ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	৯১
জন্মান্তর ও শ্রীঅরবিন্দ	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৯৮
শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্মজীবন	ডঃ রমেশ মজুমদার	১১০
দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ	ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য	১২৪
শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক তত্ত্ব	শ্রীহিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়	১৩৬

ভারত হৃদয়ারবিন্দ	ডক্টর রমা চৌধুরী	১৫০
'গভীর সুরে গভীর কথা'	গৌরী ধর্ম্মপাল	১৫৭
পূর্ণযোগের তাৎপর্য	অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরী	১৬৮
শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব	ডাঃ দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৮৩
শতবর্ষের প্রণাম (কবিতা)	অধ্যাপক নিমাই বিশ্বাস	২১৪
শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে অভিব্যক্তির স্বরূপ	শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার	২১৫
বর্তমান সঙ্কট ও শ্রীঅরবিন্দ	ডক্টর নারদবরণ চক্রবর্তী	২২৩
শ্রীঅরবিন্দের পুরূরবা উর্বশী কথা	বাণী বসু	২২৮
শ্রীঅরবিন্দ মানস	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়	২৪৫
পত্রাবলীর শ্রীঅরবিন্দ	অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র	২৫৬
বর্তমান সঙ্কটে যুবশক্তির ভূমিকা	শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক	২৬৫
প্রণতি-নিবেদন	শ্রীভোলানাথ শীল	২৭০
শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলাদেশ, একটি সমীক্ষা	শ্রীসঞ্জিব চট্টোপাধ্যায়	২৭২
শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্র দর্শন	শ্রীসবল চট্টোপাধ্যায়	২৭৫
স্বরাজ ও আধ্যাত্মিকতা	শ্রীঅমিয় কুমার মজুমদার	২৮০
বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য	২৮৩
শতাব্দির প্রণাম	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২৯৫
মানুষাং তনুম আশ্রিতঃ	শ্রীমৎ অনির্বাণ	৩০২
শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী শতবার্ষিকা	শ্রীহিমাংশু নিয়োগী	৩০৪

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅরবিন্দের বাণী

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭

১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এদিনে ভারতে একটা যুগের শেষ হল, আরম্ভ হল নূতন যুগ। কিন্তু কেবল আমাদের জন্যেই নয়, এসিয়ার জন্যে, সমগ্র জগতের জন্যে এ দিনের অর্থ রয়েছে। সে অর্থ হ'ল নেশনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা নূতন নেশন-শক্তির আবির্ভাব, অফুরন্ত যার ভবিষ্য সম্ভাবনা, মানবজাতির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ভবিতব্য গঠনে যার থাকবে বৃহৎ অবদান। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এ জিনিষটি নিশ্চয়ই প্রীতিকর যে, যে-দিনটি আমার স্মরণীয় ছিল আমার নিজের জন্মদিন হিসাবে, আমার জীবন-সাধনা যারা গ্রহণ করেছে তারাই যে-দিনটির উৎসব করে এসেছে, ঠিক সেই দিনটি আজ অর্জ্জন করেছে এক বিপুল অর্থ। অধ্যাত্মপন্থী হিসাবে এই যোগাযোগটি আমি কেবল একটা হঠাৎ-যোগ বা আকস্মিক-ঘটনা রূপে গ্রহণ করি না, তা হল যে-কাজ নিয়ে আমার জীবন আমি সুরু করি তাতে ভগবৎশক্তির সম্মতি ও তাঁর অনুমোদনসূচক আশীর্ব্বাদ। এই ভগবৎশক্তির নির্দ্দেশই আমার প্রতিপদ চালিয়ে নিয়েছে। ফলতঃ যে সব জাগতিক আন্দোলনের পূর্ণ সাফল্য আমি দেখে যেতে পারব আশা করেছি, এক সময়ে যাদের মনে হত অসম্ভব স্বপ্ন বলে, আজ দেখছি তারা তাদের গন্তব্যের নিকটে গিয়ে পোঁছেচে, অন্ততঃ তাদের কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে, সাফল্যের পথে উঠেছে গিয়ে।

আজকার এই মহৎ উদ্যোগে আমার কাছে বাণী চাওয়া হয়েছে, কিন্তু বাণী দেওয়ার মত সম্ভাবনা এখন আমার নেই। তবে এক আমি

সকলকে জানাতে পারি আমার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, শৈশবে যৌবনে যারা অঙ্কুরিত হয়েছে, এখন যাদের ফলোদ্গম হতে চলেছে—কারণ ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এইজন্যে যে সে-সব হ'ল আমার মতে ভারতের যা ভবিষ্য কর্ম্ম, যাতে ভারত নেতৃস্থান না গ্রহণ করেই পারে না, তার অঙ্গীভূত। আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলে এসেছি যে ভারতের অভ্যুত্থান, তার নিজের স্থূল স্বার্থসেবার জন্যে নয় কেবল, নিজের প্রসার, মহত্ত্ব, শক্তি সমৃদ্ধি লাভের জন্যে নয়—যদিও এ সকলকে অবহেলা করা তার উচিত হবে না—তবে তার জীবনধারণ হবে ভগবানের জন্যে, জগতের জন্যে, সকল মানবজাতির সহায় ও নেতারূপে। এই সব আশা আকাঙ্খা তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে এইরকম: (১) এক বিপ্লব, যার ফলে ভারতের হবে মুক্তি ও ঐক্য, (২) এসিয়ার পুনরুত্থান ও মুক্তি—মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতি কল্পে একসময়ে তার যে ছিল সুমহৎ অবদান পুনরায় সেই ব্রত গ্রহণ করা, (৩) মানুষের জন্যে একটা নূতন, মহত্তর, উজ্জ্বলতর, উন্নততর জীবনধারা—তার পূর্ণ রূপ বাহ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকবে আন্তর্জাতিক ঐক্যের উপর—প্রত্যেক নেশন অক্ষুণ্ণ রাখবে তার পৃথক স্বকীয় জাতীয় জীবন, সেই সঙ্গেই সকলে সম্মিলিত থাকবে সকলের উপরে সকলের অস্তিমে রয়েছে যে অনিবার্য্য একতা তার মধ্যে, (৪) ভারত জগৎকে দেবে তার অধ্যাত্মজ্ঞান, আর জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা, (৫) সর্ব্বশেষে এক উর্দ্ধতর চেতনায় মানুষের উত্তরণ, ফলে প্রকৃতির বিবর্ত্তনে একটা নূতন পর্য্যায়—তখনই আরম্ভ হবে জাগতিক যাবতীয় সেসব সমস্যার সমাধান, মানুষকে যা বরাবর বিমূঢ় আর ক্ষুব্ধ করেছে, যেদিন থেকে মানুষ ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজের চিন্তা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে।

ভারত স্বাধীন, কিন্তু একত্ব সে লাভ করেনি, এ তার দীর্ণ খণ্ডিত

স্বাধীনতা। এমন কি এক সময়ে প্রায় বোধ হয়েছিল হয়ত বা সে ফিরে চলেছে ব্রিটিশ অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্ররাজির বিশৃঙ্খলার মধ্যে। সুখের কথা, বর্ত্তমানে বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে এই সাজ্ঘাতিক পুনরাবর্ত্তন তার আর ঘটবে না। সংগঠনী-সমিতি (Constituent Assembly) তাঁদের কর্ম্মব্যবস্থায় যে দৃঢ়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে হয় অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যার সুসমাধানই হবে, ভাঙন খণ্ডন কিছু ঘটবে না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সেই সুপ্রাচীন ধর্ম্মগত দ্বন্দ্ব এত গাঢ় হয়ে উঠেছে যে মনে হয় তা দেশকে যেন স্থায়ীভাবে খণ্ডিত করেছে রাজনীতিক হিসাবেও। তবে আশা করা যায় জাতীয় মহাসভা আর দেশের লোক এই আপাতবাস্তব সত্যকে স্থায়ী বাস্তব বলে গ্রহণ করবে না, সাময়িক ব্যবস্থার বেশী মূল্য একে দেবে না। কারণ, তা যদি স্থায়ী হয় তবে ভারত সাংঘাতিকভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, এমন কি বিকল হয়েও পড়তে পারে। অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রয়ে যাবে, এবং নূতন এক বিদেশী আক্রমণ ও অধিকারের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দেখা দিতে পারে। দেশের বিভাগ দূর হওয়া চাই—যে উপায়েই হোক। আশা করা যায় বিরোধের উগ্রতা সময়ে শ্লথ হয়ে আসবে, কিংবা শান্তির, সৌভ্রাত্রের প্রয়োজন উভয়পক্ষ ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করবে, অথবা একই কর্ম্মে একসঙ্গে সহযোগ যে নিত্য প্রয়োজন, এমনকি এই উদ্দেশ্যে একটা ঐক্যসাধনের যন্ত্রও যে দরকার এ উপলব্ধি হবে। ঐক্য এইভাবে আসতে পারে যে আকারেই হোকনা—বিশেষ আকারটির প্রয়োজন কাজের সুবিধার দিক দিয়ে, তার নিজস্ব নিত্য মূল্য কিছু নাই। কিন্তু যে উপায়েই হোক, খণ্ডতাকে যেতে হবে, যাবেই। তা না হলে ভারতের ভবিতব্য সাজ্ঘাতিকভাবে ক্ষুণ্ণ হবে, এমনকি ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু তা ঘটতে দেওয়া হবে না।

এসিয়া উঠে দাড়িয়েছে, তার অনেকানেক অংশ স্বাধীন হয়েছে কিংবা স্বাধীন হতে চলেছে—অন্যান্য অংশ যারা এখনও পরাধীন তারা যত দ্বন্দ্বসংঘর্ষই হোক না তার ভিতর দিয়েই মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। সামান্যই একটু করবার বাকী আছে, আজ হোক, কাল হোক সেটুকু করা হবেই। এখানেও ভারতের করণীয় কাজ আছে, এবং সে-কাজ সে আরম্ভ করেছে সামর্থ্য ও নৈপুণ্য সহকারে—তাতে ইতিমধ্যেই নির্দ্দেশ করে কতখানি তার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা আর কোন্‌স্থান সে অধিকার করতে পারে জাতি সঙ্ঘের আসরে।

মানবজাতির ঐক্যসাধনাও সুরু হয়েছে, সূত্রপাত যদিও তার ত্রুটিবহুল, বাহ্য-ব্যবস্থা একটা পেয়েছে বটে কিন্তু বিপুল বিঘ্নের বিরুদ্ধে তাকে চলতে হয়েছে। তবে ভিতরের বেগ সে অর্জ্জন করেছে, আর ইতিহাসের শিক্ষা দিয়েই যদি দিকনির্ণয় করা যায়, তা-হলে বলা যেতে পারে সে-বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাবে এবং শেষে জয়লাভ করবেই। এক্ষেত্রেও ভারত প্রধান এক অংশ গ্রহণ করেছে—সে যদি অনুশীলন করে চলে সেই উদারতর রাষ্ট্রনীতি বর্ত্তমানের ঘটনা আর আশু সম্ভাবনার মধ্যেই যা সীমাবদ্ধ নয়—যার দৃষ্টি ভবিষ্যতের মধ্যে, এবং ভবিষ্যৎকে যা নিকটে নিয়ে আসে—তবে ভারতের উপস্থিতির অর্থই হবে মন্থর আর শঙ্কিত গতির পরিবর্ত্তে ক্ষিপ্র নির্ভীক গতি।

দুর্যোগ একটা অতর্কিতে অবশ্য এসে পড়তে পারে, যে কাজ করা হয়ে চলেছে তাকে ব্যাহত করতে পারে, তাকে ধ্বংসও করতে পারে—তাহলেও শেষ ফল সুনিশ্চিত। যাই ঘটুক না, ঐক্যসাধন প্রকৃতির ধারায় একটা অবশ্য প্রয়োজন, অপরিহার্য্য ক্রিয়া, এবং তার সংসিদ্ধির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। নেশন সকলের জন্যে তার প্রয়োজন স্পষ্ট, কারণ তৎব্যতিরেকে ক্ষুদ্রতর জাতিরা অতঃপর কখনও নিরাপদে থাকতে পারে না। আর ভারতবর্ষ

খণ্ডিতই যদি থাকে তবে তারও নিরাপত্তা সন্দেহাকুল। সকলের স্বার্থের দিক দিয়েই, ভারতের ঐক্য বাঞ্ছনীয়। কেবল মানুষের ঘোর পঙ্গুতা আর মূঢ় আত্মপরতাই তাকে ব্যর্থ করতে পারে—মানুষের এ গুণের বিরুদ্ধে, শোনা যায়, দেবতাদের পর্য্যন্ত আয়াস বৃথা; কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজন আর ভগবৎ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ জিনিষও কখনও দাঁড়াতে পারে না। এ-রকমেই জাতীয়তা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে, তারপর প্রয়োজন হবে যাতে একটা আন্তর্জাতিক ভাব ও দৃষ্টি গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান। এমনকি যে পরিবর্ত্তন ঘটছে সেই ধারায় এক দেশের অধিবাসী দুই বা ততোধিক দেশের নাগরিক অধিকার লাভ করতে পারে, বিভিন্ন নেশনের সংস্কৃতি স্বেচ্ছায় পরস্পরে সম্মিলিত হয়ে একীভূত হয়ে উঠতে পারে। নেশনবাদ তার যোদ্ধভাব পরিত্যাগ করে, নিজের নিজত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেও এসকল জিনিষকে বরণ করে নিতে পারে, সমস্ত মানবজাতি নূতন একটা ঐক্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে তখন।

জগৎকে ভারত তার আধ্যাত্মিক বিদ্যা দান করতে ইতিমধ্যেই আরম্ভ করেছে। ভারতের আধ্যাত্মিক বিদ্যা ইউরোপ ও আমেরিকায় ক্রমে অধিকতর পরিমাণে প্রবেশ লাভ করছে। এই গতি ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করবে। এ যুগের দুর্য্যোগের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আশায় ভরসায় তার দিকেই বেশী করে ফিরছে, কেবল তার শাস্ত্রই নয়, তার সাধনা, আন্তর ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছে।

অবশিষ্ট যা তা হল আমার ব্যক্তিগত আশার ও আদর্শের কথা। ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যে যাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের মধ্যে কিছু গিয়ে পড়েছে—তারা ধীরে ধীরে একে গ্রহণ করছে, অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা এখানে বাধাবিঘ্ন অত্যন্ত বিপুল—কিন্তু বাধাবিঘ্ন হয়েছে জয় করবার জন্যে—ভগবৎ অনুজ্ঞা যদি থাকে, তবে এসব জয় করা

হবেই। এখানেও এই বিবর্ত্তন-ক্রমের আবির্ভাব-সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে তা ঘটবে, অধ্যাত্মসত্তার ও আন্তর চেতনার পরিণতির ফলে; এবং এইজন্যেই সে-প্রেরণা আসতে পারে ভারতবর্ষ হতে—বাহিরের ক্ষেত্র পৃথিবী জুড়ে, কিন্তু উৎস হবে ভারত।

ভারতের আজকার এই মুক্তিদিবসের মধ্যে আমি এই অর্থ দেখেছি—এ যোগাযোগ কত দূরপ্রসারী বা কতশীঘ্র তা বাস্তবে পরিণত হবে তা নির্ভর করছে নূতন ও মুক্ত ভারতবর্ষের উপর।

*

শ্রীমায়ের বাণী

শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন ভবিতব্য নিয়ে আসছে যে সৌন্দর্য-জগৎকে সেই কথা বলতে।

তিনি এসেছিলেন জগৎ যে মহিমার দিকে চলেছে তার আশা মাত্র নয় তার নিশ্চয়তা দিতে। জগৎ একটা আকস্মিক দুর্যোগ নয়, তা হল এক অপরূপ বিস্ময়, আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য চলেছে যে।

জগতের প্রয়োজন ভাবী সৌন্দর্যের নিশ্চয়তা. শ্রীঅরবিন্দ এনে দিয়েছেন এই নিশ্চয়তা।

*

শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন আমাদের বলতে তোমাকে কি রকমে পাওয়া যায়, কি রকমে তোমাকে সেবা করা যায়।

আমাদের প্রার্থনা, তাঁর এই শতবৎসরপূর্তির বৎসরে আমরা যেন সত্যসত্যই বুঝতে পারি যে শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়েছেন, আমরা যেন তাকে একান্ত আন্তরিকভাবে কার্যে পরিণত করতে পারি।

*

রক্তকমল হল শ্রীঅরবিন্দের ফুল; তবে বিশেষভাবে এই শতবার্ষিকীর জন্য আমরা গ্রহণ করব নীলকমল—নীল হল তাঁর শারীব পরিমণ্ডলের বর্ণ—তার অর্থ, পৃথিবীর উপরে পূর্ণ ভাগবত আবির্ভাবের শতবার্ষিকী-জয়ন্তী।

*

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবন দান করেছেন আমরা যাতে জন্ম গ্রহণ করতে পারি ভাগবত চেতনার মধ্যে।

শুভ নববর্ষ !

এ বৎসরটি শ্রীঅরবিন্দে উৎসর্গীকৃত।

শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর কাছে এতখানি উদারহস্তে এনে দিয়েছেন যত আলো আর জ্ঞান আর শক্তি তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় নিশ্চয় তাঁর শিক্ষা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা আর তা কার্যে পরিণত করা।

তাঁর শিক্ষা আমাদের যেন অন্ধকার দূর করে, পথ দেখিয়ে চলে ; আজ আমরা যা করতে অক্ষম কাল তাতে হব সক্ষম। খাঁটি মনো-ভাব যেন আমরা গ্রহণ করি পূর্ণ ঐকান্তিকভাবে, তাহলে সত্যসত্যই এ হবে

শুভ নব বৎসর।

*

ভগবান ব্যতিরেকে আমরা হলাম সীমাবদ্ধ, অক্ষম, অসমর্থ জীব সব। ভগবান সঙ্গে, সবই সম্ভব, আমাদের ক্রমোন্নতি হবে সীমাহীন, তাঁকে যদি আমরা পূর্ণভাবে আমাদের উৎসর্গ করে দিই।

একটা বিশেষ সহায় নেমে এসেছে পৃথিবীর উপরে শ্রীঅরবিন্দের এই জন্মশতবার্ষিকীতে, আমরা যেন এর সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের অহংকার পার হয়ে যেতে পারি, উঠে যেতে পারি আলোকের মধ্যে।

*

দেহত্যাগ করবার সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে তিনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। বাস্তবিক এই একুশ বৎসর ধরে তিনি সর্বদাই ছিলেন আমাদের সঙ্গে ; তাঁর প্রভাবকে যারাই গ্রহণ করতে পেরেছে, যারাই সেদিকে খুলে ধরেছে নিজেকে, তাদের সবাইকে পথ দেখিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। এই শতবার্ষিকী বৎসরে তাঁর সাহায্য আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, আমাদের শুধু সেদিকে খুলে ধরতে হবে নিজেদের, জানতে হবে কি রকমে সে সুযোগ গ্রহণ

করা যায়। ভবিষ্যৎ তাদেরই জন্য যারা বীরহৃদয়, আমাদের বিশ্বাস যত সবল ও অকপট হবে, যে সাহায্যের অধিকারী হব আমরা তাও হবে ততখানি শক্তিমান ও ফলপ্রদ।

*

শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকীর প্রথম দিন আজ। তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করেছেন বটে কিন্তু এখনও তিনি নিরন্তর রয়েছেন আমাদের সঙ্গে জীবন্ত কর্মরত।

*

শ্রীঅরবিন্দ হলেন ভাবীকালের; ভাবীকালের অগ্রদূত তিনি। তিনি এখনও পথ দেখিয়ে চলেছেন যাতে ভাগবত গঠিত মহিমাময় ভবিষ্যৎ-সিদ্ধি ত্বরায় সংসিদ্ধ হয়।

*

মানবজাতির ক্রমোন্নতির জন্য ভারতের সমুজ্জ্বল সৌভাগ্যের জন্য যারা সহযোগী হতে চায় তাদের সকলকে সম্মিলিত হতে হবে দৃষ্টিময় অভীপ্সা নিয়ে, জ্ঞানদীপ্ত কর্ম নিয়ে।

*

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে

শ্রীমা

পৃথিবীর ইতিহাসের সূচনা থেকে জগতের যে সব মহৎ-রূপান্তর সাধিত হয়েছে, যে কোন রূপে যে কোন নামে তার অধীশ্বর ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

*

শাশ্বত বিকাশের ধারায় এক এক জন অবতার হলেন শুধু বৈতালিক, ভবিষ্যতের পূর্ণতর সিদ্ধির অগ্রদূত।

তবু মানুষের প্রবণতা হল ভবিষ্যতের যিনি অবতার তাঁর বিপক্ষে অতীতের অবতারকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা।

জগতের কাছে আগামীদিনের সিদ্ধির বার্তা ঘোষণা করতে শ্রীঅরবিন্দ পুনর্বার আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর পূর্বগামীদের মত শ্রীঅরবিন্দের বাণীও আজ একই বিরোধীতার সম্মুখীন।

কিন্তু তিনি যা প্রকাশ করে ধরেছেন আগামীকাল সে সত্য প্রমাণিত হবে, তাঁর কর্ম সম্পন্ন হবে।

*

শ্রীঅরবিন্দ মানুষী তনুতে মূর্ত করে ধরেছেন অতিমানস চেতনা, আর সেই সাধনপথের প্রকৃতি, ধারা ও লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় কেবল আমাদের কাছে প্রকাশ করে ধরেছেন তাই নয়, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধি দিয়ে আমাদের কাছে প্রমাণ করেছেন, তুলে ধরেছেন এমন এক দৃষ্টান্ত যে তাঁর এই ব্রত সাধন করা অবশ্যই সম্ভব এবং তার সময় এখনই।

*

শ্রীঅরবিন্দ এসেছেন আমাদের কাছে এই বাণী নিয়েঃ "সত্যকে লাভ করবার জন্য সংসার ত্যাগ করবার প্রয়োজন নেই। আত্মাকে জানবার জন্য জীবনকে পরিহার করবার প্রয়োজন নেই, ভগবানের সঙ্গে সাযুজ্য লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করা অথবা কোন সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের গণ্ডী দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভগবান রয়েছেন সর্বভূতে সর্বত্র, তিনি যদি অজ্ঞাত থাকেন তার কারণ আমরা তাঁকে খুঁজে দেখবার একটু চেষ্টাও করি না।"

*

পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের যা অবদান তা কোন তত্ত্বশিক্ষা নয়, এমনকি কেবল সত্যের প্রকাশও নয়, তা হল এ জগতের উপর পুরুষোত্তমের এক প্রত্যক্ষ চূড়ান্ত ক্রিয়া।

*

বাহ্যরূপ দেখে বিভ্রান্ত হবে না—শ্রীঅরবিন্দ আমাদের ছেড়ে যাননি, তিনি এখানেই আছেন—তেমনি জীবন্ত, তেমনি সদা সন্নিহিত। এখন আমাদের কর্তব্য হবে তাঁর কর্ম সম্পন্ন করা, যতখানি প্রয়োজন সমস্ত আন্তরিকতা, উৎসাহ ও একাগ্রতা দিয়ে।

*

ভগবান, আজ প্রাতে তুমি আমায় কথা দিয়েছ নিশ্চয় করে, যতদিন তোমার কাজ পূর্ণ না হবে ততদিন তুমি থাকবে আমাদের কাছে, শুধু দিশারী আলোকারী চৈতন্যরূপে নয়, তুমি নিজে উপস্থিত থাকবে কর্মেরও মধ্যে জাগ্রতভাবে। অভ্রান্ত কথায় তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তোমার সবখানি থাকবে এখানে, পৃথিবীমণ্ডল পরিত্যাগ করবে না যতদিন না পৃথিবী রূপান্তরিত হয়। আমাদের প্রার্থনা তাই, তোমার এই অপরূপ জাগ্রত উপস্থিতির যোগ্য যেন আমরা হতে পারি। এখন থেকে আমাদের প্রতি অঙ্গ যেন ঐ এক সঙ্কল্পের উপর

একাগ্র হয়। যাতে তোমার দিব্যকর্ম উদ্‌যাপনে আমরা ক্রমে পূর্ণতর ভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে পারি।

*

প্রভু, তোমার রূপান্তরের কাজটি সমাধা করার জন্যই আমরা জগতে রয়েছি। এই হল আমাদের একমাত্র সঙ্কল্প, একমাত্র আরব্ধ ব্রত। পূর্ণ কর এই প্রার্থনা, যেন এই হয় আমাদের একমাত্র কর্ম এবং আমাদের সকল ক্রিয়াবলী যেন এই এক লক্ষ্যের অনুসারী হতে সাহায্য করে।

*

শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত রয়ে থাকে কিছু এসে যায় না তাতে। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে, যখন তোমার রাজত্ব সত্যসত্যই পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে।

*

প্রশ্ন: শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবকে তুমি বলছ সৃষ্টির ইতিহাসে এক শাশ্বত ঘটনা। "শাশ্বত" বলতে এখানে কি বোঝায়?

উত্তর: কথাটি বুঝতে পারা যায় চারটি বিভিন্নভাবে, চেতনার চারটি স্তর অনুসারে।

১। জড়স্তরে, শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে বিশ্বের কাছে থাকবে চিরকালের গুরুত্ব।

২। মানসস্তরে, এ হল এক আবির্ভাব যা ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩। অন্তরাত্মার দিক থেকে, এ আবির্ভাব যা পৃথিবীতে যুগে যুগে সংঘটিত হয়ে থাকে।

৪। আধ্যাত্মিক দিক থেকে, পৃথিবীতে এ হল অনন্তের জন্মলাভ।

*

দ্বিতীয় খণ্ড

নমস্কার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার !
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি ! তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি ! আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি নর-দেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন ; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত মহাবীর সবে
গিয়েছেন সঙ্কটযাত্রায় ; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে ;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান—আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়,
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন ? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর ? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার

জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মত ? জয়, তব জয় !
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ! কোন অমানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল !
মোছ্‌রে, দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্‌ অশ্রুজল !

দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে,
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে ! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি ? শাস্তি তারি তরে,
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন ;—যে নপুংস কোনদিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার,
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে, দুর্গতির করে অহঙ্কার ;
দেশের দুর্দ্দশা ল'য়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ, মাতৃরক্ত প্রায় ;

সেই ভীরু নতশির চিরশান্তিভারে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য-কারাগারে !

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝংকার,—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস ! তাই শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জ্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণ-পিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জ্জরব
ভেরী-মন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গমাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার !

তার পরে তাঁরে নমি, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হ'তে দেন প্রাণ ; বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক-কান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি অন্ধকারে।

যিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্ম্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে—"দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয় ;
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির !"

*

অরবিন্দ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তাঁকে দেখে যা আমার মনে জেগেছে সেই কথা লিখতে ইচ্ছা করি। খৃষ্টান শাস্ত্রে বলে বাণীই আদ্যাশক্তি। সেই শক্তিই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। নবযুগ নবসৃষ্টি, সে কখনও পঞ্জিকার তারিখের ফর্দ থেকে নেমে আসে না। যে যুগের বাণী চিন্তায় কর্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নূতন পথে বাহির করে তাকেই বলি নবযুগ।

আমাদের শাস্ত্রে মন্ত্রের আদিতে ওঁ, অন্তেও ওঁ। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অয়মহং ভো—কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিঃশ্বাস। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের বান ডেকে যে যুগ অতল ভাবসমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেসে এল তাকে বলি য়ুরোপের এক নবযুগ। তার কারণ এ নয়, সেদিন ফ্রান্সে যারা পীড়িত তারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধালে। তার কারণ, সেই যুগের আদিতে ছিল বাণী। সে বাণী কেবলমাত্র ফ্রান্সের আশু রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের খাঁচায় বাঁধা, খবরের কাগজের মোড়কে ঢাকা, ইস্কুল-বইয়ের বুলি আওড়ানো টিয়ে পাখী নয়। সে ছিল মুক্তপক্ষ আকাশবিহারী বাণী, সকল মানুষকেই পূর্ণতর মনুষ্যত্বের দিকে সে পথ নির্দেশ করে দিয়েছিল।

একদা ইতালির উদ্‌বোধনের তৎকালীন দূত ছিলেন মাট্‌সীনি, গারিবাল্ডি। তাঁরা যে মন্ত্রে ইতালিকে উদ্ধার করলেন সে ইটালির তৎকালীন শত্রু-বিনাশের দ্রুতফলদায়ক মারণ উচাটন পিশাচ-মন্ত্র নয় —সমস্ত মানুষের নাগপাশ-মোচনের সে গরুড়মন্ত্র, নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে মর্তে অবতীর্ণ। এইজন্যে তাকেই বলি বাণী। আঙুলের

আগায় যে স্পর্শবোধ তার দ্বারা অন্ধকারে মানুষ ঘরের প্রয়োজন চালিয়ে নিতে পারে। সেই স্পর্শবোধ তারই নিজের। কিন্তু সূর্যের আলোতে নিখিলের যে স্পর্শবোধ আকাশে আকাশে বিস্তৃত তা প্রত্যেক প্রয়োজনের উপযোগী অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনের অতীত। সেই আলোককেই বলি বাণীর রূপক।

সায়ান্স্‌ একদিন য়ুরোপে যুগান্তর এনেছিল। কেন, বস্তুজগতে শক্তির সন্ধান জানিয়েছিল ব'লে না, জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্ধতা ঘুচিয়েছিল ব'লে। বস্তুসত্যের বিশ্বরূপ স্বীকার করতে সেদিন মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আজ সায়ান্স সেই যুগ পার করে দিয়ে আর-এক নবতর যুগের সম্মুখে মানুষকে দাঁড় করালে। বস্তুরাজ্যের চরম সীমানায় মূল তত্ত্বের দ্বারে তার রথ এল। সেখানে সৃষ্টির আদিবাণী। প্রাচীন ভারতে মানুষের মন কর্মকাণ্ড থেকে যেই এল জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এল সৃষ্টির যুগ। মানুষের আচারকে লঙ্ঘন করে আত্মাকে ডাক পড়ল। সেই আত্মা যন্ত্রচালিত কর্মের বাহন নয়, আপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করে। সেই যুগে মানুষের জাগ্রত চিত্ত বলে উঠেছিল, চিরন্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হল বেঁচে যাওয়া, তার উল্টাই মহতী বিনষ্টি। সেই যুগের বাণী ছিলঃ য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

আর-একদিন ভারতে উদ্‌বোধনের বাণী এল। সমস্ত মানুষকে ডাক পড়ল, বিশেষ সংকীর্ণ পরামর্শ নিয়ে নয়, যে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে যায় তারই বাণী নিয়ে। সেই বাণী মানুষের চিত্তকে তার সমগ্র উদ্‌বোধিত শক্তির যোগে বিপুল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করলে।

বাণী তাকেই বলি, যা মানুষের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিব্যক্তির দিকে আহ্বান করে আনে, যা উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য বলে সপ্রমাণ করে। প্রকৃতি পশুকে নিছক দিনমজুরি করতেই প্রত্যহ নিযুক্ত করে রেখেছে।

সৃষ্টির বাণী সেই সংকীর্ণ জীবিকার জগৎ থেকে মানুষকে এমন জীবনযাত্রায় উদ্ধার করে দিলে যার লক্ষ্য উপস্থিত কালকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের কানে এল ঃ টিকে থাকতে হবে, এ কথা তোমার নয় ; তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, সেজন্যে মরতে যদি হয় সেও ভালো। প্রাণযাপনের বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে যে আলো জ্বলে সে রাত্রির আলো ; পশুদের তাতে কাজ চলে। কিন্তু মানুষ নিশাচর জীব নয়।

সমুদ্রমন্থনের দুঃসাধ্য কাজে বাণী মানুষকে ডাক দেয় তলার রত্নকে তীরে আনার কাজে। এতে করে বাইরে সে যে সিদ্ধি পায় তার চেয়ে বড় সিদ্ধি তার অন্তরে। এ যে দেবতার কাজে সহযোগিতা। এতেই আপন প্রচ্ছন্ন দৈবশক্তির 'পরে মানুষের শ্রদ্ধা ঘটে। এই শ্রদ্ধাই নূতন যুগকে মর্তসীমা থেকে অমর্তের দিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই শ্রদ্ধাকে নিঃসংশয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাঁর মধ্যে যাঁর আত্মা স্বচ্ছ জীবনের আকাশে মুক্ত মহিমায় প্রকাশিত। কেবলমাত্র বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাশক্তি নয়, উদ্যম নয়, যাঁকে দেখলে বোঝা যায় বাণী তাঁর মধ্যে মূর্তিমতী।

আজ এইরূপ মানুষকে যে একান্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চার দিকেই আজ মানুষের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস প্রবল। এই আত্ম-অবিশ্বাসই আত্মঘাত। তাই রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধিই আজ আর-সকল সাধনাকেই পিছনে ঠেলে ফেলেছে। মানুষ বস্তুর মূল্যে সত্যকে বিচার করছে। এমনই করে সত্য যখন হয় উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হয় আর-কিছু, তখন বিষয়ের লোভ উগ্র হ'য়ে ওঠে, সে লোভের আর তর্ সয় না। বিষয় সিদ্ধির অধ্যবসায়ে বিষয়বুদ্ধি আপন সাধনার পথকে যতই সংক্ষিপ্ত করতে পারে ততই তার জিত। কারণ, তার পাওয়াটা হল সাধনা পথের শেষ প্রান্তে। সত্যের সাধনায় সর্বক্ষণেই পাওয়া। সে যেন গানের মতো, গাওয়ার অন্তে সে গান নয়, গাওয়ার সমস্তটার মধ্যেই। সে যেন ফলের সৌন্দর্য, গোড়া থেকেই ফুলের সৌন্দর্যে

যার ভূমিকা। কিন্তু লোভের প্রবলতায় সত্য যখন বিষয়ের বাহন হ'য়ে উঠল মহেন্দ্রকে তখন উচ্চৈঃশ্রবার সহিসগিরিতে ভর্তি করা হল, তখন সাধনাটাকে ফাঁকি দিয়ে সিদ্ধিকে সিঁধ কেটে নিতে ইচ্ছে করে, তাতে সত্য বিমুখ হয়, সিদ্ধি হয় বিকৃত।

সুদীর্ঘ নির্বাসন ব্যাপ্ত করে রামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। যতই দুঃখ পেয়েছেন ততই গাঢ়তর করে উপলব্ধি করেছেন সীতার প্রেম। তাঁর সেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্থক হয়েছিল যেদিন প্রাণপণ যুদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করে আনলেন।

কিন্তু রাবণের চেয়ে শত্রু দেখা দিল তাঁর নিজেরই মধ্যে। রাজ্যে ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাকে রাষ্ট্রনীতির আশু প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলেন,—তাঁকে বললেন, সর্বজনসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় অনতিকালেই তোমার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু এক মুহূর্তে যাদুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপমান ঘটে। দশ জন সত্যকে যদি না স্বীকার করে তবে সেটা দশ জনেরই দুর্ভাগ্য। সত্যকে যে সেই দশ জনের ক্ষুদ্র মনের বিকৃতি অনুসারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ যেন না ঘটে। সীতা বললেনঃ আমি মুহূর্তকালের দাবি মেটাবার অসম্মান মানব না, চিরকালের মতো বিদায় নেব। রামচন্দ্র এক নিমিষে সিদ্ধি চেয়েছেন, এক মুহূর্তে সীতাকে হারিয়েছেন। ইতিহাসের যে উত্তরকাণ্ডে আমরা এসেছি এই কাণ্ডে আমরা তাড়াতাড়ি দশের-মন-ভোলানো সিদ্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পালা আরম্ভ করেছি।

বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের দুর্লভ কাব্যরত্নের ঝুলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাউলের গান পেয়েছিলুম। তার প্রথম পদটি মনে পড়ে :

নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে।

যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনাসাপেক্ষ, দশের সামনে অগ্নিপরীক্ষায় তার পরিণত সত্যকে আশুকালের গরজে সপ্রমাণ করতে চাইলে, আয়োজনের ধুমধাম ও উত্তেজনাটা থেকে যায়, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তর্ধান করে।

এই লোভের চাঞ্চল্যে সর্বত্রই যখন সত্যের পীড়ন চলেছে তখন এর বিরুদ্ধে তর্কযুক্তিকে খাড়া করে ফল নেই। মানুষকে চাই, যে মানুষ বাণীর দূত, সত্য সাধনায় সুদীর্ঘকালেও যাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই অমৃত পাথেয় যাঁকে আনন্দিত রাখে। আমরা এমন মানুষকে চাই যিনি সর্বাঙ্গীণ মানুষের সমগ্রতাকে শ্রদ্ধা করেন। এ কথা গোড়াতেই মেনে নিতে হবে যে, বিধাতার কৃপাবশতই সর্বাঙ্গীণ মানুষটি সহজ নয়, মানুষ জটিল। তার ব্যক্তিরূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুবিচিত্র। কোনো বিশেষ অপ্রশস্ত আদর্শের মাপে ছেঁটে একঝোঁকা ভাবে তাকে অনেক দূরে বাড়িয়ে তোলা চলে। মানুষের মনটাকে যদি চাপা দিই তবে চোখ বুজে গুরুবাক্য মেনে চলার ইচ্ছা তার সহজ হতে পারে। বুঝিয়ে বলার পরিশ্রম ও বিলম্বটাকে খাটো করে দিতে পারলে মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোঝা বাড়ানো, বিদ্যালাভের পরিবর্তে ডিগ্রি-লাভ, সহজ হয়। জীবনযাত্রাকে উপকরণশূন্য করতে পারলে তার বহনভার কমে আসে। তবুও সহজের প্রলোভনে সবচেয়ে বড়ো কথাটা ভুললে চলবে না যে, আমরা মানুষ, আমরা সহজ নই।

তিব্বতে মন্ত্রজপের ঘূর্ণিচাকা আছে। এর মধ্যে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় বলেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আসে। সত্যকার মন্ত্রজপ একটুও সহজ নয়। সেটা শুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে আছে চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা। হিতৈষী এসে বললেন; সাধারণ মানুষের চিত্ত অলস, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, অতএব মন্ত্রজপকে সহজ করবার খাতিরে ঐ শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া যাক, কিছু না-

ভেবে না-বুঝে শব্দ আউড়ে গেলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট; সজীব ছাপাখানার মতো প্রত্যহ কাগজে হাজার বার নাম লিখলেই উদ্ধার। কিন্তু সহজ করবার মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরও সহজই-বা না করব কেন? চিত্তের চেয়ে মুখ চলে বেগে, মুখের চেয়ে চাকা। অতএব চলুক চাকা, মরুক চিত্ত।

কিন্তু মানুষের পন্থা সম্বন্ধে যে গুরু বলেন 'দুর্গং পথস্তৎ' তাঁকে নমস্কার করি। চরিতার্থতার পথে মানুষের সকল শক্তিকেই আমরা দাবি করব। বহুলতা পদার্থটিই মন্দ এই মতের খাতিরে বলা চলে যে, ভেলা জিনিসটাই ভালো, নৌকোটা বর্জনীয়। এক সময়ে অত্যন্ত সাদাসিধে ভেলায় অত্যন্ত সাদাসিধে কাজ চলত। কিন্তু মানুষ পারলে না থাকতে, কেননা সে সাদাসিধে নয়। কোনোমতে স্রোতের উপর বরাত দিয়ে নিজের কাজ সংক্ষেপ করতে তার লজ্জা। বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে উঠল, নৌকোয় হাল লাগালো, দাঁড় বানালে, পাল দিলে তুলে, বাঁশের লগি আনলে বেছে, গুণ টানবার উপায় করলে, নৌকোর উপর তার কর্তৃত্ব নানা গুণে নানা দিকে বেড়ে গেল, নৌকোর কাজও পূর্বের চেয়ে হল অনেক বেশী ও অনেক বিচিত্র। অর্থাৎ মানুষের তৈরি নৌকো মানবপ্রকৃতির জটিলতার পরিচয়ে কেবলই এগিয়ে চলল। আজ যদি বলি 'নৌকো ফেলে দিয়ে ভেলায় ফিরে গেলে অনেক দায় বাঁচে' তবে তার উত্তরে বলতে হবে: মনুষ্যত্বের দায় মানুষকে বহন করাই চাই। মানুষের বহুধা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, মানুষ কোথাও থামতে পাবে না। মানুষের পক্ষে নাল্পেসুখমস্তি। অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের নয়, সমস্তকে নিয়ে সামঞ্জস্য করাই তার। কলকারখানার যুগে ব্যবসা থেকে সৌন্দর্যবোধকে বাদ দিয়ে জিনিসটাকে সেই পরিমাণে সহজ করেছে, তাতেই মুনাফার বুভুক্ষা কুশ্রীতায় দানবীয় হয়ে উঠল। এ দিকে মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল ঘানি ঢেঁকি থেকে

বিজ্ঞানকে চেঁচে মুছে ফেলায় ওগুলো সহজ হয়েছে, সেই পরিমাণে এদের আশ্রিত জীবিকা অপটুতায় স্থাবর হয়ে রইল; বাড়েও না, এগিয়ে চলেও না, নড়বড় করতে করতে কোনোমতে টিকে থাকে। তার পরে মার খেয়ে মরে শক্ত হাতের থেকে। প্রকৃতি পশুকেই সহজ করেছে, তারই জন্য স্বল্পতা; মানুষকে করেছে জটিল, তার জন্যে পূর্ণতা। সাঁতারকে সহজ করতে হয় বিচিত্র হাত-পা নাড়ার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে, হাঁটুজলে কাদা আঁকড়ে অল্প পরিমাণে হাত-পা ছুঁড়ে নয়। ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরববোধকে জাগ্রত ক'রে।

এই সমস্ত কথা ভাবছি এমন সময় আমাদের ফরাসি জাহাজ এল পণ্ডিচেরী বন্দরে। ভাঙা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করেই নামতে হল। তা হোক্। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারই মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খরদস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যেব উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন: যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে ব'লে এলুম, আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে

আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে ঃ শৃন্বন্তু বিশ্বে।

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার !

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার !

*

বন্দেমাতরম্-এর অরবিন্দ

বিপিনচন্দ্র পাল

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে বয়সে তরুণতম হ'লেও অবদানে, শিক্ষায় এবং চরিত্রে হয়তো তাঁদের সকলের জ্যেষ্ঠ—অরবিন্দ যেন বিধাতারই চিহ্নিত পুরুষ, যাঁকে এই আন্দোলনে এমন-এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হ'বে, যা তাঁর অন্য কোনও সহকর্মী বা সমসাময়িকের অদৃষ্টে লেখা নেই।···তাঁর একমাত্র ধ্যান হ'লেন দেশজননী···যাঁকে তিনি মা বলেই উল্লেখ করেছেন সর্বদা। ···যে-জাতীয়তা আর-দশজনের কাছে বড় জোর মানসিক বিলাস কিংবা নিম্নতমরূপে যা রাজনৈতিক হট্টগোল এবং আকাঙ্ক্ষা···সেই জাতীয়তাই অরবিন্দের কাছে আত্মারই এক উন্মাদনা-বিশেষ। জাতীয়তাবাদী আদর্শের শক্তি ও তাৎপর্য অরবিন্দের মতো গভীরভাবে খুব কম লোকেই হৃদয়ঙ্গম করেছে।···ধন্য তাঁরা, যাঁদের কাছে আদর্শ আর বাস্তবের ব্যবধান গিয়েছে ঘুচে; যাঁদের কাছে সত্যকে জানা অর্থে তাকে উপলব্ধি-গ্রাহ্য করা; যাঁদের কাছে, সময়ে বা মাত্রায়, কোনও প্রভেদই নেই সঙ্কল্প আর সিদ্ধির মধ্যে;···ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁদের সংগ্রাম নিজেদের সঙ্গে নয়, অপরের সঙ্গে, যাঁদের বিজয় নিজেদের ওপরে নয়, অপরের ওপর লাভ করতে হয়; ভগবানের রাজত্ব তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন আপন আন্তর জীবনে।···এঁরাই হলেন ভগবানের নির্বাচিত পুরুষ। মানবতার নেতৃত্বে তাঁদের সহজাত অধিকার। ব্যাপক গণ-সমষ্টির জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এঁদের ওপর, এঁদের সাধনার ওপর নির্ভরশীল; বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে আসেন এঁরা, যাপন করেন এক মন্ত্রদীপ্ত জীবন। এঁদের আঘাত

করা চলে, কিন্তু আহত করা অসম্ভব।...তাঁদের গগনচুম্বী আশাবাদ এবং তাতে ভগবানের আশিসই সমস্ত অশিবকে মঙ্গলে শিবে পরিণত করে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরিণত করে সাহায্যে, সমস্ত হারানোকে পরিণত করে পরম প্রাপ্তিতে। সমগ্র দেশবাসীর অবি-সংবাদী রায়ে অরবিন্দ আজ ভগবানের সেই প্রিয়তম আত্মজদেরই অন্যতম।

...রাজনীতি বলতে তিনি যা বুঝতেন তা ওই শব্দটির সাধারণ অর্থের চেয়ে অনেক গভীরের জিনিস। নিরুপায়ের জুয়ার চাল নয়, চরিত্র-গঠনের বিদ্যাপীঠ। আধুনিক শিক্ষার ঋষি হলেন অরবিন্দ। তাঁর আধুনিক শিক্ষার যে আদর্শ তা ইওরোপে সাধারণত আধুনিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক উচ্চ। পরম আধ্যাত্মিক এক আদর্শ তা! তার লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতম, গভীরতম দিব্য-চেতনাকে অভিব্যক্ত করা—বাহ্যিক জীবনে, মানব-সমাজের সর্বস্তরে।...জাতীয় কলেজে তাঁকে যদি পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হ'ত, সে-কলেজ তবে ভারতের আধুনিক শিক্ষারই নয়, সমস্ত জগতের শিক্ষার ইতিহাসে সূচিত করত নতুন এক অধ্যায়। আধুনিক সংস্কৃতির ভাবধারার যে বস্তুনিষ্ঠা, তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আদর্শবাদের এই সমন্বয় যদি ঘটত, তার সাহায্যে ভারতবর্ষ বিশ্বের শিক্ষাদাত্রীর পদেই কেবল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ত না, আধুনিক সভ্যতাকেও হয়তো রক্ষা করতে পারত নীচ সর্বগৃধ্নু শ্রম-শিল্পজীবীদের চাপ থেকে, সর্বাঙ্গীণ পতন এবং ধ্বংসের হাত থেকে।

...নতুন পত্রিকাটির ('বন্দে মাতরম্') সর্বাধিনায়ক, কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন অরবিন্দ! জাতীয় কলেজে যে-সুযোগ তিনি পান নি, তা তিনি পেলেন বন্দে মাতরমের সম্পাদনাকালে, এবং কয়েক-শত ছাত্রের আচার্যপদ থেকে তিনি বৃত হলেন সমস্ত জাতির আচার্যপদে!...

অতুলনীয় এই মহামানবের হাত···পত্রিকার সূচনা থেকেই ছিল। দিনের পর দিন সকালে, কেবলমাত্র কলিকাতার নয়, সারা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত, সে-যুগের উদ্দীপনা-পূর্ণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁর বজ্রকঠোর মতামতের পথে চেয়ে। এমন-কি গতানুগতিক আত্মতৃপ্ত বৃটিশ সাংবাদিকদের মনেও তা গভীরভাবে রেখাপাত করল। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা থেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাবৎ উদ্ধৃতি ছাপা হতে লাগল লণ্ডনের The Times হেন পত্রিকার স্তম্ভে···এবং নতুন পত্রিকাটির সর্বাধিনায়ক কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন অরবিন্দ।

*

মানস সরোবরে অরবিন্দ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

অমল-শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি? ভারত-মানস-সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল! এ ফিরিঙ্গীর আঁদাড়ে-পাঁদাড়ের লিলি ড্যাফোডিল নহে নির্গন্ধ! শুধু রঙের বাহার! কেবল বর্ণবিলাস!! দেবতার পূজায় লাগে না। যাগ-যজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেব বিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর!! আমাদের এই অরবিন্দ জগৎদুর্লভ। হিমশুভ্র বর্ণে সাত্ত্বিকতার দিব্য শ্রী! বৃহৎ ও মহৎ! হৃদয়ের প্রসারতায় বৃহৎ! হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ!! এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ—এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, আবার কমল পর্ণের ন্যায় কান্ত-পেলব, এ হেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ইনি ফিরিঙ্গীর সভ্যতার মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া, ইহলোকের সুখ-সাধ বিসর্জন দিয়া মায়ের-ছেলে-অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ স্বামী।

তোমরা ঐ চ্যাপচেপে, প্যানপেনে, ফিরিঙ্গীর পোঁ-ধরা মদরতদের কাগজগুলা আর ছুঁইয়ো না। ঐ অরবিন্দ ভাব-বিন্যাস বুকে স্বদেশ-প্রীতির বান ডাকাইয়া দিবে। মাতৃসেবার উত্তেজনা জাগাইবে। "বন্দেমাতরমের" কথা শুনিলে ভয় ঘুচিবে। বাহুতে বজ্রবল আসিবে। শিরায়-শিরায় অগ্নিস্রোত বহিবে। আর মরণকে মনে হইবে বসন্তবিলাস। সাপের ওঝারা মন্ত্র পড়িয়া যেমন বিষ ঝাড়ায়, বন্দেমাতরমের মন্ত্রে তেমনি ফিরিঙ্গীয়ানার বিষ-জর্জরতা ঘুচিয়া

যাইবে। বুঝিবে ঐ কামান বন্দুক, ঐ জেল কারাগার, ঐ আইন আদালত, ঐ লাটবেলাট সব ফক্কিকার! ফিরিঙ্গীর হুড়ুম-হুড়ুম ছুদিনেই অক্কা পাইবে।

বিলেতে লেখাপড়া শিখিলেও বিলিতি অবিদ্যার পুতনা মায়া অরবিন্দকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অরবিন্দ শরতের সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত আপনার স্বদেশের স্বধর্ম ও সভ্যতার মহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া জননী-জন্মভূমি শ্রীচরণপদ্মে শ্রদ্ধার্ঘ্যের মত শোভা পাইতেছেন! আহা! এমন কি আর হয়? অরবিন্দ ফিরিঙ্গীর আঁস্তাকুড়ের বাবু নহেন। তাই তিনি খাঁটি মায়ের ছেলে হইয়া ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐখানে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে মাকে প্রণাম কর। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আর বিলম্ব নাই।

আমার প্রভু শ্রীঅরবিন্দ যেমন তাঁকে দেখেছি—

চারুচন্দ্র দত্ত

আমার দেবতার সঙ্গে আমার দেখা জীবনে এই প্রথম নয়। যুগ থেকে যুগে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে, তাঁকে আমি জেনেছি, ভালবেসেছি, তাঁর সেবা করেছি। পিতৃরূপে, প্রিয়রূপে, বন্ধুরূপে তিনি বারবার আমার কাছে এসেছেন। এ গ্রহে আমার এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ বারবার তাঁর কৃপাধন্য হয়েছে। মাঝে-মাঝে মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে দৃষ্টি, হারিয়ে ফেলেছি ধ্রুবতারকার লক্ষ্য ; কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয় ; আত্মদর্শনের নির্জন পথের যাত্রী, দুর্বল, স্বল্পদৃষ্টি, নগন্য এ পথিক কখনও তাঁর অনন্তকরুণায় বঞ্চিত হয়নি। তাঁর শক্তি আমাকে কর্দমের গ্লানি থেকে মুক্ত করেছে, অন্ধকার থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে, শিখিয়েছে—কেমন করে তাঁকে খুঁজতে হয়। তাঁকে দেখতে শিখিয়েছে—তাঁর স্বর্গীয় ভূমিতে নয়, এই অনন্ত পরিবর্তনশীল যে ভূলোক আমায় ঘিরে রয়েছে—সেখানেই। এইভাবে আমি তাঁর কৃপার স্বাদ পেয়েছি, সত্যের চকিত দর্শন পেয়েছি বারবার। মনোদিগন্ত মাঝে-মাঝে আধো-ছায়ায় ঝাপসা হয়েছে বটে, কিন্তু এখন আর সে দুঃখ নেই। প্রভু যে আমায় আদিত্য-বর্ণ পরম-পুরুষের জ্যোতির্ময় আনন দেখিয়েছেন!

আমার এ নশ্বর দেহ, মন ও জীবন আর আমার কাছে বোঝা মনে হয় না, কারণ, এখন জানি, তারা আমার অবিনশ্বর আত্মারই ধারক। এবং স্ব-রূপে আমার আত্মা বিশ্বের আত্মা। আমার দেবতার আত্মা। এই একই আত্মা বিশ্বকে ও বিশ্বাতীতকে ছেয়ে রয়েছে। সুতরাং আমার এ দেহ, এ জীবন, এই মন আমার কাছে

মায়াবাদীর বর্ণিত পিঞ্জর নয়। সেই অদ্বিতীয়, অনন্ত আনন্দে আত্মপ্রসারী অখণ্ডের মন্দির।

পাছে আমি ভুলে যাই—হে সার্বভৌম, তুমি তাই তোমার দ্বৈতরূপে আমার কাছে এসেছ। পুরুষরূপে ও প্রকৃতিরূপে, প্রভুরূপে ও মাতৃরূপে। নিয়ে এসেছ তোমার বিশ্বব্যাপী শান্তির বাণী, দিতে এসেছ তোমার মধ্যে সংহত বিশ্বাত্মার বার্তা!

বহু বহুদিন মানুষ তার জ্যোতির্ময় সত্তা ও উজ্জ্বল পরিণতির কথা ভুলে ছিল, তার হৃদয়পদ্মের সেই দ্যুতিময় মণি গিয়েছিল হারিয়ে, বহুদিন সে অহংবোধের জটিল পথে-পথে ঘুরেছে, পরিবেশকে স্বীকার করে নিয়ে বেঁচেছে, আক্রমণ করেছে একে অপরকে। ঊর্ধ্বলোক থেকে মাঝে মাঝে দূত এসেছে, তাদের আত্মবিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে। তাদের কথা মানুষ শুনেছে কিছুক্ষণ, কিন্তু হায়! আবার ভুলেছে সব। যাঁরা দিব্যপ্রেরণা লাভ করেছেন, নিজেদের মুক্তিসাধন করে চলে গেছেন তাঁরা। কিন্তু পৃথিবীর দৈন্য দশা ঘোচেনি। বিবর্তনের পথে প্রকৃতির আপন গতিবেগ নির্দিষ্ট, সে ত্বরা সয় না।

মানুষ অবশ্য তার আদরের ধন। তার এই প্রিয় সৃষ্টির মধ্য দিয়েই বিবর্তনের গতিপথ চিহ্নিত হবে। গুরুদেবের ভাষায়—ব্যক্তিসত্তাই বিবর্তনের চাবিকাঠি। মহাশূন্যের একটি ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে ধাপে ধাপে সে মানবত্ব লাভ করেছে। তারপর শুরু হয়েছে তার অগ্নিপরীক্ষা। সে হার মানেনি। জটিল অরণ্য ও শুষ্ক মরু, দুরন্ত নদীস্রোত ও দুরারোহ পর্বত পার হয়ে, ঝড় ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করে নিয়তই সে সামনে এগিয়ে চলেছে। আজ উঠেছে প্রচণ্ড ঝড়, দৃষ্টিরোধী তুষারবাত্যা তাকে কাদার দহে এসে আক্রমণ করেছে। দলগত অহংকারে, শক্তি ও রক্তের লালসায় সে এখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

তবু মানুষ এর হাত থেকে বাঁচতে পারে, যদি সে ইচ্ছা করে, যদি নিজের মধ্যে দিব্যমানবকে চিনতে পারে। কারণ, অন্তরের জ্যোতি ছাড়া আর কিছু দিয়েই পথ দেখা যাবে না। সে বেছে নিতে পারে অজ্ঞান, বেছে নিতে পারে পঙ্কসায়রে গলিতাস্থি হবার নিদারুণ ভবিতব্য। সে স্বাধীনতা তার আছে। কারণ, তাকে যুক্তি ও বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির বিবর্তন সে বন্ধ করতে পারে না। সে যদি সরে দাঁড়ায়, প্রকৃতি তাহলে অন্য মাধ্যম বেছে নেবে। গুরুদেবের সাবধান বাণী এই :

"যদি মানুষ পথে পিছিয়ে পড়ে থাকতে না চায়, সৃষ্টিব্যাকুল জননীর নব-নব সৃজনের হাতে বিজয়বৈজয়ন্তী তুলে দিতে না চায়, তাহলে তাকে এই উর্ধ্বায়নের অভীপ্সায় একাগ্র হতে হবে। সে উর্ধ্বায়ন প্রেমের মধ্য দিয়ে, আন্তর উদ্ভাসনের মধ্য দিয়ে, প্রাণের অধিকার ও আত্মদানের মধ্য দিয়েই ঘটবে বটে, কিন্তু অতিমানস ঐক্যের দিকেই হবে তার গতি। এই সব কিছুকেই তা ছাড়িয়ে যায় ও চরিতার্থ করে।"

এই সাবধানবাণী আমাকে ব্যাকুল করে না। তাঁর প্রেম তাঁর অসীম করুণায় আমার প্রত্যয় এতই গভীর। তিনি মানুষকে পথের পাশে পড়ে বিনষ্ট হতে দেবেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন : "ধর্ম যখনই ম্লান হয়ে আসে, ঘটে অন্যায়ের প্রকোপ, তখনই আমি মানবজন্ম নিই। সাধুর রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, যুগে যুগে আমি সম্ভব হই।"

এই ধরনের সঙ্কটগুলির পিছনে অবশ্য সব সময়েই একটা আধ্যাত্মিক বীজ ও সঙ্কল্প থাকে। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ কর্মের জন্য অবতারের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয় না। ইউরোপের রিফর্মেশন বা ফ্রান্সের বিপ্লবের মত যুগান্তকারী ঘটনাও গণচেতনার মধ্যে একটা অচল মানসিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল মাত্র। আধ্যাত্মিক কিছু

নয়। সুতরাং দিব্য অবতারের প্রত্যক্ষ পরিচালনার তাতে প্রয়োজন হয়নি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ভারতে যে সংকটকাল এসেছিল তা নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয় প্রেমবশতঃ পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, পাপীর ধ্বংস, সাধুর মুক্তি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য। আজ মানুষের যে সংকট উপস্থিত, তা আরও বহুগুণে গুরুতর। আজ মনে হচ্ছে মানুষ এতদিন পর্যন্ত যা সঞ্চয় করতে পেরেছে সবই নিঃশেষে গলিত। তার আদর্শ, তার মানদণ্ড, তার মূল্যবোধ সবই আজ বিকৃত। এখন অবিচারের রাজত্ব, ধর্ম এখন মুমূর্ষু। এখনই তাঁর আবির্ভাবের শুভলগ্ন। এবং তিনি এসেছেন। তাঁর পদপ্রান্তে যারা প্রণত, ভাগ্যবান তারা।

যে প্রভুর আমি পূজা করি—এই তাঁর রূপ। এখনও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি। এখনও তিনি বলেননি—"অজ্ঞ মোহগ্রস্ত মানুষ নররূপী আমাকে চেনে না, নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর বলে এখনও তারা আমায় জানে না।" কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ওই নয়ন! সেখানে যে অনির্বচনীয় প্রশান্তি, মহত্তম আশিসের স্বীকৃতি। ওই আনন! প্রতিটি রেখায় তার সার্বভৌম শক্তি, অপরিসীম করুণার স্বাক্ষর। স্বচ্ছ ওই দেহাধারে জ্ঞান-অজ্ঞান, স্বর্গ মর্ত্য সব কিছুর অতীত সেই চিরন্তনের কোমল-উজ্জ্বল দৈব জ্যোতির আবেশ!

প্রভু, জানি, তুমি দুষ্টের ধ্বংস ও শিষ্টের মুক্তির জন্য এসেছ। কিন্তু তুমি আরও এসেছ আমাদের দেখাতে—যে আমরা কি হয়ে উঠতে পারি। সাধারণতম মানুষ কেমন করে এই পার্থিব দেহে ঈশ্বরকে ধারণ করতে পারে। মানুষের মধ্যে তোমার অবতরণ মানুষকে ঈশ্বর পদবীতে উত্তীর্ণ করবে। তোমার অবতরণই আমার উত্তরণ।

এই হল প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ণ তাৎপর্য। বিক্ষিপ্তাত্মা পৃথিবী উপলব্ধি করুক এই সত্য; পূর্ণ আত্মসমর্পণের সঙ্গে অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিক সে ঊর্ধ্বে, ওই অতি-মানসলোকের দিকে।

"The Master as I See Him" নামে লেখকের ইংরাজী রচনা থেকে অনূদিত। অনুবাদ : শ্রীমতী বাণী বসু।

আমার স্মৃতিকথা

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেরই ফেব্রুয়ারি—বোধহয়, মাসের মাঝামাঝি বা শেষাশেষি হবে। রাত তখন প্রায় আটটা আন্দাজ। কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে চার নম্বর শ্যামপুকুর লেনের বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে একটি পরিণত বয়স্ক যুবককে ঘিরে কয়েকটি তরুণ বয়স্ক বসেছিলেন। পরিণত বয়স্ক যুবকটি ঘরের একমাত্র আসবাব একটি ছোট তক্তপোষের উপর বসেছিলেন এবং তরুণদের মধ্যে দু-একজন সেই তক্তপোষে এবং বাদবাকি মেঝের উপর স্থান গ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়স্ক যুবকটির সম্মুখে কাগজ এবং হাতে পেন্সিল। তিনি অটোমেটিক রাইটিং করছিলেন এবং তাই পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তরুণরা তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন এবং নানা প্রশ্নে সম্ভবতঃ পরলোকের আত্মাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলেন।

এই পরিণত বয়স্ক যুবকটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। আর তরুণরা যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবিজয়কুমার নাগ, শ্রীহেম সেন, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত এবং এই লেখক।...

...আত্মাদের লেখা বলে যদি কেউ মনে করেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত আগাগোড়া গুরুগম্ভীর তবে তিনি ভুল করবেন। আত্মাদের সবাই গুরুগম্ভীর নন—তাঁদের মধ্যেও রঙ্গ-রহস্য-কৌতুকপ্রিয় আছেন। সুতরাং সেই অটোমেটিক রাইটিঙের আসর কখনও গুরুগম্ভীর বাণীতে শুদ্ধ আবার কখনও হাস্য-কৌতুকে উচ্ছুসিত। এমনি যখন আত্মাদের

লেখনী পুরোদমে চলছিল তখন সেই ঘরে প্রবেশ করলেন রামবাবু।*…

রামবাবু ঘরে প্রবেশ করে একটু উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে অরবিন্দকে জানালেন যে তাঁর নামে আবার ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। বিশ্বাসযোগ্য খবর, কোন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী জানিয়েছেন। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিছুকাল আগে থেকেই কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল যে গবর্নমেণ্ট অরবিন্দকে আপন কুক্ষিগত না করে ছাড়বে না। তথাপি সংবাদ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল। যে স্থান ছিল হাস্য-কৌতুকে উচ্ছ্বসিত সেস্থানে নিবিড় স্তব্ধতা ছড়িয়ে গেল। প্রখর আলোক থেকে যেন হঠাৎ অন্ধকার। আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভাবলেন—কয়েক মুহূর্ত মাত্র—তারপর বললেন—'আমি চন্দননগরে যাব।'

রামবাবু বললেন—'এক্ষুনি?'

অরবিন্দ উত্তর করলেন—'এক্ষুনি—এই মুহূর্তে।'

অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালেন, এবং রামবাবুর সঙ্গে তিনি বাড়ি থেকে বেরুলেন। তাঁদের কিছু পশ্চাতে বেরুলেন বীরেন তাঁদের অনুসরণ করে এবং বীরেনের কিছু পশ্চাতে বেরুলাম আমি বীরেনকে অনুসরণ করে…একটা শোভাযাত্রা নয়, 'বোবাযাত্রা' অর্থাৎ Silent Procession তৈরি হল। চারজন লোকের এই 'বোবাযাত্রা' স্থূল জগতের অসংলগ্ন কিন্তু সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্মসূত্র দ্বারা গ্রথিত হয়ে উত্তর মুখে পথ চলতে লাগল।…

…প্রায় পনর কি বিশ মিনিট আন্দাজ চলে আমরা গঙ্গার এক ঘাটে এসে পৌঁছলাম। পূর্বেই বলেছি কলিকাতায় আমি

---

* শ্যামপুকুরের বৈঠকের নিয়মিত সভ্য এবং মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের বন্ধু, রামচন্দ্র মজুমদার, 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকার সহকারী।

কেবল এসেছি—তিন মাসও হয়নি—সুতরাং আমার তেমন পরিচিত নয়···বাগবাজারের ঘাট হতে পারে। সেই ঘাটে পৌঁছে নৌকার এক মাঝিকে উদ্দেশ করে রামবাবু হাঁক দিলেন—'আরে ভাড়া যাবি?'

কথাবার্তা শেষে অরবিন্দ সেই নৌকায় আরোহণ করলেন। তারপর বীরেন ও আমি তাতে উঠলাম। রামবাবু বিদায় নিলেন। নৌকা খুলে দিল। আমরা ভাগীরথী বক্ষে ভাসলাম।

নদীবক্ষে গিয়ে বোঝা গেল যে সেটা শুক্লপক্ষ, চতুর্দিক জ্যোৎস্নালোকে হাস্যোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে বীচিবিভঙ্গে ঝিকিমিকি।

কোথায় পুলিস, কোথায় নগর, কোথায় দ্বেষ-হিংসা-সংগ্রাম, স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন! আমরা যেন মানব-সভ্যতার দারুণ জঠর থেকে প্রকৃতির প্রশান্ত মুক্তির মাঝে ভূমিষ্ঠ হলাম।

পাঁচ বছর অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন। এখানেও ঐ একই ব্যাপার দেখতে পাই। প্রতিবেশ তার জারক-রসে সিদ্ধ ক'রে তাঁকে হজম করতে পারেনি। অর্থাৎ প্রতিবেশ তাঁর বিশ্ব-বিধাতা হ'য়ে ওঠেনি—সোনা-বাঁধানো সরেস ফাউণ্টেন পেন দিয়ে মুরুব্বিয়ানা-চালে তাঁর ললাটে তাঁর জীবন-কাহিনী লেখবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেনি—প্রতিবেশকে তাঁর অন্তরাত্মার দ্বারদেশের বাইরেই অপেক্ষা করতে হয়েছে 'জো-হুকুমজী' ভঙ্গীতে। রাজনীতির হুড়-হাঙ্গামার ভিতর দিয়েও অরবিন্দের জীবন-রথ তাঁর অন্তরাত্মার গন্তব্য লক্ষ্যের দিকেই চলেছে। কোনো প্রতিবেশ বা কোনো প্রতিবাসী তা ব্যাহত করতে পারেনি।

রাজনীতিতে একটা প্রচণ্ড নেশা আছে—এমন কি পরাধীন দেশের রাজনীতিতে এ-নেশার অসদ্ভাব নেই—যেটা সুরার নেশার চাইতে কম নয়। এই সুরা—মানে রাজনীতি-সুরা—একবার উদরস্থ

হ'লে, ওর নেশা একবার ধমনীতে ধমনীতে চারিয়ে গেলে মানুষ এমনি মশগুল হয়ে যায় যে তার পক্ষে তখন ও-রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসা দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। এর উপরে আবার পরাধীন দেশে যদি রাজনীতির সঙ্গে স্বাধীনতার আদর্শ ও তার জন্য সংগ্রাম যুক্ত হয় তবে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। তখন ঐ নেশার সঙ্গে এসে যোগ দেয় ত্যাগ দুঃখ ইত্যাদি বরণজনিত আত্মপ্রসাদ আত্মশ্লাঘা মহত্ববোধ ইত্যাদি মানুষের সূক্ষ্মতর উপভোগের সামগ্রী। যখন বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্রে এসেই সেখানকার পাকা পাকা দাড়িওয়ালা পরম হোমরাচোমড়াদের ডিঙিয়ে একেবারে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ালেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভারতব্যাপী তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল, তখন রাজনীতিটা তাঁর কাছে কল্পতরু বা কামধেনু কিম্বা open sesame জাতীয় কোনো ব্যাপার ব'লে প্রতীয়মান হওয়া উচিত ছিল। তিনি যদি ঐ রাজনীতিতেই থাকতেন তবে যে তিনি আজ ভারতের মুকুটহীন রাজা ব'লে পরিগণিত হ'তেন সেটা বলবার জন্যে জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তা হবার দরকার করে না। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। তাই আবার যখন ডাক এল—তখন দ্বিধাহীন চিত্তে প্রতিবেশকে পরিহার ক'রে মার্কসীয় থিয়োরীকে পরিহাস ক'রে তিনি যেমন আচম্বিতে একদিন রাজনীতিক্ষেত্রে এসেছিলেন তেমনি আচম্বিতে আবার সেখান থেকে চলে গেলেন।

…আজ বাংলাদেশে আধুনিক, অতি-আধুনিক ও সাম্প্রতিকেরা মিলে যেটাকে প্রগতি বলছেন সেটার আসল নাম হচ্ছে অধোগতি। অপর পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের মতো ব্যতিক্রমেরা হচ্ছেন বিশ্বমানবের ঊর্ধ্বগতির ধারক, বাহক ও নিরিখ। এঁদেরকে অস্বীকার করলে মানুষ তার আপনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা, গভীর যা, অবিনশ্বর ও অমৃত যা, তাকেই অস্বীকার করবে। কিন্তু নিশ্চিন্ত জানি মানুষের মধ্যেকার ইন্‌সৃটিংক্ট, তার সহজবোধই বিশ্বমানবকে কোনো দিনই দীর্ঘকাল

ব্যেপে এ অস্বীকার করতে দেবে না—দেবে না—দেবে না।

এমনি কৌশল বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই সত্য সম্বন্ধে একটা মহা তাজ্জব ব্যাপার আছে। এখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অস্বীকৃতি একটিমাত্র মানুষের স্বীকৃতি দিয়ে নাকচ হ'য়ে যায়—অর্থাৎ একটি মানুষের অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি কোটি কোটি মানুষের মন বুদ্ধি বা অহং-সৃষ্ট জল্পনা-কল্পনাকে নস্যাৎ করে দেয়।

এখন, মানুষ যে তার প্রতিবেশকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে কেবল তাই নয়, যেহেতু একটি মানুষের অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি কোটি কোটি মানুষের অহং-প্রসূত জল্পনা-কল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে সেই হেতু একটি মানুষের উপলব্ধ সত্য ও শক্তি তার প্রতিবেশকে পরিবর্তিতও করতে পারে। এমন ব্যাপার মানবজাতির ইতিহাসে বহুবার দেখা গিয়েছে। আমি পূর্বেই দেখিয়েছি যে শ্রীঅরবিন্দ সারাজীবন বার বার তাঁর প্রতিবেশকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের আত্মায় যে শক্তি সংহত ও সঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে সে-শক্তি ভবিষ্যতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশিত হবে প্রতিবেশ পরিবর্তিত করায়।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের জীবন এবং তাঁর শিক্ষার গূঢ় তাৎপর্য সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। তাঁর দর্শন হ'ল মানবাত্মার অশ্রান্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গ'ড়ে তোলা এক সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ চিন্তাধারা। এই আধ্যাত্মিক প্রয়াসের শিখরে উঠে যাওয়া আমাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনের ভাগ্যেই ঘটে। কারণ তার জন্য প্রয়োজন দেহমনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব, আর যে-জিনিষ আরো দুরূহ—সূক্ষ্মের খাতিরে স্থূলের মায়া ত্যাগ করা। অতীতে ঋষিরা উঠে গিয়েছিলেন এই স্থূলের দাবীর ঊর্ধ্বে—যুদ্ধ-বিগ্রহের ঊর্ধ্বে—সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ঊর্ধ্বে—সৃষ্টির শাশ্বত সত্যসমূহের অনুসন্ধানে।

ইতিহাসে আমাদের নিকটতর কালে দেখি শিখগুরু গোবিন্দ, শিষ্যবৃন্দের কাছ থেকে জাগতিক জীবন বিষয়ে তাঁর নেতৃত্ব-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন এরকম ক্ষণভঙ্গুর জিনিষ দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ না করতে। তেমনি ১৯২২ সালে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজনীতিক যজ্ঞে শ্রীঅরবিন্দের সাহায্য চান তখন এই ঋষিও তাতে অস্বীকার করলেন, জানালেন, পূর্ণ আধ্যাত্মিক সিদ্ধির অপেক্ষা করছেন তিনি, তা না হ'লে মানবজাতির প্রকৃত উদ্ধারের চেষ্টা শুধু বিভ্রমের সৃষ্টি করবে।

মহাযোগীর এই আধ্যাত্মিক প্রয়াস সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। শুধু বোধ করি কালের আহ্বান আজকের মত এত সুতীব্র আর কখনো হয়ে ওঠে নি। ভারতের ব্যাধি আজ পার্থিব জীবনের উপাদানসামগ্রীর ন্যূনতা নয়। আধ্যাত্মিক সম্পদের ভাণ্ডার আজ

তার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তার আত্মা খিন্ন, ক্রমেই আরো অবনত হয়ে চলেছে—কোন জয়ের লক্ষ্যে নয়, এমন এক সাংঘাতিক নৈতিক অধঃপতনের দিকে যে ভাবলেও ভয় হয়।

দেশের সরকারও এমনই এক পাপচক্রে বন্দী। নৈতিক আদর্শের সেখানে কোন মূল্য নেই। বড় বড় আদর্শের কথা, সে সব শুধু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের উচ্চ আসন থেকে উপদেশ হিসাবে বিতরণ করবার জন্য। যে-জাতি এক সময়ে এত মহৎ ছিল আজ সেখানে শুধু তার অতীত আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ মাত্র।

আসল কথা—আমরা আমাদের যথার্থ সংস্কৃতির পথ হারিয়ে ফেলেছি। একটা জাতির সংস্কৃতি, শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, মোটের ওপর বলা যেতে পারে একটা জীবন-চেতনার ত্রিবিধ প্রকাশ। তাঁর ভাষায়. 'এক রয়েছে চিন্তার দিক, আদর্শের দিক, উধ্বর্মুখী এষণা এবং অন্তরাত্মার অভীপ্সার দিক; এক সৃজনক্ষম আত্মপ্রকাশের এবং উদার সৌন্দর্যবোধের দিক, বুদ্ধি ও কল্পনার দিক; আর এক রয়েছে বাস্তব করিৎকর্মের এবং স্থূলের দিক।' সংস্কৃতির এই তিনটি দিকের মধ্যে প্রথমটি হ'ল দর্শন এবং ধর্ম নিয়ে; শিল্প, কাব্য, সাহিত্য, দ্বিতীয়টি নিয়ে; সমাজ ও রাজনীতি তৃতীয়টি নিয়ে। কিন্তু যে মূলভাবটি ভারতবাসীর জীবন, সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছিল তা হ'ল মানুষের সত্যকার আধ্যাত্মিক সত্তার ও জীবনের সার্থকতার অন্বেষণ। এই মহান আদর্শ থেকে আমরা সরে গিয়েছি। আজ আমাদের সমস্ত কাজকর্মের প্রেরণা জোগায় একটা রক্তমাংসের ক্ষুধা, এমন কি সংস্কৃতির প্রথম দুটি ক্ষেত্রেও আমরা একে ছাড়িয়ে যেতে পারছি না। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার—আর্ত মানুষ যেখানে এসে শিখবে জীবনের শাশ্বত সত্য সব—বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তো এই। আর শ্রীঅরবিন্দের নামের সঙ্গে তার যোগ থাকা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তই

হয়েছে। আর তার শান্তিনিকেতনের সহোদরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সে-ও যে ভারতের রূপ নিল তা-ও ঠিক যথাযথ হয়েছে, কত মানব কত সভ্যতা এখানে এসে মিশল, আশ্রয় পেল। এই সমন্বয়, এই মিলনের ভাষা উপনিষদের তিনটি কথায় রূপ নিয়েছে—শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বলেছেন। তিনি আরো এগিয়ে গিয়েছেন, বলেছেন ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির এই সমন্বয় স্পৃহা 'শুধু বেদবেদান্তের দুর্গম শিখরগামী সাধক গুণী এবং মনীষীদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, তা জনসাধারণের মনেও ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে।'

এখানে, এই পুণ্য ভারতভূমিতেই, প্রথম সমন্বয়ের বাণী উঠেছিল, এখান থেকেই তা গিয়ে বিশ্ব জয় করেছিল, আর এখানে এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে পণ্ডিতেরা মিলিত হবেন এবং ভারত তথা বিশ্বের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় খুলে দেবেন। এ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক অবদানের কথাই আমি বললাম, যদিও এই অবদান এখনকার বোধির কর্ণে হয়ত প্রবেশ করবে না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক আভ্যন্তরীণ মুক্তিই মানুষের জীবনে সত্যকার পূর্ণাঙ্গ শৃঙ্খলা গ'ড়ে তুলতে পারে। তবে তার এই মুক্তি মানুষের নিম্নতম শরীর, প্রাণিক এবং মানসিক, প্রকৃতিকে এড়িয়ে যেতে চায় না, যেতে পারে না। আধ্যাত্মিক যুগে এসে পৌঁছতে হ'লে উপরোক্ত তিনটি স্তরের তিন যুগের ভিতর দিয়ে আসতে হবে। তৃতীয়টি পোঁছায় অন্তর্মুখীনতার যুগে। মধ্যবর্তী স্তরগুলি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে মানবজাতিরই বিপদ ডেকে আনা হবে, তা সম্ভব শুধু বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে। মানুষের আধ্যাত্মিক অভিযানে দেহ মন শরীরকে পূর্ণ মর্যাদা দিতেই হবে। তবু, পূর্ণতম সিদ্ধি হয়ত কয়েকজনের জন্যেই থাকবে, তবে যে অনুশীলন-প্রণালীর নির্দেশ তাঁরা

দেন তা সর্বজনের জন্য, তাদের অজ্ঞান প্রকৃতি থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উঠে যাবার জন্য। এই অপরূপ প্রয়াস শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কী রকম মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দের জীবন শুরু হয় ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার উদ্দীপনা নিয়ে। তার থেকে এক বিস্ময়কর ঘটনার সূত্রপাত—কারাগারে তিনি পেলেন ভগবৎদর্শন। রুদ্ধ বাতায়ন খুলে গেল—তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। যে অদম্য উৎসাহ নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছিলেন তিনি, সেই একই সমান উৎসাহ নিয়ে চললেন আত্মার মুক্তি-সন্ধানে। দুই অরবিন্দ তখন পরস্পরে মিশে গেল—এক অরবিন্দ কর্মবীর যোদ্ধা, অন্য অরবিন্দ যোগী। তা' হ'লেও তাঁর প্রথম জীবনের দেশপ্রেমকে মণ্ডিত করেছিল একটা আধ্যাত্মিকতার সৌরভ। অরবিন্দ খাঁটি ভারতীয়। আমরা যখন তাঁর বই পড়ি তখন মনে হয় যেন তাঁর মূর্তি আমাদের শুচি-শুভ্র শাস্ত্রগ্রন্থের পৃষ্ঠা থেকে ভেসে উঠছে, সেখানে সঞ্চিত সমস্ত জ্ঞানের প্রতিমূর্তি যেন তিনি, এক যুগসন্ধিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সে-জ্ঞান হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত। আমি নিশ্চিত জানি এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক—হিংসা-দ্বেষ, সন্দেহহীন সংঘাতে আকীর্ণ উষর মরুভূমিতে শ্যামল মরুদ্যানের মতো।

[১৯৫১ সালে পণ্ডিচেরীতে 'অরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের' প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ।]

শিক্ষাবিদ শ্রীঅরবিন্দ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দ যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে-যুগকে গৌরবান্বিত করিয়া দিয়াছেন, সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের তিনি অন্যতম। শিক্ষাবিদ রূপে তিনি বরোদায় কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলকাতায় তাঁহার ছাত্রদিগকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিবার অধিক সুযোগ লাভ করিবেন মনে করিয়াই তিনি শিক্ষাবিদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বরোদা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রাম কেবল অর্থনীতিক ও রাজনীতিক নয়, পরন্তু মনস্তত্ত্বসম্পর্কিতও বটে।

...তিনি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। সেই ভবিষ্যতে তিনি যে নূতন পৃথিবী দেখিয়াছিলেন আধ্যাত্মিকতাই যে তাহার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিতে পারে সে বিশ্বাস তাঁহার মর্মে দৃঢ় হইয়াছিল। ইতিহাসের শিক্ষায় তিনি বুঝিয়াছিলেন...ভারতবর্ষ এখনও জীবিত আছে---তাহার আধ্যাত্মিকতাই তাহাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়াছে।...

রাজনীতিক স্বাধীনতা মুখ্য লক্ষ্য নহে—উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাহার প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশ। আজ দেশে যে শিক্ষা প্রচলিত তাহা সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল নহে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, 'আমরা শিক্ষার নূতন উদ্দেশ্য কেবল বুঝিতেছি। শিক্ষার্থীকে তাহার মানসিক, শৌর্যবিষয়ক, আবেগ-সম্পর্কিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা ও সামাজিক জীবন, তাহার স্বভাব ও শক্তি অনুসারে পুষ্ট করিতে হইবে।' তাহার সহিত বর্তমান শিক্ষার প্রভেদ সপ্রকাশ—বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রতিরোধকারী

মস্তিষ্কে অবিচলিত জ্ঞান এবং তাহার বিরোধী প্রবলভাবে স্থিতি-স্থাপকতাবর্জিত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করাই উদ্দেশ্য।

…শিক্ষাপদ্ধতি শ্রীঅরবিন্দের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেইজন্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তাহা কেবল বিদ্যাই দিবে না, পরন্তু শিক্ষার্থীকে উন্নত জীবনের পথে অগ্রসর করিবে।…যে নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছিলেন তাহারই উপযুক্ত সমাজ সৃষ্টি করিবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি। জাতিধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর যে-কোনও ভাগ হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া জ্ঞানের যে-কোনও বিভাগে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।

এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সাধারণ নহে—কিন্তু যিনি ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই ন্যায় অসাধারণ পুরুষের উপযুক্ত।

…ব্যথিত পীড়িত ও হতাশ পৃথিবীর পুনরুজ্জীবিত করিবার—প্রাচী-র পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিরায় শোণিত সঞ্চারিত করিবার ও প্রতীচীর জড়বাদ-বিড়ম্বিত ব্যাধি প্রাচী-র আধ্যাত্মিকতার দ্বারা আরোগ্য করিবার জন্য যে মহাসত্যের পাবনীধারার প্রয়োজন—এই শিক্ষা-কেন্দ্রের উৎস হইতে তাহা উদ্গত হইবে। তাহা হইলেই উদ্ভূত হইবে নবধরণী।

আমরা আশা করি, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া যে প্রশস্ত দিবা-র সূচনা করিবে, তাহা নূতন উষার কনককিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া মানবজাতিকে অভূতপূর্ব উন্নতির রাজ্যে লইয়া যাইবে।

আমরা যে দেশমাতৃকার পূজা করি—যাহার মন্দিরে শ্রীঅরবিন্দ পূজারী ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন—সেই দেশমাতৃকার আশীর্বাদে এই পরিকল্পনা পূত। আজ শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠ নীরব—

লেখনী স্তব্ধ; কিন্তু তিনি যেন তাঁহার সমাধির অন্তরাল হইতে তূর্যনাদে মানবসমাজকে বলিতেছেন :

When all the temple is prepared within,
Why nods the drowsy worshipper outside ?

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (পণ্ডিচেরী) প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের একটি ভাষণ।

✻

শ্রীঅরবিন্দের-কথা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা দেখি নি। আজকের স্বাধীন বাংলার যারা তরুণ-তরুণী, তারা রূপকথার গল্পের মতন শুনেছে, উনিশশো পাঁচ-এ বাংলাদেশে এসেছিল যে প্রাণের জোয়ার, তার কথা। রূপকথার গল্প শুনতে ভাল লাগে, প্রতিদিনের জীবনের বাস্তবতায় তা জোগাতে পারে না চলৎ-শক্তি, প্রাণরস। সে হলো সুদূর। আজকের বাঙালী তরুণ-তরুণীদের কাছে তার ইতিহাসের সেই অতি-নিকটবর্তী স্বর্ণযুগ পড়ে আছে সুদূর রূপকথার মতনই। সে-যুগ থেকে এ-যুগে যাতায়াতের যে পথ, একান্ত বেদনার বিষয়, তা গিয়েছে হারিয়ে আজকে আমাদের কাছে।

আমাদের যৌবনে, আমাদের জাগরণ-লগ্নে, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভয়-ভাবনায় আমাদের উন্মীলিত চেতনায় আমরা দেখেছি গান্ধী-মহারাজকে, দেশবন্ধুকে, সুভাষচন্দ্র আর পণ্ডিত নেহরুকে, আমরা শুনেছি সত্যাগ্রহের বাণী, অহিংসার মন্ত্র, অসহযোগের নিরুপদ্রব সংহিতা, কংগ্রেসের বিজয়-দুন্দুভি। আমাদের যৌবন, কংগ্রেসের যৌবন। আমাদের বাস্তবতা, কংগ্রেসের বাস্তবতা। একটা সম্পূর্ণ নতুন সংগ্রামের মধ্যে, একটা সম্পূর্ণ নতুন চেতনার মধ্যে আজকের তরুণ-তরুণীদের চেতনা গড়ে উঠেছে।

আমাদের চেতনায় চোখের সামনে জাগতে দেখেছি কংগ্রেসী ভারতবর্ষকে, চোখের বাইরে দেখেছি লেনিন-স্টালিনের সোভিয়েট রাশিয়াকে। আমাদের ইতিহাস-পুরুষ হলো দেশে গান্ধী-মহারাজ, দেশের বাইরে লেনিন-স্টালিন। আমাদের চেতনার আকাশকে

পরিব্যাপ্ত করে আছে, গান্ধী, লেনিন আর স্টালিনের ব্যক্তিত্বের দ্যুতি। এবং এই দ্যুতির বাস্তবতার আড়ালে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে সেই যুগ, যাকে এনেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, ধারণ করেছিলেন বিবেকানন্দ, পোষণ আর পালন করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

গান্ধী মহারাজকে আমরা দেখেছি জয়ী হতে, দেখেছি কংগ্রেসকে নিতে ইংরেজের হাত থেকে দেশের শাসনভার, দেখেছি গান্ধী-মহারাজের জীবনের অপূর্ব এপিক অবসান।

দেশের বাইরে দেখেছি জগতের বিরোধিতার বিরুদ্ধে স্টালিনকে জয়ী হতে, দেখেছি চোখের সামনে কম্যুনিস্ট রাশিয়াকে এক যুগের মধ্যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হতে,···দেখেছি জগতে অজেয়-বলে ঘোষিত হিটলারের শক্তির বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার এপিক সংগ্রামের গৌরব।···তাই আমাদের যৌবনের সমস্ত বীরপূজার ক্ষুধা মিটিয়ে আমাদের চেতনার আকাশকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন গান্ধীজী, স্টালিন আর নেতাজী···আমাদের সমস্ত তত্ত্বপিপাসাকে কেন্দ্র করে রয়েছে গান্ধীবাদ আর মার্কসবাদ, সেখানে শ্রীঅরবিন্দের স্থান কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ যে-জীবন-তত্ত্বের বাহক, সেখানে কি মূল্য সে-তত্ত্বের?

আজ বাংলাদেশে, আমার চারিদিকে অসংখ্য অগণিত লোক রয়েছেন, যাঁরা জানেন না বাংলার ইতিহাসে এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের স্থান কোথায়। অধিকাংশ লোকের কাছে শ্রীঅরবিন্দ হলেন, অতি-দুর্জ্ঞেয় অতি-মানসনামধেয় কোন এক রহস্যময় তত্ত্বের ততোধিক রহস্যময় প্রবর্ত্তক, বিপ্লব-আন্দোলনের ভূতপূর্ব একজন নেতা,—ভারতবর্ষের জল হাওয়ার গুণে যিনি কর্মবিমুখ হয়ে সংগোপন-সন্ন্যাসের মধ্যে শিষ্য-সামন্ত নিয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রমগুরুর জীবন-যাপন করে গেলেন। এবং পাশ্চাত্য

সাইকোলজীর ছাত্র হিসাবে কোন কোন বিজ্ঞ মনে করেন, আজকের এই কর্মমুখর যুগে শ্রীঅরবিন্দের এই সংগোপন-সন্ন্যাসজীবন হল, বিজ্ঞ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের ভাষায়, এস্কেপিজিম্ অর্থাৎ আমাদের দেশের গেঁয়ো লোকেরা যাকে বলে, পালিয়ে বাঁচা।

কেউ কেউ অত বিচার-বিবেচনার মধ্যে না গিয়ে, অন্তরের সহজ শ্রদ্ধায় তাঁকে একজন চিরাচরিত মহাযোগী বলে ধরে নিয়েই সন্তুষ্ট. যিনি পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ভাবধারার একটা সমন্বয়-চেষ্টা করেছিলেন। আর একদল আছেন যাঁরা দক্ষিণেশ্বর আর পণ্ডিচেরিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান মনে করেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা চিরাচরিত প্রথায় কোন্-দেবতা-বড় সেই ঝগড়ায় আসর গরম করে রাখতে চান। এবং সর্বশেষে আমাদের দেশে এমন লোকও আছেন, যাঁরা শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে প্রকাশ্যে অতি হেয় উক্তি করতেও লজ্জিত হন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় যেমন এই দেশেরই এক শ্রেণীর লোক অবজ্ঞায় তাঁকে বাতুল বলে উপেক্ষা করতো।

এই পরিস্থিতির মধ্যে সহসা শ্রীঅরবিন্দ এমনভাবে দেহরক্ষা করলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের রহস্যবোধ আরো বেড়েই গেল।...

আজও দেখছি সেই এক দৃশ্য, পরশ-পাথরের সন্ধানে ক্ষেপা জনসমুদ্রের কূলে কূলে নুড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে...আজও সে জানে না, নুড়ি মনে করে সে পরশ-পাথরকেই কখন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সমুদ্রের অতলে।

মহাবেদনায় তাই আজ ভাবি, মানবসভ্যতার ইতিহাস কি অনাদিকাল ধরে হয়ে থাকবে সেই একই ভুলের নিত্য নব পুনরাবৃত্তি?...তার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা-বিজ্ঞান সত্ত্বেও কি বারবার

সে সোনার মূল্যে রাঙতা কিনেই চলবে? যে অমূল্য বস্তুকে সে মনে মনে খুঁজছে, বাইরে বারবার মূল্যহীন বলে তাকেই কি করবে প্রত্যাখ্যান? ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বারবার কি মানুষের কাছে এসে ফিরে যাবে মানুষের উপেক্ষা আর অনাদর নিয়ে? কত বুদ্ধ, কত যীশু, কত শঙ্কর, কত চৈতন্য, কত রামকৃষ্ণ, কত বিবেকানন্দ, কত শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজন, শুধু একটা সহজতত্ত্ব মানুষকে বোঝাতে? যে দেশের মাটিতে আজও পড়ে আছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের পায়ের চিহ্ন, সে দেশের লোকের কাছে কেন থাকে শ্রীঅরবিন্দ অপরিচিত?

যে বেদনায় বিবেকানন্দকে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল, যে বেদনায় মহাত্মা গান্ধীকে সজ্ঞানে মৃত্যুকে আহ্বান করতে হয়েছিল, হে তরুণ ভারত, তুমি যদি আজও তা উপলব্ধি না কর, তা হলে কে তা উপলব্ধি করবে?

আজও কি তুমি উপলব্ধি করতে পারলে না, সেই একই মহাবেদনায় তোমার ভারতবর্ষের আর একজন মহা-ঋষি মৃত্যু-উত্তীর্ণ হবার মহাসাধনায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুর তলদেশে অবগাহন করলেন?

মানবসাধনার এতবড় পরীক্ষা তোমার সামনে সংঘটিত হয়ে গেল, অথচ তুমি নির্বিকার, নিশ্চেতন! এই ঐতিহাসিক অন্ধতার অভিশাপ থেকে কবে মুক্ত হবে, হে আমার তরুণ ভারত?

ভারতবাসী হিসাবে আমার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিশ্বাস হলো, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের একটা বিশেষ স্থান আছে, মানবচেতনার একটা বিশেষ সত্যকে জন্ম দেওয়াই হলো ভারত-ইতিহাসের নিগূঢ় সার্থকতা এবং মানব-সভ্যতার প্রথম থেকেই একটা বৈজ্ঞানিক অনিবার্য ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই মহাসত্যের ক্রমবিবর্তন সংঘটিত হয়ে চলেছে। এই বিশ্বাস কোন অন্ধ ভক্তির ফল নয়, কোন জন্মগত দেশপ্রীতির উন্মাদ নিদর্শন নয়,

যুক্তি ও জ্ঞানের বাস্তব পন্থায় জগতের সমস্ত সাহিত্য আর ইতিহাস অনুশীলনে এই সিদ্ধান্ত অঙ্কশাস্ত্রসম্মতভাবে আজকের যুগে প্রকট হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন দেশের সমস্ত চেতনাকে এক করে বিংশ-শতাব্দীর ইতিহাস আজ মানবচেতনাকে যেখানে এনে উপস্থিত করেছে, সেখানে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বিশ্বমানব-চেতনায় আজ ভারতবর্ষ নবজন্ম লাভ করছে, এইটেই হলো আজকের ইতিহাসের চরম লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। এবং এ-ভারতবর্ষ শুধু নেহরু আর প্যাটেলের ভারতবর্ষ নয়, এ ভারতবর্ষ রেশন আর অন্নাভাবের ভারতবর্ষ নয়, এ ভারতবর্ষ হলো এই দৈন্যময় খোলসের উর্ধ্বে শাশ্বত এক ভারতবর্ষ, যার গান গেয়ে গিয়েছেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আর শ্রীঅরবিন্দ। বিবেকানন্দের পরিকল্পনা ছিল, এই ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনি রচনা করে যাবেন এবং তার জন্যে তিনি একটা খসড়াও তৈরী করেছিলেন। সেই অপূর্ব পরিকল্পনার মধ্যে বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, এই ভারতবর্ষকে কেউ পরাজিত করতে পারে নি, এই ভারতবর্ষকে কোন দৈন্য, কোন গ্লানি, কোন অপঘাত স্পর্শ করতে পারে নি। অন্তরের চিরসম্রাজ্ঞী, অপরাজেয় এই ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষকে আজ ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য জগৎ চিনতে আরম্ভ করেছে এবং একদিন পশ্চিম তার একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনায় এই ভারতবর্ষের কাছেই এসে পৌঁছবে। আজকের সভ্যতার ইতিহাস হল সেই নবপরিচয়ের সূচনার ইতিহাস···মহাজ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ব আর পশ্চিমের ইতিহাস। তার সূচনা হয়ে গিয়েছে। চারিদিকের রাজনৈতিক ভাঙাগড়া আর রাজনৈতিক মাতামাতির আড়ালে মানব-ইতিহাসের সেই মহাসৌধই গড়ে উঠছে যেখানে একদিন মহামানবের মিলন-তীরে মানুষ তার দীর্ঘযাত্রাপথের শেষে এসে মিলিত হবে। আজকের বাইরের জগতের বেদনাবিক্ষুব্ধ শত চাঞ্চল্যের আড়ালে মানবের সেই

চিরন্তন স্বপ্নই দেখেছি ধীরে ধীরে সত্য হয়ে উঠছে। এবং আজকের রাজনীতিকরা জগতের যে ইতিহাস রচনা করছে, সে-মিথ্যা-ইতিহাসের বিরাট ভগ্নস্তূপের পাশে সেদিন মাথা তুলে উঠবে, আজকে যাদের বা যেসব ঘটনাকে আমরা রাজনৈতিক বাস্তবতার কুৎসিত ব্যস্ততায় অবজ্ঞা করে চলেছি। মানব-সভ্যতার সত্যকারের ইতিহাস অলিখিতই রয়ে যাচ্ছে। আগে যেখানে থাকতো রাজ-রাজড়া আর সেনাপতিদের নাম, এখন সেখানে থাকছে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতাদের আর তাঁদের নিযুক্ত সেনাপতির নাম। অথচ আমরা সবাই জানি, সেদিনের রাজা-রাজড়ারা বা সেনাপতিরা পারেন নি, আজকের রাজনীতিকরাও পারবেন না অনাগত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আজকের দিনের সুরভিকে, আজকের দিনের সূর্যের আলোকে। অনাগত মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে আজকের দিনের সুরভিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতারই একটি লাইন, আজকের দিনের সূর্যের আলোর আশীর্বাদকে অনাগত মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটি কথাই, বিবেকানন্দের একটা উক্তিই, শ্রীঅরবিন্দের একটা আশ্বাসবাণী-ই। তাঁরাই পারেন, তাঁদের জীবন দিয়ে সংযুক্ত করতে পলায়নপর আজকের সঙ্গে অনাগত অনাদি কালকে। তাঁদের জীবনই হল সেই অলক্ষ্য স্বর্ণরজ্জু যাতে বিধৃত হয়ে আছে অখণ্ড মহাকাল। তাঁরাই হলেন মানব-ইতিহাসের নিত্যসম্পদ। মহাকালের অন্তঃপুরবাসী। মানব-ইতিহাসের ধারক ও বাহক। মহাদেব তাঁর জটায় যেমন ধারণ করেছিলেন গঙ্গার উন্মাদ গতি-তরঙ্গ, তেমনি এঁরাই এঁদের জীবনে ধারণ করে আছেন নিত্যবহমান কালতরঙ্গের উন্মাদ-গতিবেগকে। শ্রীঅরবিন্দ হলেন সেই কালতরঙ্গ-বাহী ধূর্জটীরই শেষতম অবতার।

তাই ঊনবিংশ-শতাব্দীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে নি শুধু গঙ্গার ধারে বাংলার ছোট্ট একটা গণ্ডগ্রামে, তাঁর আবির্ভাব

ঘটেছিল উনবিংশ-শতাব্দীর বিশ্বের বিরাট প্রাঙ্গণে। মানব-ইতিহাসেরই অন্তঃস্থলে। আজ সময় এসেছে, এই ঘটনাকে তার প্রকৃত পটভূমিকায় উপলব্ধি করবার। কারণ এই ঘটনার অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায়ই শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব ঘটে।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে সাধনার সূচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে শুধু তাঁর গুটীকতক শিষ্যের জীবনেরই সংযোগ ছিল না, কিংবা বাংলার সামাজিক জীবনেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না, সে সাধনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিল বিশ্বমানবের চিন্তাধারা। তাঁর আবির্ভাব উনবিংশ-শতাব্দীর পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্ব-প্রয়োজনীয় ঘটনা। এবং তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্যকেই সম্পূর্ণ করে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ।

উনবিংশ-শতাব্দীতে নবলব্ধ বিজ্ঞানের সহায়ে পাশ্চাত্য জগৎ যখন একটা বিরাট নতুন শক্তির মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো, সেই নতুন শক্তির প্রবল তেজে যখন পুরাতন পৃথিবীর জরাজীর্ণ মানসিক সম্বলের যা-কিছু অবশেষ ছিল সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে যাবার মতন হলো, সেই সময়ে মানবধর্মের মর্মান্তিক প্রয়োজনই ভারতবর্ষে পুনরায় প্রকট হয়ে উঠলো ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আশ্রয় করে মানুষের চিরন্তন আত্মিক শক্তি, যা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্বজগতে মানুষের অনাচারে, আলস্যে ও কদাচারে জীর্ণ, পঙ্গু ও নিক্রিয় হয়ে এসেছিল।

পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞান তার প্রত্যক্ষবাদকে নিয়ে জড়কে যে চরম মূল্য প্রদান করলো, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জাগতিক কল্যাণের যে সব বাস্তব সুবিধা যাদুকরের মতন তার সামনে উপস্থিত করলো, সুবিধাবাদী মানুষ বিজ্ঞানের সেই প্রত্যক্ষ বরদাত্রীরূপে সম্মোহিত হয়ে, তার নির্দেশ অনুযায়ী জড়কেই জীবনের একমাত্র সত্যরূপে গ্রহণ করলো। মানুষের সমস্ত মূল্যমান গেল বদলে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মহাকল্যাণের মূর্তিতে দেখা দিল এক মহাসংকট। বিপন্ন

হয়ে উঠলো আত্মার অস্তিত্ব···মানুষের সংজ্ঞা গেল বদলে···মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার সমগ্র রূপ গেল পরিবর্তিত হয়ে···বিজ্ঞান অস্বীকার করলো মানবের আত্মিক শক্তিকে···মানুষ হল শুধু গোণা-যায় এমন অসংখ্য জীবাণুকোষের সমষ্টিমাত্র···তার শক্তির সীমানা নির্ভর করে সেই জীবাণুকোষের শক্তির আর বুদ্ধির ওপর। সেই জীবাণুকোষের সমষ্টির বাইরে মানুষের মধ্যে নেই আর কোন শক্তি। বেদে, পুরাণে, উপনিষদে, জগতের বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার ধর্মগ্রন্থে, অসংখ্য ঋষি আর সাধকদের জীবনে যে অদৃশ্য আত্মিক-শক্তির কাহিনী উল্লিখিত আছে যুগ-যুগান্ত ধরে মৃত্যুশীল মানুষের যে অমরত্ব-প্রয়াস···এই মর্ত্যজীবনে ভগবানের মতন ষড়ৈশ্বর্যশালী হওয়ার মানুষের যে দিব্যসাধনা, সে শুধু মানুষের কল্পনাবিলাস। বিজ্ঞান তার যন্ত্রপাতি নিয়ে, তার অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে, তার ল্যাবরেটরীতে প্রমাণ করে দেখালো ঈশ্বর মৃত-বস্তু, আত্মা শুধু কল্পনা, ধ্যান-ধারণা-যোগ-সাধনা শুধু পুরোহিতদের আবিষ্কৃত মানুষের অজ্ঞতা আর ভয়ের সুযোগে নিজেদের ধর্মব্যবসাকে বিস্তার করবার সুচতুর কৌশল। ঊনবিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য জগৎ এতদিন পরে ধ্বংস করতে উদ্যত হল ভারতবর্ষকে, শাশ্বত ভারতবর্ষকে যে-ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাইরের জগতের শত লাঞ্ছনাকে সহ্য করেও সংগোপনে বাঁচিয়ে রেখেছিল মানুষের অমরত্ব-স্বপ্নকে, আত্মার অমিত সম্ভাবনাকে। বিজয়ী পশ্চিমের সংস্পর্শে ভারতবর্ষ নিদারুণ লজ্জায় নিজের দিকে চেয়ে দেখলো, দেখলো সে আজ কত ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে, শিক্ষাহীন, অন্নহীন, অর্থহীন, পরাধীন, জগতের অবজ্ঞেয় একজাতি। এবং বিজয়ী পশ্চিম তার এই বিক্ষুব্ধ মনের সামনে তার এই হীন অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখালো, অতিরিক্ত আত্মিকতাই ভারতবর্ষের এই অধঃপতনের মূল, পরলোকের দুশ্চিন্তায় সে হারিয়েছে ইহলোকের সম্পদ, তার ধর্মই হয়েছে তার কাল। দুর্বল স্নায়ুগ্রস্ত লোক যেমন

প্রবলের যে কোন হুমকীকে চরম যুক্তি বলে গ্রহণ করে, পরাজিত মুমূর্ষু দুর্বল ভারতবর্ষও বিজয়ী পশ্চিমের এই ব্যাখ্যাকে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করলো এবং তার আত্মিক শক্তির যা কিছু অবশেষ পড়ে ছিল, তাকে লজ্জায় অস্বীকার করে কোমর বেঁধে বৈজ্ঞানিক পশ্চিমের অনুকরণে বস্তুগত ও রাজনীতিগত শক্তি অর্জনের দিকেই দৃষ্টি দিলো এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-সত্যই হলো তার কাছে একমাত্র আরাধ্য-সত্য। ভারতবর্ষ ভুলে গেল তার ইতিহাসের সুমহান দায়িত্ব; তার বাস্তব পরাধীনতা আর দুর্বলতার লজ্জায় সে মুখ ফুটে আর স্বীকার করতে পারলো না, মানব-সভ্যতাকে তার সুমহান ভবিতব্যতায় পৌঁছে দেওয়াই হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের একমাত্র তাৎপর্য এবং সেই সুনিশ্চিত সম্ভাবনার আদর্শ-ই শত শত যুগ ধরে ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাসে অভিব্যক্ত হয়ে আছে; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রত্যক্ষ দীপ্তিতে পরাধীন হীনবল ভারতবর্ষ ভুলে গেল তার ইতিহাসের আদর্শকে, ভুলে গেল তার চিরাচরিত মূল্যমানকে; পরাজিতের লজ্জায়, দুর্বলের অক্ষমতায় সে বিজয়ী পশ্চিমের প্রত্যক্ষবাদের সামনে মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করলো, পশ্চিমের মূল্যমানকে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করলো, এবং পশ্চিমের অনুকরণে বাইরের শক্তিকে অর্জন করে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক সমকক্ষতা অর্জন করাই হলো তার একমাত্র লক্ষ্য। ঊনবিংশ-শতাব্দীতে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের এই আত্মবিস্মরণ হলো, বর্তমান যুগের সভ্যতার চরম সংকট এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের চরম অধঃপতন। বাইরের দিক থেকে ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষের পরাধীনতা হলো সেই বিরাট সংকটের একটা লক্ষণ মাত্র।

মানব-সভ্যতার এবং ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাসের এই মহাসংকটের বুকেই জন্মগ্রহণ করলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ···ভারতবর্ষের অবিনাশী আত্মার প্রতীকস্বরূপ। মানব-সভ্যতার যে চরম পরিণতিকে

সত্য করে তোলবার প্রতিশ্রুতি ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে, তার চরম সংকটের লগ্নে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনিবার্য ধারাবাহিকতায় আবির্ভূত হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই মহাসত্যকে বাইরের দীনতার অপঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আগমনের পূর্ণ তাৎপর্য সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি ; শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরাচরিত একজন ধর্মসাধকরূপেই তাঁকে আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু আজ পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা যতই প্রকট হয়ে উঠছে, ততই আমরা বুঝতে পারছি, মানব-সভ্যতার কোন নিদারুণ সমস্যার সমাধান করবার জন্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাই সেদিন বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যে বিরাট সাধনার সূত্রপাত হয়েছে, এখনো তা সম্পূর্ণ হয় নি। এবং সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বিরাট সাধনার সূত্রপাত করেছিলেন, বিবেকানন্দের পর, শ্রীঅরবিন্দই তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে প্রকট করে গেলেন। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মানব-সাধনার চরম সংকটের লগ্নে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মানব-সভ্যতার গতির যে পথনির্দেশ করে গেলেন, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য সেই পথ অনুসরণ করে সেই আদর্শকেই বিশ্বমানবের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়ে গেলেন, বিবেকানন্দের সেই অসমাপ্ত কাজকেই সম্পূর্ণ করে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ—শ্রীঅরবিন্দের জীবনে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বিশেষ অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহণ করলো। ভারতের ইতিহাসের মধ্যে মানবতার চরম অভিব্যক্তির যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল, এই তিনজন মহাপুরুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকায় তা অখণ্ডভাবে পরিপূরিত হয়েছে। বাইরের হীনবল অসহায় ভারতবর্ষের বাস্তবতার আড়ালে যে অবিনাশী শাশ্বত ভারতবর্ষ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, ভারত-ধর্মতত্ত্বের ত্রিমূর্তির মত এই তিনজন মহাপুরুষ সেই শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বচেতনার মানচিত্রে

চিরদীপ্যমান করে দিয়ে গেলেন। এবং একদিন সমগ্র জগৎকে যে ভারতবর্ষের কাছে মাথা নত করে আসতে হবে, আমাদের চরম সৌভাগ্য, আমাদের চোখের সামনে দেখলাম, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সেই অমর ভারতবর্ষের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রবাণীতে শুনলাম, সেই ভারত যজ্ঞে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণলিপি—বেদে উপনিষদে ছিল ভারত-ঋষির অমৃতত্বের যে প্রতিশ্রুতি, শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনে পেলাম তার পরিপূর্তি।

শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান বিশ্বসভ্যতার আভ্যন্তরিক ইতিহাস লিখে গিয়েছেন; তাঁর সেই অমর গ্রন্থগুলি* ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কাছে মানবসভ্যতার দিগ্‌দর্শন হয়ে থাকবে, তাতে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন, আজ সমগ্র বিশ্বে একদিকে প্রবল হয়ে উঠছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-অক্ষম এক মহা-আসুরী-শক্তি, সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন বিচিত্রতাকে লৌহশৃঙ্খলিত করে যে শক্তি আনতে চাইছে নিষ্পেষিত ধূলির একতা, আর একদিকে ধীরে ধীরে জাগছে মানবের চিত্তগুহায় অন্তর্লীন দৈবশক্তি, বহু বিচিত্রকে স্বীকার করে যে আনবে মানবমনের অন্তর্গূঢ় আলোর একতা—মৃত্যুতে নয়, অমরত্বে করবে মানুষকে এক। এটা কবির অনুমান নয়, ঐতিহাসিকের কল্পনা নয়, সাধনলব্ধ সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি: এবং সে-সাধক হলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ—যিনি আজকের এই অবিশ্বাসী যুগে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জীবনে সেই দৈবশক্তিকে করলেন রূপায়িত, বিজ্ঞানের অগোচর সেই শক্তিকে দুষ্কর তপস্যায় নিজের জীবনে করলেন ধারণ, প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বকর্মে করলেন তাকে প্রয়োগ। ভারতবর্ষের যে যোগ-বিজ্ঞান সাধনহীনতার অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দ অপরূপ মানবীয় সাধনায় দিয়ে গেলেন তাকে দিব্যজ্ঞানের মর্যাদা—তপস্যায় উত্তীর্ণ হলেন

---

* 1. The Ideal of Human Unity 2. Human Cycle
3. The Riddle of this World 4. Ideal & Progress

মানবীয় ক্রমবিবর্তনের অনিবার্য পরবর্তী স্তরে—মনের ঊর্ধ্বে অতি-মানসলোকে এবং সেই অতিমানসের বিচ্ছুরিত আলোর ইঙ্গিত দৈব-অনায়াসে রচনা করে গেলেন, মানবমনের মহাকাব্য, "সাবিত্রী"—বিশ্বের সাহিত্যের বিস্ময়।

"সাবিত্রী"র প্রত্যেক অক্ষরে রয়ে গিয়েছে সেই অতিমানসের দীপ্তি—দৈব মহাসত্যের স্বতঃ উৎসারিত আলো। মনের ঊর্ধ্বে সেই অতিমানসের আলোকের নির্দেশে লেখা এই অপরূপ মহাকাব্য—মহাবিশ্বের অন্তর্গূঢ় চিত্র—পুরাকালে যে বিশ্ব-রহস্যের দ্বারপ্রান্ত থেকে পরিভ্রমণ করে ফিরে এসেছিলেন একমাত্র নচিকেতা। এই মহাকাব্যের রচনা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, একটি মাত্র সর্গ বাকি ছিল লেখা। সে সর্গের শুধু নামকরণ করে রেখে-ছিলেন, মৃত্যুর সর্গ। জানি না, সেই অলিখিত সর্গের সঙ্গে তাঁর মহাপ্রয়াণের কি যোগ। শুধু এইটুকু আজ আমরা জানি, মহা-প্রয়াণের আগে তিনি "সাবিত্রী"র যে অধ্যায় লিখেছিলেন, তার মধ্যে ছিল একটি সর্গ, The Book of Fate…অমোঘ মহা-ভবিতব্যতা যার দ্বারপ্রান্ত থেকে অসহায় মৌনতায় ফিরে আসে মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি-জিজ্ঞাসা। এই সর্গে আছে নারদের সঙ্গে সাবিত্রীর জনক-জননীর কথোপকথন। সাবিত্রী ঘোষণা করেছেন, মৃত সত্যবানই তাঁর পতি সেই মৃতকেই তিনি বরণ করবেন পতিত্বে। এই নিয়ে নারদের সঙ্গে হচ্ছে সাবিত্রীর জনক-জননীর, মানবের ভবিতব্যতা এবং মৃত্যু নিয়ে আলাপ। এবং যাঁরাই সাবিত্রী পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে এই পৌরাণিক কাহিনীর আড়ালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মানসিক তপস্যার কথাই, তাঁর সাধনার সত্যকেই রূপ দিয়ে গিয়েছেন। এই মহাকাব্যই হল তাঁর প্রকৃত জীবন-ইতিহাস। Book of Fate সর্গের প্রতি ছত্রের আড়ালে আজ দেখছি, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী তাঁর শেষ-সংগ্রামেরই ইঙ্গিত।

সেই অন্তর্গূঢ় ঘটনার ইতিহাস আমাদের জ্ঞানের বাইরে। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছিলেন, তাঁর জীবনের যা ঘটনা, তা তো লোকচক্ষুর আড়ালে, তাঁর অন্তর-লোকের ঘটনা, সেখানে আমাদের প্রবেশের কোন পথ নেই। তাই আজ "সাবিত্রী"র প্রত্যেক লাইনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা খুঁজছি সেই অপরূপ অন্তর্গূঢ় ঘটনার দেশে প্রবেশ করবার পথ। সেখানে Book of Fate সর্গে যে অপরূপ ভাষায় তিনি মৃত্যুরহস্যকে বিশ্লেষণ করেছেন, আমার সাধ্য নেই অনুবাদে তার শতাংশের একাংশকেও পরিস্ফুট করি,—কারণ নিগূঢ় মন্ত্রের মতন সে-ভাষা এসেছে তাঁর মনের ঊর্ধ্বলোক থেকে—যেখান থেকে আসে মহাসত্যের সব দিব্য প্রকাশ। সেখানে তিনি বলেছেন,

Men die that man may live and God be born.

যে মানুষ এসেছে ভগবানের দূত হয়ে, যে মানুষ এসেছে মানুষকে মুক্তি দিতে মৃত্যু আর বেদনার বন্ধন থেকে

He too must carry the yoke he came to unloose.

সেই বিশ্বমানবকে নিজের মনে বইতে হয় নিখিলের বেদনার ভার,

He carries the suffering World in his own breasts···

* * *

Earth's ancient load lies heavy on his soul···

* * *

The weeping of the centuries visits his eyes···

* * *

He is the victim in his own sacrifice···

বাইরের জগৎ যখন নিশ্চিন্ত সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে, তখন মহা-নিঃসঙ্গতায় একাকী মানুষের মুক্তিদাতাকে সংগ্রাম করতে হয়

প্রবল শত্রুর সঙ্গে, যে-শত্রুকে আমরা সাধারণ লোক বাইরে চোখ চেয়ে দেখতে পাই না; আমাদের হয়ে আমাদের মুক্তিদাতাকেই সেই সংগ্রামে দিতে হয় মৃত্যুর মূল্য।

He dies that the world may be new born and live…

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাপ্রয়াণে ঘোষণা করে গেলেন, সেই নব-পৃথিবীর জন্ম। "সাবিত্রী" হলো সেই অনাগত উষার বন্দনা।

*

যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

প্রমোদকুমার সেন

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা হইতেছে অতি-মানসের অবতরণ এবং তাহার ফলে মানুষের দিব্য রূপান্তর ও দিব্য-মানবজাতির সৃষ্টি। ইহা ঋষি বিশ্বামিত্রের নবসৃষ্টির প্রচেষ্টা নহে, ইহা ভগীরথের গঙ্গাবতরণ। ভগীরথ সুরধুনীকে মর্ত্ত্যে অবতরণ করাইয়াছিলেন; শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছেন ভাগবতী শক্তিকে মর্ত্ত্যে লীলায়িত করিতে। গূঢ়ভাবে ইহা সমগ্র মানবজাতির সাধনা; তাই শ্রীঅরবিন্দকে সমগ্র মানব-জাতির প্রতিনিধি বলা অত্যুক্তি নহে।

ভারতের এবং পাশ্চাত্যের যে সকল লোক শ্রীঅরবিন্দের সত্তা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্রীঅরবিন্দের সাধনার অভিনবত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ। মনে হয় তিনি শুধু শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের বিশেষত্ব উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহার অন্তর্লোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই সুদূর অতীতে যখন যোগী অরবিন্দের মূর্ত্তি বিকশিত হয় নাই। তাই তিনি স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ প্রশস্তিতে বলিয়াছিলেন:

> "হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
> আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
> মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
> আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয়বাণী
> উদার মৃত্যুর।..."

উত্তরকালে (২৯শে মে ১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচারীতে যোগী শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া লিখিয়াছিলেন: "প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝ্‌লুম,—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে

চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খর-দন্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবা-বিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে ব'লে এলুম— আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

"প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!"

"আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়— আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!"*

---

* রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন শন্তিলি জাহাজে বসিয়া (তিনি পাশ্চাত্য ভ্রমণে যাইতেছিলেন) ১৯২৮ সালের ২৯শে মে তারিখেই; উহা প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের "প্রবাসী"তে।

কবির দৃষ্টি অভ্রান্ত। আজ ভারত, তথা জগৎ, শ্রীঅরবিন্দের বাণী শুনিবার অপেক্ষায় আছে। কোন এক আকর্ষণে এদেশের ওদেশের শত শত নরনারী, বালক বালিকা পণ্ডিচারী আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে; তাহারা গতানুগতিক জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া দিব্য-জীবনের সন্ধান করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ ত তাহাদের কাহাকেও আহ্বান করেন নাই, তিনি ত কোন সঙ্ঘ গঠন করেন নাই!

তথাপি আমরা কি অনুভব করি না যে শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ-বাসীদের অধিকাংশই আজও তাঁহার আদর্শ-উন্মুখ নহে? পাশ্চাত্যে অতি মন্থর গতিতে তাঁহার বাণী পৌঁছিতেছে। কিন্তু বস্তুত ইহা অবান্তর। কারণ মূল সমস্যা হইতেছে মানবজাতির দিব্য রূপান্তর। ইহার জন্য চাই একদিকে মানুষের আকুলতা, অপরদিকে ভাগবত-শক্তির সাড়া। মানুষের যে আকুলতা জাগিয়াছে তাহার প্রমাণ পণ্ডিচারী আশ্রমের আকর্ষণ। ভাগবত শক্তির সম্বন্ধে কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র—তাহার সাক্ষী প্রতি ব্যক্তির আত্মা।

মানবজাতির ব্যাপক রূপান্তর হইবে কিনা, এবিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং "দিব্য জীবন" পুস্তকের শেষভাগে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অনন্যমনাভাবে ঈশ্বরের সাধনা করিতে হইলে উপযুক্ত গুরু, মঠ বা আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। এই কারণে প্রাচীন কাল হইতে সকল সভ্য দেশে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' নীতি আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু এই নীতির একটি ফল কি এই নয় যে সঙ্ঘ জগৎ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হয়? তাহার ফলে সঙ্ঘ হয় পূত স্থান, আর জগৎ চলে নিজগতিতে অজ্ঞানে বা অর্দ্ধজ্ঞানে।

শ্রীঅরবিন্দ যোগাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও নিজেকে জগৎজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু বিচ্ছিন্ন না হওয়ার অর্থে গতানুগতিকতায় যোগদান করা নহে। ইহার অর্থ জগতের বিবর্ত্তনের সহিত যোগযুক্ত

হওয়া। জগতের কি অবিরাম বিবর্ত্তন-যোগ চলিতেছে না? তাহা না হইলে মানব-সভ্যতার রূপান্তর ঘটে কেন? বিবর্ত্তন না হইলে সৃষ্টি স্থবির হইত। এ বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, প্রকৃতি যেমন জীবাধারে মানব-সত্তার সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি মানবাধারে মানবোত্তর সত্তার সৃষ্টি করা তাঁহার চরম লক্ষ্য।

এই বিবর্ত্তনে এমনি একটা ক্ষণ আসে যখন সৃষ্টির পক্ষে দিব্য-সংস্পর্শের প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই ক্ষণেরই অপেক্ষায় আছেন, এবং এই দিব্য রূপান্তরের জন্য অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ৪০ বৎসর অখণ্ড সাধনা করিতেছেন। তাঁহার সাধনায়ই মানবের মধ্যে এক ঐকান্তিক দিব্য-উন্মুখতা হইয়াছে এবং এই কারণেই কোন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে দেশ-বিদেশের নরনারী শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। ইহাতে জাতি, ধর্ম্ম বা বর্ণের সমস্যা নাই—কারণ ইহা মানবীয় গুণ, আচরণ বা বিশেষত্বের ঊর্দ্ধে। ইহা হইতেছে 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—গীতার সেই মহাবাণীর আহ্বান।

কিন্তু বিবর্ত্তন ত একটানা নহে—ইহার গতি তির্যক নহে। ইহা হইতেছে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'। প্রাণ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে কত যুগ ধরিয়া মূক জড়ের একছত্র রাজত্ব ছিল! তাহার পর কত যুগ চলিয়াছে প্রাণীর রাজত্ব। অবশেষে ত মানুষের আবির্ভাব। আবার কত কোটি বৎসর ধরিয়া মানুষের বিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমাদের জানা সভ্যতাগুলির ইতিহাস ত মাত্র কয়েক হাজার বৎসরের। সুতরাং এক তুড়িতেই যে মানবজাতির দিব্য-রূপান্তর হইবে তাহার সম্ভাবনা নিছক কল্পনামাত্র।

মানব-সভ্যতার বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়েও মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টি-

গতভাবে এখনও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না—এখনও মানুষ মানসিক অহংকারের প্রভাব মুক্ত হয় নাই, মনের আধা-আলো আধা-আঁধারের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে নাই। তাই মানুষ সোজা বুদ্ধি হারাইয়াছে, শ্রেয়ের জ্ঞান হারাইয়াছে এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞানকেই (সেই জন্যই জড়বাদ) পরম জ্ঞান মনে করিতেছে। যান্ত্রিক উৎকর্ষে ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি বাড়িয়াছে—এমন কি, বিশ্বের পরিধি সঙ্কুচিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মা লুক্কায়িত হইয়াছেন যেন হৃদয়ের গুহা হইতে গুহান্তরে। ইহাই অতি-আধুনিক সভ্যতা—যন্ত্রযুগ। আত্মা নির্ব্বাসিত হওয়া বুদ্ধির দিশারী হইয়াছে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, সুতরাং কালক্রমে নীতিধর্ম্ম জলাঞ্জলি গিয়াছে ও যাইতেছে। নীতি-ধর্ম্ম ত মানস-সৃষ্টি; আধুনিক মানুষের মনের বিচারে সাব্যস্ত হইয়াছে: কার্য্যকারিতা ও সুবিধাবাদ নীতির অপেক্ষা করে না।

প্রকৃতি হয়ত বুঝাইতেছেন মানুষের কত দূর দৌড়—অহং-এর রাজত্বের সীমা কি। তাই আজ মানুষের অবস্থা এই যে, বিজ্ঞানের সম্পদের মধ্যেও হয় সে নিঃস্ব, না হয় যন্ত্র বা যন্ত্রের দেবতা নির্ব্ব্যক্তিক সমষ্টির দাস। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সমষ্টিতে সমষ্টিতে সংঘাত। দুইটি মহাযুদ্ধে আমরা এইরূপ দুইটি সংঘাত দেখিয়াছি। আবার একটি হইবে কিনা তাহাই মহা-সমস্যা। জড়ের চরম শক্তি আবিষ্কার করিয়া মানুষ মাঙ্গলিক শক্তি ছাড়া পরম রুদ্রশক্তিও লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন সমস্যা হইতেছে যে, এই রুদ্র শক্তিতে বর্ত্তমান মানব-জগৎ ধ্বংস হইয়া নূতন সৃষ্টি হইবে, না মানুষ রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিবার যোগ্যতা লাভ করিবে—যে মুখ দেখিবার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ রুদ্রের ধ্যান করিয়াছিলেন।

মানুষী বুদ্ধি সাধারণত বহির্ম্মুখী এবং ইহার লক্ষ্য কার্য্যকারিতা, সুবিধা প্রভৃতি। এই বুদ্ধির অতি উৎকর্ষে মানবজাতির একাংশ

একান্তভাবে জড়াশ্রয়ী হইয়াছে.। কিন্তু তাহাতে মানবতা হইয়াছে ক্ষুণ্ণ, নীতির ভিত্তি হইয়াছে শিথিল। তাহার ফলে যুদ্ধ হইয়াছে ভয়াবহ, যুদ্ধের পরেও সৃজনীশক্তি একটা আত্মস্থ গতি পাইতেছে না। সমস্ত বিষয়ে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা—মানুষের বুক যেন কি এক অজানা ভয়ে দুরু-দুরু। এক দিকে জড়বাদ আশ্রয়ী এক শক্তি মানুষকে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিতেছে, একঢালা ভাবে গড়িতে চাহিতেছে ; অপরদিকে আর এক শক্তি রক্ষা করিতে চাহিতেছে মানুষের মুক্ত গতি, ব্যক্তির, সমাজের, বিভিন্ন জাতির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মহামিলন। এই আদর্শেই দুইটি মহাযুদ্ধের পরে ক্রমান্বয়ে দুইটি জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ জাতিগত স্বার্থবুদ্ধি। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের অবসানে এই স্বার্থবুদ্ধি অনেকটা দূর হইয়াছে এবং অখণ্ড পৃথিবীর (One World এর) আদর্শ প্রকট হইয়াছে, কিন্তু ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে চাই মানব-মিলনের তপস্যা, এবং গূঢ়ভাবে তাহা ভগবৎ-তপস্যা, কারণ ব্রহ্মের ব্রাহ্মী শক্তিই জীবাত্মা।

মানবজাতির বিবর্ত্তনের গতিধারা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যে সব অব্যর্থ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহার পরিণতি আজ মানবজাতি প্রত্যক্ষ করিতেছে, যদিও এই গভীর তথ্য উপলব্ধি করিবার শক্তি খুব অল্প লোকেরই ছিল ; শ্রীঅরবিন্দের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি অনুসরণ করার ক্ষমতা মুষ্টিমেয়রও ছিল কি না সন্দেহ। যথা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিণতি সম্বন্ধে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ The Ideal of Human Unityর এক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার বাস্তব রূপ আমরা ১৯৩১-এর Statute of Westminister-এ দেখিলাম—এবং আরও অদ্ভুত পরিণতি দেখিলাম ১৯৪৯-এ Empire-র বৃটিশ-আখ্যাহীন Commonwealth-এ রূপান্তরে।

. তবু প্রশ্ন উঠিতে পারে, হাঁ, বুঝিলাম শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় তীক্ষ্ণধী

ব্যক্তি বিরল, কিন্তু তাঁহার পূর্ণযোগের সহিত জগতের রাজনৈতিক বিবর্তনের সম্বন্ধ কি ? শ্রীঅরবিন্দ যে বিবর্ত্তনের অপেক্ষায় আছেন, জগতের রাজনৈতিক বিবর্ত্তন তাহার বহিঃরূপ। আসলে যে মানব-জাতির চেতনার ব্যাপক বিবর্ত্তন ঘটিতেছে ইহা স্বীকার্য্য। অখণ্ড জগৎ বা One World-এর আদর্শ ইহার প্রতীক। এই অখণ্ড জগতের কথা শ্রীঅরবিন্দ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই বলিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শ ত একদিনেই উপলব্ধি করা যায় না। মানুষী ক্ষেত্রে সংঘাতের মধ্য দিয়াই আদর্শের অবশ্যম্ভাবিতা পরিস্ফুট হয়। তাই যতই মানব-মহামিলনের ক্ষণ সন্নিকট হইতেছে, ততই যেন চরম সংঘাতের দিনও আসন্ন হইতেছে।

এই সংঘাত অনেকটা দেবাসুরের সংঘাতের ন্যায়—আলোর, জ্ঞানের জয় হইবে—না আঁধার, অজ্ঞান বা স্থূল, আংশিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ব্যাপক হইবে, ইহাই এই যুগের প্রশ্ন। এই সন্ধিক্ষণেই শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তি হয় কার্য্যকরী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে ইহা কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস সন্ধানী ব্যক্তিগণ পাইয়াছেন। যোগী ত ঢক্কানিনাদে তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করেন না— এ শক্তি যে অঘটনঘটনপটীয়সী। ইহার আভাস আমাদের হৃদিস্থিত পুরুষ পাইতে পারে।

মানুষের মহামিলনের জন্য, মানুষের দিব্যরূপান্তরের জন্য চাই আলোকের চরম বিজয়। এই আলোকই আমাদের পরাজ্ঞান দান করিতে সমর্থ। আমরা জানি সেই বেদোক্ত বাণী— সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ; কিন্তু মনে জানা— এমন কি, বিশ্বাস করা—এক কথা, আর উপলব্ধি করা অন্য কথা। তেম্নি অর্জ্জুনের বাসুদেব-দর্শন। যতক্ষণ আমরা অর্জ্জুনের ন্যায় ভূমারূপী বাসুদেবকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই— বাহিরে আমরা যতই না নিষ্ঠার সহিত গীতা পাঠ করি।

সেইরূপ অখণ্ড জগতের One World-এর আদর্শ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা One World আমাদের প্রতি রক্তের কণিকায় উপলব্ধি করিতে না পারিব ততক্ষণ One World আদর্শ বা বিশ্বাসের বস্তু মাত্র থাকিবে, কার্য্যকরী হইবে না। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৯-এ জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, কেন উহা ব্যর্থ হইবে। তাহার কারণ মানুষের প্রকৃতি অত বড় নীতি কার্য্যকরী করিবার যোগ্যতা লাভ করে নাই। আদর্শের সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকিলে ক্রমশঃ তাহা কপটচারিতায় পরিণত হয়। এইজন্যই জাতির সহিত জাতির সম্বন্ধে আমরা এত কপটচারিতা দেখিতে পাই।

অখণ্ড জগৎ বা One World-এর সত্য স্বরূপ কি? ইহা হইতেছে সেই বেদোক্ত সত্য—একং স বহুধা বদন্তি—সেই এক সত্তা যিনি বহুরূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু শুধু নির্ব্যক্তিক সত্তা নহেন—তিনি পরম পুরুষও, আবার পরম প্রকৃতিও, কারণ তিনি সচ্চিদানন্দ। সুতরাং One World স্ফুট করিতে পারেন এমন এক শক্তিমান পুরুষ যিনি সেই পরম পুরুষে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই একের অখণ্ডতার ব্রত শ্রীঅরবিন্দের—কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্য নহে (কারণ একদিকে যেমন তিনি ব্যক্তি, অপরদিকে তিনি নির্ব্যক্তিক; এবং নির্ব্যক্তিক বলিয়া তিনি আবাল্য স্বার্থশূন্য এবং একান্ত আত্মত্যাগী); তাঁহার এই যোগ সমগ্র জগৎ লইয়া। তিনি মানবজাতির প্রতিনিধি স্বরূপেই পরমা-প্রকৃতির মহাযোগে নিমগ্ন।

অতএব ইহা কি অনুমান করা অসঙ্গত যে ব্রাহ্মীশক্তি মানব-প্রকৃতিকে আমূল রূপান্তরিত না করিলে, অখণ্ড-জগৎ বা One World স্থাপনা করিবার প্রচেষ্টা, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, half-way house মাত্র? কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই মানুষী চেষ্টাকে নিরর্থক বলেন নাই, কারণ মানুষকে অজ্ঞানের ভিতর দিয়া জ্ঞানের সন্ধান

করিতে হয়, মিথ্যার মধ্য দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে হয়। তবে একদিন এই সত্য-মিথ্যার গোলক ধাঁধা হইতে বাহির হইতে হইবেই, নতুবা কি করিয়া সত্য-লোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে ?

ইহার পরে ব্যক্তিগত প্রশ্ন: সব ত হইল, ব্যক্তিগতভাবে মানুষের কি হইবে ? ইহার উত্তরও সনাতন— আত্মোপলব্ধি ; এই উপলব্ধি যে প্রতি ব্যক্তি অনন্তের এক একটি চূর্ণ তরঙ্গ, এবং যেমন সমুদ্র ও সমুদ্র-তরঙ্গ অভিন্ন, বা অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অভিন্ন, তেমনি পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন। অনন্তের লীলায় জীবাত্মার উদ্ভব, এবং জীবাত্মার গতি নিম্নপ্রকৃতির মধ্যে লীলায়িত হইয়া ঊর্দ্ধের, ব্রাহ্মীপ্রকৃতির মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া। উত্তীর্ণ হইলেই মানব-প্রকৃতি দিব্য-প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়, যাহার ফলে অনাহত অখণ্ডতার জ্ঞান জন্মে। তখন শুধু জ্ঞানই অখণ্ড হয় না, কর্ম্মও হয় অখণ্ড, আনন্দও হয় নিরবচ্ছিন্ন। ইহাই পরমা প্রকৃতিতে সচ্চিদানন্দ-লোক।

ঊর্দ্ধে উত্তীর্ণ হইবার প্রচেষ্টা হইল অখণ্ড-যোগ, পূর্ণযোগ, দিব্যযোগ বা পুরুষোত্তম যোগ— যে ভাষাই ব্যবহার করা যাউক না কেন। এই যোগের দিশারী পরমজ্ঞানী, পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দ, এই যোগের সঞ্চালক হৃদ্-বাসিনী শ্রীমা। তাঁহাদের যোগগুরু বলা অতিশয়োক্তি বা গোঁড়ামি নহে ; কারণ গুরু না হইলে কোন বিদ্যাই অর্জন করা যায় না—মহাবিদ্যালাভ ত দূরের কথা।

ব্রহ্মোপলব্ধি ছাড়া এ যোগের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু ব্রহ্ম অর্থ শুধু তুরীয় ব্রহ্ম নহেন, এ ব্রহ্ম সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মময় জগতে ব্রহ্মের ইচ্ছায় সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় থাকা— ইহাই হয় মানব-জীবন ; কিন্তু তখন তাহা আর মানুষী-জীবন নহে— তাহা দিব্য-জীবন। এই দিব্য-জীবনের সুপ্রাচীন আদর্শ ভারতের। জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক নীট্শেও অতি-মানব জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইতেছে

অহংকার-স্ফীত মানবের আসুরিক মূর্ত্তি। ভারতের দিব্য-জীবনের আদর্শ হইতেছে ব্রহ্মময় জীবনলাভ—পুরুষোত্তমের দর্শন।

এটা কি বিস্ময়ের কথা নহে যে, মানুষকে অনন্তে কোন এক ক্ষণে এই পরম আদর্শ দিয়াছিল ভারত—'এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র'। তাই ভারতকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও যোগ। শ্রীমা ফরাসী দেশীয় হইলেও এশিয়ার রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত। তাই কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে তিনিও ভারতের যোগাশ্রয়ী হইয়াছেন। ভারত স্বধর্ম্ম-প্রাপ্ত না হইলে জগতের রূপান্তর হইবে না, তাই শ্রীঅরবিন্দ কৈশোরেই ভারতের মুক্তি-সাধনার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন ভারতমাতার মূর্ত্তরূপ, ঋষি বঙ্কিমের সহিত সমকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিলেন 'বন্দেমাতরম্'। মাতার সেবায় আহ্বান করিলেন রুদ্রকে; কিন্তু কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে রুদ্র দেখাইলেন তাঁহার দক্ষিণমুখ—কারাগারে শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষ করিলেন ভগবান বাসুদেবকে, যিনি ভারতের পুরুষোত্তম্। ভারতমাতার প্রতিষ্ঠা হইল, মায়ের যোগশক্তি সক্রিয় হইল—শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগ গ্রহণ করিলেন। ভারত মাতার ভাগবতীশক্তির লক্ষ্য হইতেছে প্রতি ভারতীয়কে—ভারতের প্রতি নরনারীর মধ্যে (এক জন্মে হউক বা বহু জন্মে হউক) পরম সত্তার বিকাশ করা, ভাগবতী শক্তির আধারে পরিণত করা। এই সাধনায় শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ-সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাই স্বেচ্ছায় জগতের উদ্বুদ্ধ অনেকগুলি নর-নারী পণ্ডিচারী আশ্রমে পূর্ণযোগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট ভারত শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে নাই—ভারতমাতা তাঁহার সন্তানগণকে দিব্যসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য আবাহন করিয়াছেন। এককালে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ভারতের রাজনৈতিক সাধনার নেতা, আজ তিনি মুক্ত ভারতের জগৎ-জয়ী অভিযানের নেতা। তাঁহাকে নমস্কার!

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

"দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী এবং মানব-প্রেমিক"—সত্যই শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এ সবই, এই কথাগুলি দিয়েই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ হয়ে তাঁর আইনবিদ অনুগামী বন্ধুটি দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছেন তিনি, ইংরেজের বিচারশালার সামনে নয়, ইতিহাসের বিচারকক্ষের সম্মুখে। শ্রীঅরবিন্দ এই তিনটি গুণের জীবন্ত মূর্তি অবশ্য, তবে আজ আর একটি বিশেষণ যোগ করলে তাঁর বর্ণনা সম্পূর্ণ হয়। তিনি হলেন দিব্য-জীবনের স্রষ্টা। বাস্তবিক পক্ষে এইটি অন্তরালে থেকে তাঁর মধ্যে সর্বদাই সক্রিয় ছিল, এটিই তাঁর অপর কর্মধারাকে দিয়েছে তাদের যাকিছু অর্থ ও মাহাত্ম্য, যাকিছু পরিপূর্ণ সার্থকতা। তাঁর কাজ ছিল মানুষের বিবর্তন, ক্রমোন্নতির ধারায়—তা ছিল তাঁর জীবন-সাধনা। মানব বিবর্তনের সোপানগুলি তিনি বলেছেন এই রকম :

"পরিবার, দেশ, মানবজাতি, এই তিন ক্রম হল একাকীত্ব থেকে একতাবদ্ধ সমগ্রত্বের দিকে বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপ। প্রথমটি সিদ্ধ হয়েছে, দ্বিতীয়টির পূর্ণ সাফল্যের জন্য এখনো প্রয়াস করে চলেছি আমরা, তৃতীয়টি লাভের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা আমাদের এবং তার সফলতার গোড়াপত্তনও শুরু হয়ে গিয়েছে।"

তবে রহস্যের রহস্য রয়েছে বিষ্ণুর চতুর্থপাদে—মানবত্ব থেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়ায়। বিবর্তনের লক্ষ্যই তাই—সকল সমস্যার সমাধান এরই মধ্যে। পরিবার, দেশ কিংবা মোটের উপর মানব-জাতির মধ্যে সর্বত্রই রয়েছে একটা দ্বন্দ্ব, একটা গতি-পরাঙ্‌মুখতা,

একটা হতাশা ও ভগ্নোদ্যম; এগিয়ে যাবার প্রয়াসটিও যেন দূরে সরিয়ে দেয় শুভ ও শান্তিকে, আরো গিয়ে পড়ে সংঘর্ষের সংকটের মধ্যে। অবশ্য, অন্য রকমটি আশা করাই অসঙ্গত। মানুষ যদি তার নিম্নতর বৃত্তি ও সত্তায় সত্যই চায় পূর্ণাঙ্গ পূর্ণতা তবে তাকে পেতে হবে তার পরমার্থ পরমকে, পেতে হবে তাকে যা তার মধ্যে গভীরতম ও মহত্তম। নিজত্বের গণ্ডী পার হয়ে ছাড়িয়ে যেতে পারলেই আত্মসিদ্ধি সম্ভব। পরিবার, দেশ, মানবজাতি—সকলেরই আজ এক নূতন সংজ্ঞা নূতন অর্থ প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, 'দেবত্ব'-ই হল সেই অর্থ।

তবে জানা দরকার দেবতারও আবার রকম-ভেদ আছে। এক দেবতা হলেন যুগপৎ এই বিশ্বসৃষ্টিকে আলিঙ্গন করে আশ্রয় করে এবং তাকে ছাড়িয়ে তার ঊর্ধ্বে। তিনিই সর্বব্যাপী সত্য, সর্ববিসারী চেতনা, পরিবর্তনশীল সর্বভূতান্তরস্থ অপরিবর্তনীয় শাশ্বত অব্যয়। জগতের প্রগতি-লীলা-প্রয়াসে অসম্পৃক্ত। তিনি নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত। এই দেবতা যেন সব নীরবে বহন করে চলেন সহ্য করে চলেন। আর এক দেবতা যিনি তিনি সব গড়ে তোলেন—নিজেও সেই সঙ্গে গড়ে ওঠেন; অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে গড়েন, আবার সম্মুখে গড়ে ওঠেন নিজে। এই সক্রিয় দেবতাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 'অতিমানস ঈশ্বর' অথবা মূর্ত্ত ভগবতী জননী।

বিবর্তনের অনিবার্য ধারায় মানুষ তার মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করে যাবেই। তার অর্থ নয় সে নিজেই অপ্রয়োজনীয় বলে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, প্রাগৈতিহাসিক কালের অতিকায় জীবজন্তুর মতো। তার অর্থ পার্থিব সৃষ্টির পুরোধা হয়ে থেকেও তার ঘটবে এক আমূল পরিবর্তন, রূপান্তরিত সে হয়ে উঠবে ভাগবত জীব।

মানুষ আজ পর্যন্ত মনোময় পুরুষ—তার মন, তার যুক্তিবুদ্ধিই তাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এরই মাধ্যমে আবার সে নিয়ন্ত্রণ করে এই

জগৎ। কিন্তু মনই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ কিংবা পরম বৃত্তি নয়, চেতনার শেষ ধাপও নয়। মনের ওপারে আছে অন্য সমর্থ চেতনার স্তরাবলী—উদ্বংশমিব যেমিরে—একটির উপর আর একটি যেমন বলেছে ঋগ্বেদ। মানুষ সেখানে পৌঁছিতে পারে, বসবাস করতে পারে, তাদের নামিয়ে আনতে পারে এই মর্ত্ত্য-জীবনাধারে, তাদেরই স্বরূপে একে গড়ে তুলতে পারে। এই স্তরাবলীর শীর্ষে যা তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ঋতচিৎ বা অতিমানস। এই জ্যোতির্ময়ী পরাশক্তি—জ্যোতিরুত্তমম্—তার দিকে চলেছে সৃষ্টি, তা-ই অলক্ষ্যে থেকে সৃষ্টিকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। সুষীম সংসিদ্ধির তা নাভিকেন্দ্র.

অল্প শক্তি নিয়ে, নিম্নস্তরের দেবতাদের সাহায্য নিয়ে মানুষ সচেষ্ট তার জীবন ও পরিবেশ পুনর্গঠনে। পূর্ণ সাফল্যও তাই তার অলভ্য থেকে গিয়েছে। কার্যত দেখা গিয়েছে প্রত্যেক সাফল্যের উন্নতির যুগের পর এসেছে একটা ব্যর্থতার অধঃপতনের যুগ, যেন সুবর্ণযুগের পর লৌহ-যুগ! তাকিয়ে দেখলে সত্যই মনে হয় মানুষ যেন আজ বন্দী হয়ে রয়েছে লৌহপিঞ্জরে। তার সামর্থ্য তার আকাশচুম্বী সম্ভাবনা, তার প্রয়োজনের তুলনায় এই পৃথিবী একান্তই স্বল্পপরিসর—চাঁদের দেশে গিয়ে উঠবার তার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে! কিন্তু এটা তার জীবন-সংকটের একটা সাংকেতিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। মানুষের অন্তরাত্মা তার চরম সংকটে এসে পৌঁছেছে—সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক সকল সমস্যার মনে হয় আর উদ্ধার নেই। উদ্ধারের সকল দ্বার ও রাস্তা বাহির থেকে বন্ধ। তাহলে উপায় কী? রাস্তা ও উপায় তাহলে অন্তরের দিকে ফেরা, আত্মমুখী হওয়া—সেদিক দিয়েই মুক্তি ও সিদ্ধির উদার পথ। সেই পথ উত্তরণের ও অতিক্রমণের পথ। অন্য সব রাস্তা পণ্ডশ্রমের পথ—তারা চলে মহাবিনষ্টির দিকে।

এই হল সময়, কাল পরিপূর্ণ এখন। এ অজুহাত দিলে আর

চলবে না যে এ-পথে চলা সাধারণের সামর্থ্যের বাইরে। বললে চলবে না, সাধারণ মানুষের এইভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার, অ-মানুষী কিছু করবার, না আছে যোগ্যতা, না জ্ঞানবুদ্ধি, না প্রবৃত্তি। কারণ, আমি বলেছি, মানুষকে যদি আদৌ উদ্ধার পেতে হয় তবে এই হল একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ আর নেই। তারপর, সাধারণ মানুষেরই কতখানি আমরা জানি—তার যোগ্যতা তার মতিগতির কতখানি সন্ধান রাখি? স্থূলের পার্থিব বিষয়ের স্তরে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই দেখি কি বীরত্বের কাজ সে করে যায় অবলীলাক্রমে, এক এক সময়ে কি কষ্ট কি তপস্যা তারা বরণ করে নেয়, কারণ তা ই সে সময়ে তাদের কর্তব্য বলে। জড় আধারের শত সহস্র ক্রটি সত্ত্বেও মানুষের অন্তরাত্মা অনেক বেশি শক্তিমান, আবার সর্বশক্তিমান হল ভগবৎ-করুণা।

তার অর্থ অবশ্য নয় যে গোটা মানবজাতিই একসঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে উঠে যাবে নূতন জীবনে। অবিলম্বে পরম সিদ্ধি তো প্রত্যেকের কাছেই আর আশা করা যায় না। আর শুরুতে, তার প্রয়োজনই বা কি। যুগে যুগে নূতন সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপনা করে এসেছে কয়েকজন পুরোগামী, অগ্রদূত হিসাবে একদল বিশিষ্ট লোক। প্রথমে একটা তুষারপিণ্ড, তারপর সে যত গড়িয়ে চলে পথে তত সঞ্চয় করে করে বিশালকায় হয়ে ওঠে। আজকের একটা ছোট দলই কালকের বৃহৎ জনসমষ্টি। বিবর্তনেতিহাসের প্রত্যেক সন্ধিক্ষণেই এই রকম ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছে, প্রকৃতিই যেন তাঁদের পাঠিয়েছেন কিংবা উপর থেকে নেমে এসে তাঁরা ধারণ করেছেন এই মরদেহ। বিশেষ করে প্রকৃতি যখন অলস মন্থরগতি ছেড়ে উল্লম্ফনে এগিয়ে যেতে চান তখনই এই সত্য আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

বস্তুত যা হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হতে চলেছে তা প্রকৃতিরই সিদ্ধি ও সার্থকতা, পরা প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে অপরা প্রকৃতির সিদ্ধি।

রহস্যের এই বোধ হয় মূলকেন্দ্র। আজ পর্যন্ত, মোটের উপর বলা চলে, এই ধারণা চলে আসছিল যে অধ্যাত্ম-জীবন অর্থ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে চলা, প্রকৃতির স্রোতের প্রতিকূলে কষ্টকর উজানে যাওয়া। প্রকৃতি সেখানে ঘৃণার বস্তু, সন্দেহের বস্তু, আত্মার শত্রু বলে বর্জ্জিত। কিন্তু সম্পূর্ণ দিক-পরিবর্তন হয়েছে আজ। দেহ আজ আত্মারই অপর দিক হিসাবে, দৃশ্য আকার রূপে প্রতিভাত—পার্থিবের মধ্যে তার প্রকাশের আধার এই জড়দেহ। প্রাচীনের জড়-অজড় আত্মা-অনাত্মার বিরোধ এবার বিলুপ্ত হল, জড়দেহও এখন অনুভব করছে প্রাচীনেরা তার যে অজ্ঞানতালিপ্ত রূপ ও প্রকৃতি দিয়েছিলেন তা অতঃপর অচল। যে-সব জড়কণা দিয়ে তৈরী এই স্থূলদেহ, তা আজ জানা গিয়েছে, একান্ত জড় বস্তুপিণ্ড নয়, তা এক শক্তির—জ্যোতির্ময় শক্তির—স্ফুলিঙ্গ। উপরের আধ্যাত্মিক আলো পৃথিবীর উপর এই স্থূল দেহকেই তার শ্রেষ্ঠ আবাস ও আধার বলে বরণ করেছে।

প্রকৃতি যে সহযোগিতা করতে উদ্যত আত্মার সঙ্গে—এ তারই ইঙ্গিত। একটা নূতন জিনিস, চিৎশক্তি হতে সঞ্জাত একটা সর্বক্ষম জ্যোতি ক্রমে সমস্ত পার্থিব পরিমণ্ডল ছেয়ে ফেলছে। মা বলেছেন, এইটিই হবে নূতন সৃষ্টির বনিয়াদ বা মূল উপাদান। অভ্রান্ত জ্ঞান, অমোঘ দৃষ্টি, জ্যোতির্মণ্ডিত শক্তির উপর এক নূতন জগৎ সৃষ্টি হবেই—কারণ, মানুষ আর তার অজ্ঞানতার পঙ্কিলে ডুবে থাকতে চায় না, এক অলৌকিক প্রেরণা তাকে ঘিরে ফেলেছে।

২

নূতন জগৎ সৃষ্টি হবে নূতন ভিত্তির উপর। পুরাতন জগৎ ছিল বহিরঙ্গ ধরে, বাহিরের সস্তা উপাদান নিয়ে—প্রকৃতির ভাণ্ডারে সে-উপাদান অপর্যাপ্ত। এ সব উপাদানের অন্য পরিচয় হল দেহের বহুধা দাবি, মনের আপন রুচি দ্বারা সমর্থিত ও চালিত প্রাণের বুভুক্ষা—

তাদের সকলের প্রভু আবার অহং, ব্যক্তির পৃথক একান্ত অস্তিত্ব। নূতন জগৎ শুরু হবে অন্তরাত্মা থেকে, সেই অন্তরস্থ জ্যোতির্ময় ভাগবৎ সত্তা থেকে, যাকে আশ্রয় করে সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে সে, ভিতর থেকে বাহিরে শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। এ যেন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা হল নিম্নে নয় উর্ধ্বে—উপনিষদুক্ত বৃক্ষ যেমন উর্ধ্ব-মূল অবাকশাখ। এই নূতন সংগঠনে ব্যক্তি শুধু দেহ-মন-প্রাণের আবাস এবং তাদেরই দ্বারা সীমিত দেহী হয়ে থাকবে না। ব্যক্তি হবে প্রথমত এবং প্রধানত একটা চেতনা, চিৎশক্তির একটা বিন্দু বা কেন্দ্র—তার ক্রিয়া তার অস্তিত্বই এরকম অপর সব কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগে ও ঐক্যের মধ্যে, যেহেতু একটা বিরাট অখণ্ড ঐক্যের মধ্যেই সমস্ত কিছু বিধৃত। সেই নিরঙ্কুশ চেতনার ছন্দ ও সারবস্তুই গড়ে তোলে এই দেহ-মন-প্রাণ। আজকের ব্যক্তি-মানুষের দেখি যে কঠিন অহং-রূপ, যে স্বার্থপরতা যে পশুত্ব তার প্রায় অনিবার্য পরিচয়, তা নূতন মানুষের অন্তরাত্মার দীপ্তির সামনে দূর হয়ে যাবে।

ব্যক্তির সার্থকতা ও সিদ্ধি তার অন্তরাত্মার ভিতর দিয়ে—এই অন্তরাত্মা রয়েছে সকলের উপরে, দেহ-মন-প্রাণ তারই যন্ত্র ও আত্ম-প্রকাশের উপায়। তবে এ-পর্যন্ত, বিবর্তনে ক্রমোন্নতি এবং ক্রমস্ফূর্তির প্রয়োজনে এই তিনটিই যত না সহায়ক যন্ত্র হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে বাধা। নূতন চেতনায় ব্যক্তি যখন তার আত্মার স্বমহিমায় আসীন, পায় তার দেবত্ব, তখনই সম্ভব ও অনিবার্য তার এই নিম্ন-বৃত্তির আমূল পরিবর্তন ও ধর্মান্তর। আত্মায় আত্মলোকে প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অর্থ অকুণ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা, সুসঙ্গতি, শুচিতা, জ্ঞান, শক্তি ও অমৃতত্ব।

ব্যক্তি যেমন এ ধারায় গড়ে উঠবে, সমাজও তেমনি পরিবর্তিত রূপান্তরিত হবে। যে সুসঙ্গতি ও পরিপূর্ণতা ফুটে ওঠে ব্যক্তির মধ্যে,

সমষ্টির মধ্যেও তা প্রতিফলিত হবে। সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ, প্রতিযোগিতা-তৎপর সমাজের পরিবর্তে দেখব এক আস্পৃহা নিয়ে এক লক্ষ্যের দিকে সমবেত প্রয়াসের ছবি। প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে জেনেছে তাকে একই দেহের একটি অঙ্গ হিসাবে, নিজের কাজটি পূর্ণজ্ঞানে নির্ভুল-ভাবে সুসম্পন্ন করে চলে, সেই উত্তম জ্যোতিকেই নানাভাবে প্রকাশ করে।

আজ যে মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রসংঘ গঠন দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, নানা দেশ বিরুদ্ধ প্রবণতার স্রোতে সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, চলেছে প্রায় সমূহ সর্বনাশের দিকে—তারও আসবে এক আমূল পরি-বর্তন। দেশ যেমন, দেশসত্তাও তেমনি সত্য, তা আবার এক ভাগবত সত্তাই হয়ে ওঠে যখন সে আপন আত্মায় স্বপ্রতিষ্ঠ। ব্যক্তির আত্মার মতো সমষ্টিরও আছে আত্মা। একটা গোষ্ঠী পায় যে এক সমবেত জীবন তার সম্পূর্তি ও সমৃদ্ধির মূলে এই গোষ্ঠীর আত্মা, সমবেত জীবনের অধীশ্বর। এই গোষ্ঠীও প্রসারিত বৃহদায়তন হয়ে চলেছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে আজ দেখছি দেশ তার সীমা হারিয়ে ফেলছে, মিলিত-রাজ্য (কমনওয়েল্‌থ্‌) বা সংযুক্তরাজ্যের (ফেডারেশন) চলন হয়েছে। এমন কি, বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের কথাও মানুষ ভাবতে আরম্ভ করেছে এর ঃ কিছু কার্যত সূত্রপাতও দেখা দিয়েছে, দেশ অপেক্ষা বৃহত্তর সুসংবদ্ধ গোষ্ঠীসমষ্টি গড়ে উঠছে। অদূর ভবিষ্যতে তা অভ্যস্ত প্রতিদিনের জিনিসের মতোই হয়ে উঠবে। এইসব জন-সমবায় বা গোষ্ঠী নিয়ে চলে সর্বমানব-ঐক্যের দিকে, বিশ্বমানবত্বের দিকে। আর বিশ্বমানবত্বের পরের ধাপই অতিমানবত্ব, মানবত্বের অধিক কিছু —সেই অভিনব জনসংঘের গঠন-ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক, পৃথক এক চেতনার উপর তার ভিত্তি বলে।

মানব-গোষ্ঠীর আদি রূপ হল পরিবার, তা নির্দিষ্ট একটা রূপ নিয়েছে ; তবে উর্ধ্বের অতিমানস-চেতনায় তারও হতে পারে সংস্কার

ও পরিবর্তন। এযাবৎ রক্তের সম্বন্ধই ছিল তার মিলনের একমাত্র হেতু, এখন তার হেতু হতে পারে অন্তরাত্মার সাদৃশ্য বা নৈকট্য, চেতনার একধর্মিতা, জীবন-কর্মক্ষেত্রে সহযোগী ও সহকর্মীর বন্ধুত্ব। তার অর্থ এক দারুণ বিপ্লব, প্রকৃতির বিপর্যয় একটা—আগে যেমন বলেছি, মূল যাবে উর্ধ্বে, শাখা যাবে নিচের দিকে।

এই রকম বিপুল পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে—এবং তা অপরিহার্য—যদি মানুষকে তার সহস্র ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পেতে হয়। ব্যক্তিগত সমষ্টিগত ও বিশ্বগত সত্তার মধ্যে সক্রিয় ভাগবত দেহের পূর্ণ স্বাস্থ্য আসতে পারে তখনই যখন মানুষ বের হয়ে আসতে পেরেছে মনের আবরণ ভেদ করে, স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে অতিমানস পদবীতে।

বীরের উপযুক্ত এই দুরভিযান, জয়ের শোভাযাত্রায় যারা পুরোভাগে আসবে তাদেরই জন্য। তবে এর চরম সাফল্য অল্পবিস্তর সকলের ভোগে আসবে, যারা একে অস্বীকার করেছিল তারাও একদিন দেবে সম্মতি ও অবাধ আনুগত্য।

*

ভারতের স্বাধীনতা ও শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

"ওঁ শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!"

ভারতের স্বাধীনতা এবং শ্রীঅরবিন্দের ভারতক্ষেত্রে জন্ম—এই দুই মহান্ আবির্ভাবের যে যুগপত্তা, সেটি যে একটি আকস্মিক সময় সন্নিবেশ মাত্র নয়, পরন্তু তাহা যে ভারতের তথা বিশ্বমানবসমাজের সত্যকার শাশ্বত যোগ-ক্ষেমের ধীরোদাত্ত ঐ দিব্য মন্ত্রবাণীর দীক্ষা দান করিয়াছে এবং আজও করিতেছে—সে বাণী সর্বসংশয় দ্বিধামুক্ত অবহিত চিত্তে "শৃণ্বন্তু"—তোমরা শোন!

এ বাণী—এই শাশ্বত যোগক্ষেমবাণী—কোন দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ এবং যুগবিশেষের নিমিত্তই নয়; এ বাণী বিশ্বমানবের প্রয়োজনে এবং শাশ্বত। তথাপি, কোন দেশ, জাতি অথবা যুগকে যুগাবতার মহামানবকে, সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের মত আপন শাশ্বত দিব্য অমৃত বাণীতে আপূরিত করতঃ বাদন করেন—যখন বিশ্বমানবে শ্রেয়োবুদ্ধির বিভ্রম এবং মঙ্গল প্রয়াসের সঙ্কোচ-সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়া, যারা "অমৃতস্য পুত্রাঃ" তাদের এক মহতী বিনষ্টির গ্রাসে পতিত করার উপক্রম করে। এইবার, বর্তমান বিশ্ব-সংস্থিতিতে ক্ষেম ও যোগ যে কি বস্তু, তা ধ্যান কর।

বিশ্বের সেই মহাত্রাসরূপ উপক্রমটি বর্তমানের উন্মুক্ত দ্বারে তার আততায়ী ছায়াপাত করিয়াছে! সাময়িকভাবে সে করাল ছায়ার ঘোর কথঞ্চিত কাটিলেও, নেপথ্যে তার কারণকূটের গর্ভে সে ছায়া ঘনীভূতই হইতেছে। অধুনা মানবের সভ্যতা, সংহতি এবং বিজ্ঞান সেই কারণকূটের নিরসন বা লাঘব করে নাই। করে নাই এইজন্য

যে—আততায়ী মহাত্রাসের কারণকূট বাহ্য সংস্থায় ততটা নয় যতটা সে রহে আমাদের আন্তর আলোক আবরণী তমসা লোকে ও আকৃতি আশঙ্কা আর্তির কেন্দ্রে—বুদ্ধিবিবেচনে আর হৃদয়স্পন্দনে। বুদ্ধিবিচার আবার বিচারই নয়, যদি সে কেবল বহিঃপ্রেয়ের বিচার লইয়াই থাকে, সর্বাঙ্গীন যে শ্রেয় তার বিচারে না যায়, এবং প্রেয় ও শ্রেয়ের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া তাদের মৈত্রীবন্ধন ঘটায় যে আত্মবিচার, তাতে পরাঙ্মুখ হয়। এ আত্মবিচার সব কিছুর যাহা সার রস মধু, তারই বিচার। অধুনা বিজ্ঞান তত্ত্বতঃ না হউক কার্যতঃ এ বিচারে শুভ্র স্বচ্ছ যে আলোক, তার দিশারী হইতে পারগ হয় নাই। আর তার প্রদর্শিত প্রেষ্ঠ নয় শ্রেষ্ঠও নয়, কিন্তু আপাত প্রেয় এবং আশু অধৃষ্য ফলের লোভে মানুষের যে পরস্পর যুযুৎসু যুযুধান সঙ্ঘপ্রয়াস, তাতেও মানুষের হৃৎ-স্পন্দনটি স্বচ্ছন্দ বলিষ্ঠ অকৃপণ অকুণ্ঠ সর্বদরদী হয় নাই। এটিকে বিজ্ঞানের কার্পণ্যদোষ বলিলে অন্যায় হইবে। খাঁটি বিজ্ঞানের বৈগুণ্য নাই, বৈজাত্যও নেই। তথ্য এবং প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রে বহু-জনহিতকল্পে বিজ্ঞানের অবদানও অসামান্য। অধ্যাত্মশ্রেয়োবিচারে, সুতরাং মানবের সার্বভূমিক শাশ্বত কল্যাণ সাধনায় বিজ্ঞানকে 'উদাসীন' রহিতে হইয়াছে 'বিপাকে' পড়িয়া। হৃদয়ের সামগ্রিক জাগৃতির নাম যদি দাও "সংজ্ঞান," আর বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশকে "প্রজ্ঞান"—তবে, এই সংজ্ঞান আর প্রজ্ঞানের হিরন্ময় পক্ষদুটি ব্যতীত বিজ্ঞান বেদের সেই ছন্দোমাতা গায়ত্রীর মত মৃত্যুভয়ে ভীত "অমৃতস্য পুত্রাঃ" দের নিমিত্ত অমৃত দোহন করেন কি করিয়া সেই "হিরণ্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" যে জ্যোতির্ধাম তা থেকে?

প্রাচীন সেই ঋষিকুলের ভাষায় বিজ্ঞান আনিবে বিদ্যা, যেটি কেবল অপরাবিদ্যা নয়, পরন্তু যেটি হইবে পরাবিদ্যার উপক্রমণিকা সেতু অবতরণিকা। সংজ্ঞান দিবে শ্রদ্ধা—অধ্যাত্মসংজ্ঞা, সর্বভূতাত্ম-সংবিৎ। আর, প্রজ্ঞান আনিবে উপনিষৎ—যাহা পরম সত্য শিব

সুন্দর, তাতে অকুণ্ঠ বিশারদী বুদ্ধি। বিদ্যা শ্রদ্ধা উপনিষৎ—এ তিন কল্যাণী চেতনী দীপনী ধারায় ত্রিবেণী স্নান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ব-মানবতার যথার্থ শ্রেয় শান্তি ঋদ্ধি সিদ্ধি দূরেই, কদাপি অস্তিকে নয়।

পুনশ্চ, সেই আর্ষ পরিভাষায় বিজ্ঞান বিদ্যাকে যদি বল "ভূ" বা পৃথিবী, তবে সংজ্ঞান "চন্দ্রমা" আর প্রজ্ঞান "সূর্য্য"। পৃথিবীকে তার সর্বাঙ্গীণ শ্রেয় শান্তি ঋদ্ধিসিদ্ধির নিমিত্ত "সূর্যাচন্দ্রমসৌ"কে "স্বে স্বে মহিম্নি" বিরাজিত এবং প্রসাদিত পাইতেই হইবে।

মানবের মস্তিষ্করূপী যে বিজ্ঞান, সে তাকে তার সর্ববিধ চিন্তা পরিকল্পনা এবং কর্মের মধ্যে শিখাইবে "ঋতং সত্যং" ছন্দ। তার হৃদয়স্বরূপ যে সংজ্ঞান বা সংবিৎ, সে তাকে দিবে শ্রদ্ধা ভক্তি আর সেই মধুচ্ছন্দ :—যার বাণী বেদ "মধু বাতা…" মন্ত্রে শোনাইয়াছেন। আর ঋতচ্ছন্দঃ এবং মধুচ্ছন্দঃ—এ দুটি ছন্দকে পরম সমন্বয়ে এবং চরিতার্থতায় মিলাইবে কে?—প্রজ্ঞান, যেটি মানবতার প্রকৃষ্ট মেধা বোধি এবং পরম প্রকাশের ভূমি। ঋত এবং মধুচ্ছন্দে মিলাইয়া হইবে অমৃতচ্ছন্দ :— যাহা একমাত্র মানবকে মহাত্রাস থেকে নিশ্চিন্ত মুক্ত করিতে সমর্থ।

মানবের মস্তিষ্ক আর হৃদয়—বিদ্যা এবং শ্রদ্ধা—সাধন এবং আকূতি—এ দুয়ের মধ্যে বিগ্রহ না হইয়া সন্ধি হইলে হয় সাম্য এবং শান্তি—balance and peace, একে বলে ক্ষেম। বর্তমানে আমাদের বিদ্যা ক্ষেমঙ্করী, সাধন ক্ষেমঙ্কর হয় নাই। বিজ্ঞানের দীক্ষান্তে আমরা প্রায় সকলেই "সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" হইতেছি যুদ্ধের আয়োজনে, মারণাস্ত্র নির্মাণে আমরা সকলেই যথাশক্তি মিলিতেছি। কিন্তু "সমানা ব আকূতয়ঃ"—আমরা আন্তর আকূতিতে "সমান" হইলাম কৈ!

ভারতকে স্বাধীন হইতে হইয়াছে বিশ্বমানবতায় এই "সমানা ব আকূতয়ঃ" আনিবার নিমিত্তই। ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বক্ষেমায়—

বিশ্বক্ষেমের নিমিত্ত, মানুষের মস্তিষ্ক আর হৃদয়, বিদ্যা ও সাধন এবং শ্রদ্ধা ও ভাব—এ দুটিকে ভয়ঙ্কর বিগ্রহ থেকে ক্ষেমঙ্কর, শুভঙ্কর যে সন্ধি-ক্ষেম, তাতেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ভারত পশ্চিমের কাছ থেকে বিদ্যা লইতেছে। ভারতকে দিতে হবে সেই সমান কল্যাণ আকুতিভরা হৃদয়, তার শ্রদ্ধা। ভারতের ঐ "সমানাকৃতি" হৃদয়টি হারায় নাই। ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বক্ষেমের নিমিত্ত তার এই মধুচ্ছন্দা হৃদয়টি উৎসর্গ করুক।

কিন্তু প্রজ্ঞান? প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে "যোগ" হয় না, সুতরাং অমৃতচ্ছন্দ মিলে না। ভারতের প্রজ্ঞান ছিল; বহুদিন তাহা তিরোহিত প্রায়। তাই তার আকুতিভরা হৃদয়টি লইয়াও ভারত কুণ্ঠায় কার্পণ্যে ছিল বিয়োগ সংখ্যানে। আজ তাকে আপন স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি এবং বিকাশের নিমিত্ত এবং বিশ্বমানবের যেটি পরম শ্রেয়, তার নিমিত্ত যুজ্ঞান যুক্ত যুক্ততম হইতে হইবে। অন্যথা তার হৃদয় তাকে বেদনাই দিবে, সান্ত্বনা অভয় দিবে না; তাকেও নয়, বিশ্বনরকেও নয়। তার বিদ্যাকে যেমন, তেমনি তার আকুতিকেও "প্রজ্ঞাপারমিতা"—প্রজ্ঞাযোগে পারীণা হইতে হইবে।

ভারতের এই পরিপূর্ণ পরম যোগকে তার নেপথ্য তিরোভাব থেকে বিশ্ববোধিগোচর আবির্ভাবে আনিবার নিমিত্ত—শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব। কাজেই, এ দুটি মহান্ আবির্ভাবের যুগপত্তাকে কে বলিবে অহেতুক আকস্মিক?

ভারতের স্বাধীনতার আবির্ভাব বিশ্বনরে মধুচ্ছন্দা হৃদয়স্পন্দনটি আনিয়া দিয়া মিলাইবে ক্ষেম। আর শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব বিশ্বনরে বুদ্ধি এবং বোধিকে বিশারদী জ্যোতিষ্মতী ঋতম্ভরা সত্যম্ভরা করিবার সাধনোপায়টি নূতন করিয়া দেখাইয়া মিলাইবে যোগ।

ব্যষ্টি এবং বিশ্বজনে তাদের কর্ম ও কৃষ্টিতে বিজ্ঞানে ও বিশ্বাসে

স্বাধীনতা ও সাম্যে, উপায় ও লক্ষ্যে আততায়ী বিগ্রহ থেকে পরম সমন্বয়ী মৈত্রীতে আনিবার নিমিত্ত এই যুগ্ম মহা আবির্ভাবের যে বিরাট সুগভীর ভাবব্যঞ্জনা, তার ভাবনা কর। আর, সেই নিমিত্তই "সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং · সমানা ব আকূতয়ঃ।"

অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার মুক্তিকাম ভারতের সেই স্বারাজ্যসাধনের কল্প পাদপটি আজ পুষ্পিত ফলিত হইয়াছে। স্বাধীনতা ফলিয়াছে কিন্তু পূর্ণযোগী শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানে যে পূর্ণ স্বারাজ্য, তা ফলিতে বাকি। পূর্ণ স্বারাজ্য যে কি বস্তু, তা অনেকেরি ধ্যানে আসে নাই। আত্মণী আত্মরাট্ স্বরাট্, এসব এখনও ঔপনিষদম্ রহস্যম্। বিশ্ব-ব্যবহারে এসব খাটে কি করিয়া? সমগ্র বিশ্ব মানবসংস্থায় ভারতের ক্ষেম এবং যোগ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে পূর্ণস্বারাজ্যরূপ মহাফলটি ফলিবে না। এ নিমিত্ত শ্রীঅরবিন্দকে আমাদের ধ্যানলোকে বসাইয়া আমাদের সাধন প্রয়াসের প্রেরণাটি পাইতে হইবে। ইহা কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী মতবাদ বা সম্প্রদায়ের কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলিতে ভারতের চিরবরেণ্য আত্মাই বুঝিতেছি। নৈমিষারণ্যের তপোবনে এই অমর আত্মারই সন্ধান প্রাচীন করিয়াছিল; শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগে নবীন সেই আত্মারই সন্ধান পাইতেছে।

পঞ্চাশৎ বর্ষের এই ভারতের স্বাধীনতাপ্রয়াসকল্পপাদপের কোথায় যে মূল, তাও আজ ভুলিলে চলিবে না। কেননা মূল থেকেই রস প্রাণ শক্তি—সব কিছু। সে মূলটি ছিল, ভারতের জাতীয় ভাবে ও আদর্শে ভারতের শিক্ষাদীক্ষা সাধন-সিদ্ধি। এই জাতীয় শিক্ষা মহাব্রতী হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় আসেন। তিনিই হইলেন এ যাগের হোতৃসত্তম। যাগে সমিৎপাণি হইয়া আর যাঁরা আসিয়া ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ সশরীরে নাই। কিন্তু তাঁদের আত্মবলি অমর অপরাজেয়।

ভারতের জাতীয় শিক্ষা শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানে এবং কর্মে তার

স্বরূপ তার প্রকৃতি তার আপন ছন্দ ও গতি পূর্ণ উন্মোচিত করিয়াছিল। তাই—"বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এ শিক্ষার মূল মন্ত্র। ত্যাগ বা বলি ব্যতীত এ বিদ্যালভ্য যে অমৃত সেটি লাভ হয় না। আত্মা ছাড়া আর কিছুতে অমৃত মিলে না। আর, বলহীন হইলে আত্মাও লভ্য নয়। ব্রহ্মবর্চ্চঃ ভাগবতী শক্তিই যে সেই বল, তা কর্মযোগে ধ্যানে এবং পরম উপলব্ধিতে বুঝিতে হইবে। এই সূত্র ধরিয়া শ্রীঅরবিন্দের জীবনে তার সাধনক্রম এবং পরম পরিণতিটি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টাতেও পরম কল্যাণ। সেই মূল থেকেই —যথার্থ ও প্রাণবন্ত ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা থেকেই নব শুভারম্ভ হউক।

*

ঋষি-দৃষ্টি

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

অনন্য সাধারণ ঋষি-দৃষ্টি লইয়া শ্রীঅরবিন্দ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যৌবনের উন্মেষে মানুষ যখন দিশাহারা হইয়া যায় তখন তিনি নিজেকে নিজে আবিষ্কার করিলেন যে তিনি দশজনের মত একজন নহেন। তাঁহার জীবনের তিনটি মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত ভাবেই সজাগ হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়স ত্রিশের কোঠায় পৌঁছিতেই।

এই তিনটি উদ্দেশ্য হইল জনসেবাব্রত, ভারত উদ্ধার ও ঈশ্বর দর্শন। এই তিনটি তাঁহার জীবনের সাধনা এবং এই সাধনায় তিনি যে জয়ী হইবেন এ সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন নিশ্চিত। সাধনায় শ্রীভগবান তাঁহার সাথে আছেন এই অবিচলিত বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিতে তিনি ছিলেন সর্ব্বদাই স্থিত।

জনসেবাব্রত। ঋষিবর যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ধন সম্পদ প্রতিভা সবই ভগবানের, তন্মধ্যে যাহা তাঁহার অত্যাবশ্যকীয়, মাত্র তাহাই তাঁহার নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। যাহা বাকী তাহা ভগবানের। ভগবানের বস্তু তাঁহাকেই ফেরৎ দেওয়া কর্ত্তব্য। ফেরৎ দেওয়া অর্থ ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। ধর্ম্মকার্য্য বলিতে মুখ্যতঃ মানবের সেবা। দেশের কোটী কোটী ভাইবোন যাহারা অনাহারে মরিতেছে, কষ্টে দুঃখে কোনমতে বাঁচিতেছে তাহাদিগকে সেবা করাই হইল ধর্ম্মকার্য্য। এই কার্য্যদ্বারাই ভগবানের পাওনা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্য যে না করে সে চোর। চোর তিনি কখনই হইবেন না

ইহাই তাঁহার প্রথম সংকল্প।

ভারত উদ্ধার। ভারত বলিতে ঋষিবর কতগুলি মাঠ ঘাট বন পর্ব্বত নদনদী বুঝিতেন না। ভারত ঋষির দৃষ্টিতে একটি জীবন্ত সত্তা। ভারত তাঁহার জননী, পূজার পাত্রী ভক্তির পাত্রী। তিনি তখন দেখিতেছিলেন একটা ভীষণ অসুর তাঁহার মায়ের বুকের ওপর বসিয়া রক্ত চুষিতেছে। সুতরাং তখন তাঁহার একটিমাত্র কর্ত্তব্য অসুরকে হঠাইয়া দিয়া মাকে উদ্ধার করা। এতদ্ভিন্ন আর কোন কাজে বা আমোদে প্রমোদে মাতিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে মহাপাপ তুল্য। তিনি মর্ম্মান্তিক ভাবেই বিশ্বাস করিতেন যে মাকে মুক্ত করিবার, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল তাঁহার আছে। বল বলিতে তিনি বুঝতেন শারীরিক শক্তি বা ক্ষাত্রবীর্য্য নহে। বল বলিতে জ্ঞানের বল। ব্রহ্মতেজঃ, জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত তপস্যার তেজঃ। এই তেজোবলে ভারত উদ্ধার তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা।

ঈশ্বর দর্শন। তাঁহার তৃতীয় উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। ভগবানের দর্শন লাভ তাঁহাকে করিতেই হইবে। এই তাঁর ব্রত। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন উপায় থাকিবেই। সে পথ যতই দুর্গম হউক ঋষির দৃঢ় সংকল্প সে পথে চলিবেনই, ঈশ্বর দর্শন করিবেনই। এই দৃঢ় সংকল্প।

এই তিনটি মহান উদ্দেশ্য লইয়া ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সাধন-জীবন আরম্ভ হইয়াছে এবং পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধিতে সাধনার পরিপূর্ত্তি আসিয়াছে। যতই সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন ততই এই তিনটি লক্ষ্য একাকার হইয়া একটিমাত্র আরাধ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। সেবাধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। ঋষিবর বিশ্বাস করিতেন যে অহং-সর্ব্বস্ব মানুষ পশুর স্তরে, আর অহংশূন্য মানুষ দেবভূমিতে। ক্রমোন্নতির ধারা হইতেছে মানবের মধ্যে শ্বাপদের বা বন্য মানুষের প্রকৃতিকে ক্ষয় করিয়া উঠিয়া চলা। দেবত্বে পৌঁছিয়া দিব্য জীবন

লাভ করাই সাধনার পরিপূর্ণতা। ভারত একটী জীবন্ত সত্তা! তাহার সমষ্টি জীবনের একটী প্রেরণা আছে। সেটী হইতেছে সেবা। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নয়। সেবা হইতেছে সমাজের সকল স্তরের নরনারীকে প্রীতি ভালবাসা দ্বারা একটি অভিন্ন জীবন ধারায় সংযুক্ত করিয়া তোলা। সুতরাং সেবাব্রতই ভারতীয় সাধনার মূলসূত্র। সেবাব্রতই ভারতাত্মার মর্ম্মবাণী। নিজের জন্য অপরকে বলিদান পশুর ধর্ম্ম। অপরের জন্য ভারতের কল্যাণের জন্য নিজেকে বলিদান দধিচীর কার্য্য, মহামানবের ধর্ম্ম। এইভাবে শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানে মানবসেবা আসিয়া ভারত সেবায় পর্য্য বসান হয়।

ভারতের মুক্তি বলিতে ঋষিবর বুঝিতেন সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি। ইহা ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে কখনই সম্ভব নয়। ইউরোপকে হুবহু ভারতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলে ভারত উদ্ধার হইবে না, হইবে আমাদের আত্মহত্যা। ইউরোপের অনুকরণে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য চিরদিনের মত হারাইয়া ফেলিব। গীতার বাণী—নিজের ধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুশ্রেয়ঃ, পরের ধর্ম্ম ভয়াবহ। কারণ, নিজের ধর্ম্মে মরিলে হয় নবজন্ম পরের ধর্ম্মে জয়লাভ করিলেও হয় আত্মহনন।

ভারতের প্রকৃত মুক্তি আসিবে ভারতীয় তপস্যায় ভারতীয় জ্ঞানে, ভারতীয় শক্তিতে। ভারতীয় চিন্তায় শক্তি অর্থ Strength নহে। শক্তি অর্থ সেই বিশাল ক্ষমতা যাহার বলে অনন্ত বিশ্ব ব্যক্ত হইয়াছে, প্রতিনিয়ত স্থির আছে ও চলিতেছে। আর তপস্যা অর্থ ইউরোপীয় Discipline নয়। তপস্যা অর্থ ঐ মহাশক্তিকে জীবনের মধ্যে মূর্ত্তি দান করা, প্রাত্যহিক কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা। ভারতীয় চিন্তায়, জ্ঞান অর্থ পাশ্চাত্য Philosophy নহে, জ্ঞান অর্থ সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন। সত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া সত্যের আন্তর অনুভূতি। সত্যানুভূতিই ঈশ্বর দর্শন। সুতরাং ঋষিবরের ধ্যানে

মানব সেবা, ভারতের মুক্তি ও ঈশ্বর দর্শন একটি অখণ্ড শাশ্বত ভাববস্তু, একটি জীবন লক্ষ্য বা পরিপূর্ত্তি। এই লক্ষ্যবস্তুটি লাভের জন্য শ্রীঅরবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান শুনিয়াছিলেন—"আমার ইচ্ছানুসারে কাজ কর। নিজেকে জান, শুদ্ধ হও।" কেবল ডাক শুনিয়াছিলেন না, সাড়াও দিয়াছিলেন। "বাসুদেবসাধং" প্রত্যক্ষ দর্শনও করিয়াছিলেন। নিজে সিদ্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতিকে একস্তর ওপরে উঠাইবার জন্য, মনোময় ভূমিকা হইতে বিজ্ঞানময় পদবীতে তুলিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন ও সর্ব্বতোভাবে অন্তরে অনুভব করিতেন যে ঐ মহান্ কার্য্যের জন্য তিনি "বৃত" হইয়াছেন। বৃত হইয়াছেন অর্থ—একটি মহাশক্তি নিজ ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে গঠন করিয়া তাঁর হাতের যন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। ঋষিবর দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে মহাবিশ্ব মধ্যে একটি মহাকাল শক্তি কাজ করিতেছে। তাঁহার একটি কাজ জীবের হৃদয় কন্দরে বাস করিয়া ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের উত্থান পতনের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করা। তাঁহার দ্বিতীয় কাজ বিরাট আন্দোলনের মধ্য দিয়া ক্রমাভিব্যক্তির প্রগতিকে পর্ব্বে পর্ব্বে ঊর্দ্ধগামী করিয়া তোলা। বিশ্বের অন্তঃ-পুরুষ মহাকালের তপঃ শক্তির মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, জগতের ক্রমপ্রকাশে জীবের প্রগতি নব নব স্তরে উন্নয়ন। এই প্রগতির পথ কখনও সুন্দর মধুর, আবার কখনও ভয়াল, ক্রূর, দারুণ। বৃন্দাবনের রাসলাস্য ও কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসের তাণ্ডব দুই মিলিয়া সৃষ্টির ধারায় একটি মহাসমন্বয়ের সাধন মহাউদ্ধারনের তপস্যা করিয়া চলিয়াছেন মহাকাল। এই প্রগতির পূর্ণ সার্থকতা আসিবে সেদিন যেদিন দুঃখ দৈন্য রূপান্তরিত হইয়া তৎস্থলে আসিবে কল্যাণ, আনন্দ—সত্যং শিবং সুন্দরম্। সেদিন প্রতিটি জীব স্বরূপাস্বাদন করিবে।

এই প্রগতির পথ চলা হয় বিরাট বিরাট বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের

মাধ্যমে, যুগধর্মরূপী মহাকাল পুরুষ যখন লক্ষ্য পানে ধীরে অগ্রসর হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি সেই আন্দোলনকে উপচিত করিয়া অনিবার্য্য সিদ্ধির দিকে লইয়া যায়। চলার পথে মহাকাল শক্তি এক এক মানুষের মত মানুষকে ভর করিয়া চলেন। উপযুক্ত আধার বোধে কোন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বরণ করিয়া লয়েন। যাঁহাকে বরণ করেন তিনি বৃত। ঋষিবর সর্ব্বান্তকরণে জানিতেন যে তিনি নিজে বৃত হইয়াছেন। যতদিন মহাকালের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় ততদিন তিনি বৃত হইয়াই থাকিবেন। কারণ মহাশক্তি বৃত ব্যক্তিকে ছাড়িবেন না ছাড়িতে দিবেনও না।

শ্রীঅরবিন্দ জানিতেন যে শক্তিকে বৈষ্ণবেরা বলেন অঘটনঘটন-পটীয়সী, শাক্তেরা বলেন মহাকালী, শ্রুতি বলেন দেবাত্মশক্তি স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং', যাঁহার ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটিতেছে—তিনি সেই মহাকালী শক্তি আজ বিশ্বমানবকে প্রগতির পথে এক ধাপ তুলিয়া দিবার জন্য মহাতপস্যারত। সেই তপস্যার কেন্দ্রস্থ পুরুষ তিনি নিজে। তাঁহাকে ভর করিয়া তাঁহার মধ্য দিয়া এই মহাসাধনা চলিতেছে ইহা তিনি প্রতিটি মূহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন মহাঋষিজনোচিত দিব্য দৃষ্টি দ্বারা।

যে ক্রমভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রগতি চলিতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই : শ্রুতি আত্মার পাঁচটি কোশের সংবাদ দিয়াছেন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। আত্মার বাহিরের কোশটা অন্নময়, জড় শক্তিতে গড়া দেহ। তার মধ্যে প্রাণ শক্তি দিয়া গড়া প্রাণময় কোশ। প্রাণময় কোশে স্থিত বলিয়াই জীবমাত্রের নাম প্রাণী। প্রাণময় কোশের গভীরে মনোময় কোশ। এই স্তরের ওপর এখন মানবসভ্যতা দাঁড়াইয়া আছে, মানুষের প্রাণযুক্ত দেহে আর একটি শক্তির প্রকাশ হইয়াছে তাহার নাম মনন শক্তি। মানবেতঁর প্রাণীতে মননশক্তি অস্পষ্ট। মানবে সুস্পষ্ট।

মনন ভূমিতে বুদ্ধির প্রকাশ হইয়াছে। বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনাই বুদ্ধির কার্য্য। ইহা ছাড়া বুদ্ধির আর একটা উন্নততর বিশেষত্ব আছে। সেটি হইল আত্ম সচেতনতা (Self Consciousness) আত্ম সচেতনতার পূর্ণ অনুশীলনে বুদ্ধি বিজ্ঞানময় ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়। বিজ্ঞানময় কোশে স্বপ্রতিষ্ঠা হইলেই তাহার গভীরে আনন্দময় কোশের অভিব্যক্তি হয়। এই বিজ্ঞান-আনন্দময় কোশই চিৎশক্তির আধার। ক্রমপ্রকাশের প্রগতি এখন মনন ভূমি হইতে চিদ্ভূমির দিকে বেগে ছুটিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মনন ভূমি পর্য্যন্ত প্রগতি চলিয়াছে প্রকৃতির নিজের বেগে। এখন চাই মননশীল মানবের সক্রিয় সহযোগিতা। শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব্ব অনুভূতি এই যে তিনি নিজে জীবন-সাধনা দ্বারা মহাকালের প্রগতি বেগের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা চালাইতেছেন। আমাদের সকলের সাধনাই যেন তিনি করিতেছেন। একটা যে বিরাট ভাবের প্রেরণা, ক্রমাভিব্যক্তির রূপ প্রকাশের প্রবল জীবন্ত ধারা তাহারই হাতে তিনি একটি যন্ত্র স্বরূপ। আমরাও প্রত্যেকে তাহাই কিন্তু সে খবর আমরা জানি না। শ্রীঅরবিন্দ জানিতেন, প্রতিটিক্ষণে অনুভব করিতেন। এই দিব্যানুভূতিকেই বলিয়াছি ঋষি দৃষ্টি।

ঋষিবর প্রথম জীবনে ছিলেন বিরাট কর্ম্মী, তারপর হইয়া গেলেন যেন গুহাবাসী তপস্বী। ইহা তাঁহার জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন নয়, পূর্ণ পরিণতি। মানুষ যখন চেষ্টা করিয়া কাজ করে তখন প্রকৃতির শক্তিরাজী তাহাকে চালায়। যখন শান্ত সমাহিত হয় তখন মানুষ হয় প্রকৃতির ঈশ্বর। উর্দ্ধ প্রতিষ্ঠ প্রভুত্ব হইতে আসে অটুট সামঞ্জস্য। ঐ সামঞ্জস্যের মধ্যেই নিহিত নিজেকে শান্ত করিবার সামর্থ্য। উহা যাঁর আছে তিনি অমৃতত্বের অধিকারী। ঋষি যখন প্রশান্ত যখন অমৃতময় তখন তাঁহার কর্ম্মের তেজ প্রবলতর। সুতরাং ঋষিবর যখন মহা মৌন শান্ত নিস্তব্ধ তখন তিনি বিরাট কর্ম্মী। ইহাই গীতার

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা। মহাপ্রশান্তিময় নীরবতার মধ্যে বিপুল কর্ম্মবেগ ঋষিবরের জীবনের মধ্যে প্রমূর্ত্ত হইয়াছিল। পণ্ডিচেরীতে তিনি যখন ধ্যানমগ্ন তখন তাঁহার কথা ভাবিলে গীতার শ্লোক মনে পড়ে

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগর্ত্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। ২/৬৯

শ্রীঅরবিন্দের ঋষিদৃষ্টি স্পর্শে আমাদের সকলের জীবন অনুরণিত হউক। তাঁহার প্রশান্তিময় কর্ম্মতেজ আমাদের দিব্যজীবন লাভে সহায়ক হউক। শতবার্ষিকীতে অন্তরের এই আকূতি।

*

জন্মান্তর ও শ্রীঅরবিন্দ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের মনীষার পরিচয় শুধু তাঁর পরিণত জীবনেই পাই না, পাই শৈশবে, পাঠ্যজীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, সাধন-জীবনে এবং সিদ্ধ-জীবনে। জীবনচর্যার প্রতিটি বিকাশে বা পরিবেশে দেখি তাঁর মধ্যে প্রখর মনীষার দীপ্তি। তাই মনে হয়, মনীষা কোন যান্ত্রিক উপায়ে বা কলা-কৌশলের সাহায্যে সৃষ্টি হয় না, মনীষা সহজাত। মনীষা চিৎপ্রকাশেরই অভিন্ন রূপ। অথবা বলা যায়, মনীষা থাকে অব্যক্ত, শিক্ষা ও সাধনার অভিঘাতে হয় ব্যক্ত।

চিৎ ও চৈতন্য একই বস্তু। প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে সকল অবস্থায়ই চৈতন্যের স্ফুরণ ও লীলা অব্যাহত। শুধু প্রাণীই বা কেন, জড়পদার্থ যাকে বলি, চৈতন্যের অভিব্যক্তি তার মধ্যেও আছে। তবে অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত ভাবে সে' চৈতন্যই মানুষের মধ্যে হয় লীলায়িত মনীষার রূপ ধরে, বা বুদ্ধি ও বোধির রূপ নিয়ে। সকল মানুষের মধ্যেই দেখি চিদ্‌প্রকাশরূপ মণীষার বিকাশ, কিন্তু প্রকাশ তার এক রকমভাবে হয় না, কারু মধ্যে বেশী, কারু মধ্যে বা কম, আর পূর্ণপ্রকাশ দেখা যায় দেবমানবে ও অবতারপুরুষে।

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে চিদানুভূতির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখি যখন তিনি আচার্যরূপে আসীন জ্ঞানঘনমূর্তি নিয়ে। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি প্রতিভাত ছিলেন কর্মী, যোগী বা সাধনসিদ্ধ পুরুষরূপে। অথচ অসামান্য ব্যক্তিত্ববান ছিলেন সেই মানুষটি। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় ও মনঃশক্তি ছিল তাঁর সংগ্রামময় জীবনে! আজ

সেই মহামানবের শতবার্ষিকী-উৎসবের শুভমুহূর্তে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই আমরা সকলে।

অমরত্বের ভাবনা সকল মানুষই করে পৃথিবীতে; জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতময় জীবন প্রাপ্তির আশা ও আকাঙ্খা তাদের মধ্যে থাকে অপরিসীমভাবে। কিন্তু কেবল আশা ও আকাঙ্খাই কি মানুষের চাওয়া-পাওয়ার চাহিদাকে পূর্ণ করতে পারে? প্রকৃতির এমনই অপরিহার্য নিয়ম যে, জন্ম-মৃত্যুর পথে মানুষকে যেতেই হয় বারবার নূতন নূতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আর অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পূর্ণতা যেদিন হয় সার্থক মানুষের জীবনে, সেদিনই সে উপনীত হয় চরম ও পরম লক্ষ্যের পাদপীঠে। অবিদ্যার ঘন-আবরণ ভেদ ক'রে সে সেইদিনই এবং মুক্তিময় ও আনন্দময় হয় তার জীবন অমৃতত্বকে লাভ ক'রে।

কিন্তু সে অমৃতত্বের স্বরূপ কি? বেদান্ত বলে, সে অমৃতত্বই পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের নিরাবরণ রূপ। সে রূপের কোনদিন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই; সে রূপের কোনদিনই জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। সে চৈতন্য-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই অমৃতত্ব লাভ। এই অমৃতত্ব লাভ হলে চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে কোন ভেদভাবই আর থাকে না, সবই হয় একাকার ও একতত্ত্বে পরিণত!

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, জন্ম-মৃত্যু মনুষ্য-জীবনে একটি বিস্ময়কর ও অপরিহার্য সমস্যা, কেননা 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে' এটাই হোল চিরন্তনী বাণী। তবে জন্ম ও জন্মান্তর সকলের জীবনে পরিহাসরূপে গণ্য হলেও সে পরিহাস বা প্রহেলিকার পিছনেই পাই জীবন-মৃত্যু-সমস্যার সমাধান।

একথা সত্য যে, জীব স্বরূপে চিরদিনই অজয় ও অমর, সুতরাং জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের সেঅতীত, অথচ প্রকৃতির রাজ্যে সে মায়া ও কর্মফলের অধীন। সুতরাং ইচ্ছা করলেও জন্ম-মৃত্যুর

প্রহেলিকাকে সে অতিক্রম করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে এ'পরিহাসলীলারই বা সত্যকারের তাৎপর্য কি? শ্রীঅরবিন্দ বলেন, যদি বর্তমান জীবনের কোন একটি বিকাশক্ষেত্রের দিকে আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখি যে, সে ক্ষেত্র অতীতের কোন ক্ষেত্র বা স্তর থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অবিচ্ছেদ্যভাবেই সম্পর্কিত। সুতরাং কোন জীবাত্মা যদি তার ব্যক্তিত্বের অগ্রগতিকে নিয়ে বর্তমান জীবনসত্তার উপনীত হয় তবে একথা নিশ্চয়ই মনে করতে হবে যে, পরজীবনেও সে সেই ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করেছে, বা সেই ব্যক্তিত্বের সে অধিকারী ছিল, আর এরইজন্য ইহজীবন ও পরজীবন—ইহলোক ও পরলোকের ধারণাকে সে জীবনের চিন্তা থেকে বাদ দিতে পারে না। তারিজন্য মানুষমাত্রেরই মনে ক্রিয়াশীল দেখি দুটি প্রধান চিন্তা: একটি অনাদি ও অনন্ত চিদ্‌সত্তা ও অপরটি আদি ও সান্ত অচিদ্‌সত্তা; অর্থাৎ একটি চৈতন্য ও অপরটি জড়, একটি ইহলোকে স্থিতি ও অপরটি পরলোকে স্থিতি। জন্ম ও জন্মান্তর স্তরদুটির মর্মকথাই তাই। অথচ বিশ্বের কোন মানুষই চায় না যে, ইহলোকে তার স্থিতি বা সত্তার ঘটুক চিরবিলোপ সাধন এবং তারিজন্য আত্মরক্ষার ও বাঁচার সংস্কার থাকে তার মধ্যে চিরজাগ্রত।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রতিটি প্রাণপঙ্ক বা জীবাত্মা বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি এই দ্বন্দ্ব বিকাশের মধ্যে ক্রমাগতই এক দেহ থেকে অন্য দেহে হয় সংক্রমিত ও রূপান্তরিত—যতদিন না সে মানবীয় জ্ঞানস্তরে উন্নীত হয়ে মনুষ্য রূপে না করে জন্মগ্রহণ। একথাও সত্য যে, ঐ প্রচেষ্টাই জীবাত্মাকে উত্তরোত্তর উন্নত বিকাশস্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন: "What we see of Nature and human nature justifies this view of a birth of the individual soul

from form to form until it reaches the human level of manifested consciousness which is its instrument for rising yet higher levels."[1]

(ক্রমাগতই অনুন্নত থেকে উন্নত বা অধস্তন থেকে উর্ধ্বে জীবনের স্তরে প্রকৃতি বিকাশ লাভ করে এবং প্রতিটি স্তরেই সে তার অতীতের সঞ্চিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে নূতন বিকাশের পথে যাত্রা করে।) সাংখ্যকার কপিলও এ' রহস্যের পরিচয় দিয়ে বলেছেন ঃ "প্রকৃত্যাপূরণাৎ"। তবে জীবাত্মার ক্রমসংসরণ-নীতি কিন্তু সত্য ও অপরিহার্য। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, এই ক্রমসংসরণ-নীতি বা গতির মুখে জীবাত্মা তার অতীতের কোন সংস্কার ও অভিজ্ঞতাকেই কোনদিন হারায় না।) অবশ্য সেকথা পূর্বেই বলেছি। সেজন্য জড়-প্রকৃতিকেও সে যেমন গ্রহণ বা আত্মগত করে, তেমনি গ্রহণ করে তার সকল কিছু সূক্ষ্ম-মানস-প্রকৃতিকেও। আবার তেমনি গ্রহণ করে নিজের মধ্যে সুপ্ত চৈতন্যপ্রকৃতিকেও, আর তারি জন্য একটি মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করি আমরা মানব-প্রকৃতির পাশে পশু-প্রকৃতির লীলায়ণ, এবং তারই জন্য মানুষের মধ্যে দেখি দয়া ও করুণার পাশাপাশি নির্মমতা ও খলতার সহপ্রকাশ। এ' যেন বিরাট প্রকৃতিগর্ভে আলো-ছায়ারই সহস্যময় খেলা। আর এ' থেকে আবার আমরা ধারণা করতে পারি যে, চৈতন্যাত্মা ও জড়দেহের মধ্যে যে পার্থক্য, বা চিদাত্মা ও প্রাণবীজের মধ্যে যে পার্থক্য, অথবা জীবাত্মা ও মনের মধ্যে যে পার্থক্য, সে পার্থক্যের আসল সত্তা যেন কিছুমাত্র নাই, কেননা জানি যে, আত্মা ছাড়া জড়দেহের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, বরং প্রতিটি জড়দেহই থাকে চৈতন্যসত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বা সম্পর্কিত। তাই জড়বস্তু বলে যাকে আমরা সাধারণভাবে

---

1. Vide *The Life Divine* (The Greystone Press, New York, N. Y., 1949), p. 677.

অভিহিত করি, সে জড়বস্তু কিন্তু আসলে চৈতন্যসত্তারই অনভিব্যক্ত রূপ। শ্রীঅরবিন্দই বলেছেন, "nothing can exist which is not substance and power of Brahman"। সুতরাং বলা যায়, ব্রহ্ম যেমন কোনদিনই নিঃশক্তিক নন, দেহও তেমনি আত্মসত্তাকে ছেড়ে কোনদিন স্বতন্ত্রভাবে থাকে না। সেজন্য মানুষের ক্রমসংসরণ-রূপ অভিব্যক্তিনীতিকে স্বীকার করলে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, জড় ও মন উভয়েই অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত চৈতন্য বা চিদ্‌সত্তার সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে অসম্পর্ক বা বিচ্ছেদের কল্পনা আসে তখনই যখন অজ্ঞান বা আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে চৈতন্যালোক হয় আবৃত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, জীবাত্মা মানবীয় স্তরে উপনীত হবার পরেও তার পুনর্জন্মগতি অব্যাহত থাকে কি-না? আর যদি অব্যাহতই থাকে তাহলে কোন্ পথে বা কি ভাবে জীবাত্মা আবার জন্ম-মৃত্যুর পথ অতিক্রম করে? এখানেও এ' প্রশ্নের কিন্তু ঠিক সমাপ্তি হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "And, at first, we have to ask whether the soul, having once arrived at humanity, can go back to the animal life and body, a *retrogression* which the old popular theories of transmigration have supposed to be an ordinary movement."[1] অর্থাৎ তাহলে এ' প্রশ্নও আসে যে, জীবাত্মা একবার মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করলে আবার সে পশুদেহে ফিরে যায় কিনা? এটি হোল প্রাচীন ক্রমসংসরণের নীতি যে, মানুষ কর্মফল অনুযায়ী মনুষ্যজন্ম থেকে ফিরে গিয়ে আবার পশুজন্মও গ্রহণ করতে পারে। আর জীবাত্মার পুনর্জন্মগতি যদি অব্যাহতই

1. Ibid., P-678.

থাকে তবে প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী ধরে নিতে হয় যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মার যেমন উর্ধ্বগতি হয়, তেমনি হয় নিম্নগতিও। উপনিষদেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলেই পূর্বপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় যে, জীবাত্মা জন্ম-মৃত্যুর পথ অতিক্রম করে উর্ধ্ব ও নিম্ন এই উভয় গতিকেই আশ্রয় ক'রে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একথা ঠিক সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন: "It seems impossible that it should so go back with any entirety, and for this reason that the *transit from animal to human life means a decisive conversion of consciousness,* quite as decisive as the conversion of the vital consciousness of the plant into mental consciousness of the animal. *It is surely impossible* that a conversion so decisive made by Nature should be reversed by the soul and the decision of the spirit within her come, as it were, to naught."[1]

মোটকথা শ্রীঅরবিন্দের মতে, জীবাত্মা যদি ক্রমবিকাশের উজান বয়ে একবার মনুষ্যস্তরে উপনীত হয় তবে নিম্নপ্রাণীর শরীরে, বা অন্য কোন শরীরে তার আর পুনরাবর্তন হয় না। উদ্ভিদের প্রাণসত্তা যেমন কোনদিনই পশুপক্ষীর প্রাণসত্তায় রূপান্তরিত হতে পারে না, তেমনি মানুষের প্রাণসত্তা মনুষ্যদেহ নিয়েই জন্মায়, অন্য কোন দেহকে আশ্রয় করে না। তবে এ' রকম হতে পারে যে, মানুষ যে সকল নিম্ন বা উচ্চ শ্রেণীর পশুস্তর অতিক্রম ক'রে মনুষ্যস্তরে উপনীত হয় সেই মনুষ্যস্তরে হয়তো পশুপ্রবৃত্তির কিছু-কিছু সংস্কার রূপায়িত হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ এ' তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন:

---

1. Ibid , p. 678.

"But whether the animal reversion is possible or not, the normal law must be the recurrence of birth in new human forms for a soul that has once become capable of humanity."[1]

এখানে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনির্বাণ-কৃত ইংরাজী *The Life Divine*-এর মর্মানুবাদ এ'প্রসঙ্গে উদ্ধৃত ক'রে বলি: "জন্মান্তরবাদের একটা রকমের আছে, যাকে বলা হয় দেহান্তর-সংক্রমণবাদ (Theory of Transmigration)। গ্রীক মরমীয়া পিথাগোরাসের নামে এটি পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত ছিল।[২] এই মতবাদের প্রাচীন প্রামাণিক রূপ যাই থেকে থাকুক, লোকায়ত রূপটি কিন্তু যৌক্তিক ব'লে মনে হয় না। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মানুষের আত্মা আরেকটা দেহ আশ্রয় করে—হয়তো শিয়াল বা কুকুর বা শূকরের দেহ—এ'কথা বলা নিতান্ত খামখেয়ালী ঠেকে। * * * এ' অবস্থায় আবার তার ইতরজীবের পর্যায়ে নেমে আসা স্বাভাবিক নয়। * * তাদের মধ্যে কোনও একটা পাশববৃত্তির বাড়াবাড়ি[৩] থাকলেও মৃত্যুর পর তাদের পশু হয়েই জন্মাতে হবে—একথা বলা সঙ্গত হয় না। তাহলে মানতে হয়, মানুষের প্রকৃতির গতি কেবল নিম্নগামী। তখন বিশ্ব-প্রকৃতির উর্ধ্বপরিণামের কথাটা ফাঁকা হয়ে পড়ে। সুতরাং জীবসত্ত্ব পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হলে তার সম্মুখে উর্ধ্বপরিণামের দুয়ার খুলে যায়, পাশবভাবের খাদ মেশানো থাকলেও তার স্বাভাবিক গতি

---

1. Ibid., p. 679.

২। স্বামী অভেদানন্দ-রচিত ইংরাজী (১) *Reincarnation* ও (২) *Life Beyond Death*-গ্রন্থদুটিতে এ' সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা দেওয়া আছে।

৩। শ্রীঅরবিন্দ *The Life Divine*-গ্রন্থে এ' সম্পর্কে বলেছেন: "Or at most there might be supposing certain animal

হয় বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার দিকে—এই ভাবনাই যুক্তিযুক্ত।"

আচার্য শ্রীঅরবিন্দের জন্মান্তর বা দেহান্তর-তত্ত্ব-সম্পর্কে আলোচনা-কালে মনে পড়ে স্বামী অভেদানন্দের এ' সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের কথা। স্বামী অভেদানন্দ *Reincarnation*-বিষয়ে নিউইয়র্কে ১৮৯৮—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকবার বিদ্বদবর্গের সম্মুখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সে বক্তৃতাই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ নিউ-ইয়র্ক থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দ শ্রীঅরবিন্দের মতোই সে' গ্রন্থে বলেছেন: "According to this theory of Reincarnation, there is growth and evolution of each individual soul from the lower to higher stages of development. The soul or germ of life, after passing through the lower stages, comes to the human plane and gains experience and knowledge and after coming to the human plane, it does not retrogate to human bodies."[২]; অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ অনুসারে জীবাত্মা বা প্রাণপঙ্ক নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরের বিকাশক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে উত্তরোত্তর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের জন্য এবং মানবীয় স্তরে জন্মগ্রহণ করার পর সে আর নিম্নস্তরের কোন পশু-শরীরে জন্মগ্রহণ করে না। স্বামী অভেদানন্দ দার্শনিক প্লেটোর মতের সম্পর্কেও এখানে মন্তব্য ক'রে বলেছেন: "The Platonic theory teaches that human souls migrate into animal bodies

---

propensities to be vehement enough to demand a separate satisfaction...", p. 679

১। শ্রীঅনির্বাণ: 'দিব্যজীবনপ্রসঙ্গ'

২। Vide স্বামী অভেদানন্দ: ***Reincarnation***, p. 97.

or angelic bodies and return from the angelic to the human or the animal, and that some of them prefer to be animals, while the theory of Reincarnation, taking its stand upon the scientific truth of gradual evolution, teaches that the human souls have already passed through different grades of the animal, nay, of the vegetable kingdom, by the natural process of evolution. After having once received the human organisation, why should a soul choose to go back to the lesser and more imperfect organism of an animal?"[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ উভয়েই জন্মান্তর-তত্ত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু জীবাত্মা বা প্রাণপঙ্ক (germ plasm) একবার মানবদেহ ধারণ করলে ক্রমবিকাশনীতির অনুযায়ী সে আর পশুদেহে জন্মগ্রহণ করে না। সেজন্য দুই মনীষীই Retrogression Theory বা পশ্চাদ্‌সংসরণনীতি খণ্ডন করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেন: "Although there are passages in the scriptural writings of the Hindus which *apparently* refer to the retrogression of the human soul into animal nature, *still such passages* do not necessarily mean that the souls will be obliged to take animal bodies."[২] তবে নৈতিক স্তরের ক্ষেত্রে জীবাত্মার নিম্নাবতরণের কথা শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ দু'জনেই স্বীকার করেছেন।

১। Vide অভেদানন্দ: *Reincarnation*, p. 98

২। Ibid. p. 98.

এ' সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "Or at most there might be, supposing certain animal propensities to be vehement enough to demand a separate satisfaction quite of their own kind, a sort of partial rebirth, a loose holding of an animal form by a human soul, with an immediate subsequent reversion to its normal progression"[১]।

ঠিক এ'ধরনের নৈতিক স্তরে পশ্চাদ্‌সংসরণের কথা স্বীকার ক'রে স্বামী অভেদানন্দও বলেছেন: "They may live like animal even when they have human bodies, as all may find among us many people like cats and dogs and snakes in human form, and they often more vicious than natural cats, dogs or snakes."[২] । বলা বাহুল্য যে, স্বামীজী মহারাজ অনুরূপভাবেই মন্তব্য করেছেন তাঁর ইংরাজী *Life Beyond Death*-গ্রন্থটিতেও" ।[৩] সে গ্রন্থে তিনি বলেন, জীবাত্মা মৃত্যুর পর মানুষ হয়েই জন্মায়, কিন্তু তার অনেকক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র পশু-চরিত্রের মতোই অবনত হতে দেখা যায়। এমনও হয়, সাধারণ হিংস্র পশুদের অপেক্ষা তার চরিত্র বা আচরণ অত্যন্তই নিন্দনীয় হয়।[৪]

১। Vide *The Life Divine* (The Greystone Press, New York, N. Y, (1949), p. 679.

২। Vide অভেদানন্দ: *Reincarnation*, p. 98.

৩। *Life Beyond Death*-গ্রন্থের বিষয়বস্তু আমেরিকা থাকাকালে স্বামী অভেদানন্দ সেখানকার বিদ্বদবর্গের সম্মুখে বক্তৃতাকারে আলোচনা করেছিলেন।

৪। *Idealist View of Life*-গ্রন্থে মাননীয় রাধাকৃষ্ণনও স্বীকার করেছেন: "It is impossible for man to degenerate into a

সুতরাং দেখা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই যাঁরা যথার্থ চিন্তাশীল মনীষী তাঁদের আলোচনায় ও সিদ্ধান্তে অনেক সময় ঐক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় এবং একথা তাঁরা স্বীকার করেন যে, জীবাত্মার ভোগ তার কর্মানুযায়ী ফলের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্মফল হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেই স্বীকার করেন। আর একথা সত্য যে, মানুষের মধ্যেই জাগ্রত যিনি বিরাট পুরুষ তিনিই নিজেকে প্রকাশ করেন মানুষরূপে মনুষ্যলোকে এবং এই প্রকাশের গতি থাকে নিম্ন থেকে ঊর্ধ্ব পথকে অবলম্বন ক'রে যতদিন না সে পুনরায় আপন পরিপূর্ণ সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। বিকাশের নীতি ও গতি যেমনই হোক না কেন, মানুষ সর্বদাই আছে দেবসত্তায় প্রতিষ্ঠিত, দেবত্বের বিকাশ তার মধ্যে চিরদিনই থাকে, কিন্তু মায়া বা অবিদ্যার জন্য সে সেই সত্তাকে বিস্মৃত হয় এবং এই বিস্মৃতির অভিশাপই তাকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে টেনে নিয়ে যায়। তবে একথাও আবার সত্য যে, পূর্ণতার উপলব্ধি একদিন না একদিন সে করেই, তবে অধ্যাত্মসাধনা ও আত্মসম্বিতের অনুশীলন হয়তো তার সচেতনতার ও পূর্ণপ্রকাশের পথকে সচল ও দ্রুততর করে। বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশ-ধারার মর্মকথাই তাই। পূর্বেই বলেছি যে, বিকাশের প্রতিটি স্তর অতিক্রম করার সময়ে জীবাত্মা অতীতের কোন-কিছুই নিজেরমধ্যে হারায় না। অতীতে সকল রকমের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সে তাই নিজের মধ্যে গ্রহণ করে ও তাদের রূপান্তর সাধন কয়ে নূতনরূপে, এবং

---

savage being, but he is still a man * * *. It is possible that rebirth in animal form is a figure of speech for rebirth with animal qualities." । দার্শনিক প্রিঙ্গল-প্যাটিসান ও তাঁর *Idea of God* গ্রন্থে অনুরূপ মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। সুফি-সম্প্রদায়ও অনুরূপ কথা স্বীকার করেন।

এই গ্রহণ ও রূপান্তর ঘটানোর মধ্য দিয়েই সে ছুটে চলে অবিশ্রান্ত গতিতে এবং সে গতি স্তব্ধ হয় পরিপূর্ণতারূপ দিব্যসত্তার স্তরে উপনীত হলে। মনুষ্যজাতিই সৃষ্টি ও বিকাশের চরমপরিণতি, কেননা বুদ্ধি ও বোধির চরম-উৎকর্ষ ও পূর্ণপ্রকাশ সাধিত হয় মানুষেরই মধ্যে। শ্রীঅরবিন্দ একথার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন:

"Man is there to move from the ignorance to the knowledge, and the large divine life which can compass by the unfolding out of the spirit in him, the knowledge of his real self and the leading of the spiritual life must be attained before he can *go definitely* and for ever otherwise."[১৫]

সুতরাং জন্মান্তর বা লোকান্তর-তত্ত্বের একটি সার্থকতা আছেই, কেননা এই লোকান্তরগতি মানুষকে অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতার পথে পরিচালিত করে ও পরিশেষে তার দিব্যজীবনসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। দিব্যজীবন লাভের অপর নাম লোকোত্তরে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা—যে প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষকে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ফিরে আসতে হয় না, বা মৃত্যুময় পৃথিবীতে পুনরাবর্তন করে না। শ্রীঅরবিন্দ যুক্তি ও বিচারনিষ্ঠ মন নিয়ে এই জন্মান্তর বা লোকান্তরতত্ত্বের যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা ও সমাধান করেছেন, বিশ্বের বিচারশীল মানুষের বিবেক-বুদ্ধিতে তা গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হবে!

১৫। *The Life Divine*, p. 679-680.

*

শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন

ডঃ রমেশ মজুমদার

শ্রীঅরবিন্দের জীবন মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম বাল্যজীবন ও বিলাতে শিক্ষা; দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ, তৃতীয় পণ্ডিচেরীতে আধ্যাত্মিক জীবন। তাঁহার জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১৮৭২ সনে ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ বিলাত ফেরৎ সরকারী ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার সাহেবিয়ানা সে যুগের তুলনায়ও অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি শিশু অরবিন্দকে বাংলায় কথাবার্ত্তা বলতে শেখান নি এবং আট বছর বয়সেই শিক্ষার্থে বিলাত নিয়ে যান। সেখানে অ্যাক্রয়েড্ পরিবারের সঙ্গে তাঁর এত ঘনিষ্ঠতা হয় যে পুত্রের নামের সঙ্গে ঐ নামটিও যোগ করেন। বিলাতে এবং ভারতে ফিরেও কিছুদিন অরবিন্দ শ্রীঅরবিন্দ অ্যাক্রয়েড (Acroyd) ঘোষ এই নামেই পরিচিত ছিলেন।

বিলাতে গিয়ে অরবিন্দ প্রথমে স্কুলে পরে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ও খুব কঠিন পরীক্ষা —Classical Trepos-প্রথম বিভাগে পাশ করেন। Oscar Browning নামে তাঁর একজন পরীক্ষক প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় তাঁর বিশেষ জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর ইংরেজী রচনা ও কবিতার বই এবং 'আনন্দমঠের' ইংরেজী অনুবাদ তাঁর ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতার পরিচয় দেয়।

সে যুগে আই, সি, এস (I.C.S.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদ লাভ করা ভারতীয় শিক্ষিত যুবক মাত্রেই ধরাধামে স্বর্গলাভ করার মতই মনে করতেন। পিতার ইচ্ছানুযায়ী শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে এই কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় একাদশ স্থান অধিকার করেন। এই উপলক্ষেই আমরা অরবিন্দের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শের প্রথম পরিচয় পাই। পিতার আদেশে এই পরীক্ষা দিলেও অরবিন্দ ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং তিনি যাতে এই চাকুরী না পান তার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। পরীক্ষার ফলে যাঁরা Civil Service পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য বিবেচিত হতেন তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হত এবং ঘোড়ায় চড়ার পারদর্শিতার প্রমাণ দিতে হত। অরবিন্দকে পুনঃ পুনঃ এই দুই পরীক্ষার জন্য ডাকা হল কিন্তু তিনি গেলেন না। এই অজুহাতে বিলাতে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট অরবিন্দকে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করলেন না।

অরবিন্দের জীবনে এটি একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলে মনে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ভবিষ্যৎ জীবনে অরবিন্দ যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচালক হয়েছিলেন এই ঘটনায় তার প্রথম আভাষ বা সূচনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ অরবিন্দের চরিত্রের এই দিকটা ইংরেজ সরকার জানতেন—এবং সেই জন্যই তাঁকে চাকুরী দেননি—এরূপ মনে করবার কারণ আছে।

বিলাতে ছাত্র অবস্থায়ই অরবিন্দের মনে গভীর দেশ প্রেমের সঞ্চার হয় এবং তিনি ভারতবর্ষ যাতে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল—Indian Majlis। এই সভার বিভিন্ন অধিবেশনে অরবিন্দ খুব তীব্র ভাষায় ভারতে বিদেশী

শাসনের নিন্দা করেন এবং খোলাখুলিভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আদর্শ প্রচার করেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যে এসব জানতেন এবং এ কারণে তাঁকে সিভিল সার্ভিসের উপযোগী মনে করতেন না—সরকারী কাগজপত্রে এর উল্লেখ আছে। ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা পাশ না করেও এর আগে কয়েকজন পরীক্ষার্থী সিভিল সার্ভিসে নির্বাচিত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে এবং এই পরীক্ষায় পাশ না করলেও যাতে অরবিন্দের ন্যায় মেধাবী ছাত্র সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন—কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজও গভর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এ সকলে কর্ণপাত করলেন না। ভারতীয় মজলিসে এরূপ উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করা ছাড়াও অরবিন্দের স্বাধীনতাপ্রীতির আর একটি প্রমাণ আছে। বিলাতে ছাত্র অবস্থাতেই তিনি Lotus and Dagger নামে একটি ভারতীয় ছাত্রদের গুপ্ত বিপ্লব সমিতিতে যোগ দেন। এই সমিতির প্রত্যেক সদস্যকেই এই মর্মে একটি শপথ নিতে হত যে তিনি সাধারণভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করবেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিজে বিশেষ কোন কাজে নিযুক্ত থাকবেন।

শৈশব কাল থেকে ইংরেজী আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও অরবিন্দের মনে এই গভীর স্বদেশ প্রীতি কি করে জাগল এটা বাস্তবিকই একটি সমস্যা। অনেকে মনে করেন যে অরবিন্দের পিতা দেশ থেকে ইংরেজী সংবাদপত্রে বেঙ্গলীতে ইংরেজের কুশাসন বিশেষতঃ ভারতীয়দের উপরে ইংরেজদের অত্যাচারের যে সমুদয় কাহিনী ও মন্তব্য ছাপা হত সেগুলি ঐ কাগজ থেকে কেটে ছেলের কাছে পাঠাতেন সেগুলি পড়েই অরবিন্দের মনে স্বদেশপ্রীতির সৃষ্টি হয়। একথাও উল্লেখযোগ্য যে অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু একজন বিশিষ্ট স্বাদেশিক ছিলেন এবং বাঙ্গালীর প্রাণে জাতীয় ভাব সঞ্চারের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ ও সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

অসম্ভব নয় যে এ দুয়েরই প্রভাব অরবিন্দের স্বদেশ প্রীতির অন্যতম কারণ। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর দাদা মনোমোহনের প্রাণে এরূপ কোন স্বদেশপ্রীতি জাগে নাই—এবং তিনি দু একখানি চিঠিতে স্পষ্ট এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন—যে দেশের স্বাধীনতা লাভ তো দূরের কথা তাদের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর কোন ভাবনা বা উদ্বেগ নাই।

এ বিষয়ে অরবিন্দের নিজের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি কেন সশস্ত্র বিপ্লব ও এই উদ্দেশ্যে গুপ্ত বিপ্লব সমিতি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য লিখেছেন যে তিনি ইউরোপের পরাধীন জাতিরা কি উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তার বিবরণ বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন; মধ্যযুগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের এবং আধুনিক যুগে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে ইতালী ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম এবং বিশেষ করে ফরাসী নেত্রী জোয়ান অফ আর্ক ও ইতালীর নায়ক ম্যাৎসিনির (Mazzini) বিপ্লব কাহিনী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

কারণ যাই হউক ১৮৯৩ সনের প্রথম ভাগে ইংলণ্ড থেকে ফিরবার আগেই যে অরবিন্দ ভারতের স্বাধীনতা ও বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অরবিন্দ ভারতে এসেই বরোদা কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং তের বছর এই পদে নিযুক্ত থাকলেও দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের কথা কখনও ভোলেন নি। এর দুটি বিশিষ্ট প্রমাণের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

দেশে ফিরবার পরেই ১৮৯৩-৯৪ সনে তিনি বম্বে শহর থেকে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' নামে এক সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সে সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই রাজনীতিক

আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই কংগ্রেসের আদর্শ, লক্ষ্য, কার্যপদ্ধতি, ও এর নেতাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। কংগ্রেসের আদর্শ ছিল শাসন সংস্কার এবং পরিণামে ইংরেজ উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বায়ত্তশাসন লাভ—অরবিন্দ লিখলেন যে আমরা চাই স্বাধীনতা—ইংরেজ শাসনের অনেক ত্রুটি গ্লানি আছে তা দূর করতে হবে—কিন্তু যদি এই শাসনে কোন গলদ নাও থাকত তবুও আমরা স্বাধীনতার দাবি করতাম—কারণ সুশাসনের চেয়ে স্বাধীনতাই আমাদের বিশেষভাবে কাম্য এবং এতে আমাদের জন্মগত অধিকার আছে। কংগ্রেসের একমাত্র কাজের পদ্ধতি ছিল বছরের শেষে তিনদিনব্যাপী এক সভায় মিলিত হয়ে আবেদন ও নিবেদন মূলক কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে গবর্ণমেণ্টকে জানান। অরবিন্দ এর তীব্র নিন্দা করে ঘোষণা করেন যে এরূপ আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে না—আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং যাতে ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় এমন কার্যপ্রণালী অবলম্বন করতে হবে। নেতাদের সম্বন্ধে অরবিন্দ বলেন, এঁদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের কোনও যোগাযোগ নেই এবং আরও পাঁচটা কাজের সঙ্গে অবসরমত দেশের কাজ করেন। কিন্তু আমরা চাই একনিষ্ঠ দেশসেবক নেতার দল—যারা দেশের জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলবার জন্যই আত্মোৎসর্গ করবেন।

এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের পরই রাজনীতিক মহলে এর বিরুদ্ধে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতাব চাপে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দকে নরম সুরে লিখতে অনুরোধ করতে বাধ্য হন। ফলে অরবিন্দ আর বেশী প্রবন্ধ লেখেন নি। কিন্তু New Lamps for the Old (পুরাণো দীপের বদলে নূতন দীপ) এই নামে যে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে এক নূতন যুগের সূচনা করেছিল তাতে

কোন সন্দেহ নেই।

অরবিন্দ কেবল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হন নি—যাতে কংগ্রেসে পুরাণো নেতাদের বদলে তিলকের নেতৃত্বে নূতন আদর্শে প্রণোদিত দেশ সেবকেরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করেন তার জন্যও চেষ্টা করেন। সংবাদপত্রে এইরূপ আলোচনা ও নূতন দল গঠন ছাড়াও অরবিন্দ এই সময় থেকেই গুপ্ত বিপ্লব সমিতি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। তিনি এই শতকের গোড়ায় বাংলায় আসেন এবং কয়েকটি বিপ্লব সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। অরবিন্দ নিজেই লিখেছেন যে আমার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করা, কিন্তু এই সব সমিতির কাজ দেখে মনে হল এখনও এই আয়োজনের সময় আসে নি। তাই তিনি ত্নই একটি বিপ্লব সমিতি প্রতিষ্ঠা করেই বরোদায় ফিরে গেলেন।

১৯০৫ সনে বঙ্গদেশকে ত্নভাগ করে ত্নটি প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাবে সমগ্র বাংলা দেশে এক বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শত শত সভা সমিতি থেকে এর প্রতিবাদ হয় এবং হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পাঠানো হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও যখন বাংলাদেশ ত্নভাগ করাই সাব্যস্ত হল তখন বাংলাদেশে যে ব্যাপক আন্দোলন হয় এর আগে সেরূপ কখনো হয়নি। যখন আবেদন নিবেদনে কোন ফল হল না তখন বাঙ্গালীরা স্থির করল বিলাতী জিনিষ বিশেষতঃ কাপড় বয়কট অর্থাৎ বর্জন এবং স্বদেশী জিনিষের ব্যবহার করে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রভুত আর্থিক ক্ষতি করতে হবে এবং তখন ইংরেজ আমাদের দাবী মানতে বাধ্য হবে। ক্রমে, ক্রমে এই উত্তেজনা এত বেড়ে গেল যে বঙ্গভঙ্গ রহিত করার দাবী স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হল।

অরবিন্দ বুঝলেন যে এইবার সময় হয়েছে। তিনি বরোদার কাজ ছেড়ে কলকাতায় এলেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে

বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করবার জন্য দলে দলে ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছেড়ে দিল এবং তাদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় জাতীয় কলেজ এবং তার অধীনে বিভিন্ন স্থানে জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। অরবিন্দ কলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরের জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বাংলায় ফিরে এসে এই স্বদেশী আন্দোলনে এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন।

স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি প্রচারের জন্য অরবিন্দ বাংলা দেশের নানা স্থানে ঘুরে অনেক বক্তৃতা করেন। এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা বার করেন এবং অরবিন্দ তাঁর সহযোগী হন। কয়েকমাস পরেই বিপিন পাল এই পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং অরবিন্দই এর সম্পাদকের কাজ করেন। ১৯০৬ সনে এই পত্রিকায় অরবিন্দ তাঁর নতুন কার্যপ্রণালী এবং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন সারা ভারতবর্ষে তা বিষম আলোড়নের সৃষ্টি করে। সরকারের নিকট আবেদন, নিবেদন না করে, তার সঙ্গে অসহযোগ (non co-operation) এই নীতি তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিলাতী দ্রব্য ও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন থেকে আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে সরকারী আদালত বর্জন, সর্বপ্রকারে শাসন যন্ত্রকে বিকল করা, এবং এমন কি সরকারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করারও প্রস্তাব তিনি করেন। ১৩।১৪ বছর পরে মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলন কার্যে পরিণত করেন তার মূল সূত্রগুলি অরবিন্দই প্রথম প্রচার করেন।

কংগ্রেসের রীতি ও আদর্শের এরূপ আমূল পরিবর্তন রাজনীতিক ক্ষেত্রে অরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে Moderate (নরম বা প্রাচীনপন্থী) ও Extremist (গরম বা চরমপন্থী) এই দুটি দল গড়ে উঠল। ১৯০৬ সনে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে চরম পন্থীদের চাপে এবং মডারেট দলের প্রবল

আপত্তি সত্ত্বেও স্বদেশী, বিলাতী বর্জন, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন এবং সর্বোপরি স্বরাজ অর্থাৎ স্বাধীনতাই যে আমাদের লক্ষ্য এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হল। এর পরে সারা বছর এই দুই দলের বিরোধ ও আন্দোলন চলল। মডারেট দল ১৯০৭ সনে সুরাটে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে পূর্বোক্ত চারিটি প্রস্তাব বাতিল করবার চেষ্টা করলেন, সুরাটের অধিবেশনে এই দলের সংখ্যাই ছিল বেশী। কিন্তু অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পরেই দুই দলের সদস্যদের মধ্যে হাঙ্গামা বেধে গেল এবং কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙ্গে গেল। অরবিন্দ নিজেই লিখেছেন যে তিনিই এই হাঙ্গামার মূলে ছিলেন। এর পরে বহুদিন পর্য্যন্ত মডারেট দল Extremist দলকে কংগ্রেসে ঢুকতে দেন নি কিন্তু জাতীয় জীবনে মডারেট দল ও তাদের পরিচালিত কংগ্রেসের প্রভাব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে বিপ্লবীদলের শক্তি ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া বেড়ে উঠল—অনেক রাজকর্মচারী নিহত ও আহত হল। কিন্তু শীঘ্রই গোয়েন্দা পুলিশ খবর পেল যে বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র মানিকতলায় মুরারিপুকুর বাগানে—এবং এখানেই বোমা তৈরী হয়। পুলিশ কি করে এর সন্ধান পেল সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। কিন্তু ১৯০৮ সালের ১লা-২রা মের রাত্রিতে পুলিশ ঐ বাগান ঘেরাও করে অনেক বিপ্লবীকে এবং অরবিন্দকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। এর ফলে আলিপুরের আদালতে অরবিন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীদে বিচার হয়। কয়েকজনের আন্দামানে নির্বাসন ও কয়েকজনের কারাদণ্ড হয় কিন্তু অরবিন্দ মুক্তি পান।

আলিপুরের এই বোমার মামলাই অরবিন্দের জীবনের প্রথম ও মধ্যমভাগের সন্ধিস্থল বলা যেতে পারে। এর পরেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন যাত্রা আরম্ভ হয় কিন্তু এই মামলায় কারারুদ্ধ অবস্থায়ই তাঁর এই নতুন জীবনের সূচনা হয়। এই মামলার সময়

আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলাম এবং কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে যে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা বলাই বাহুল্য। আমরা ছাত্রদের দল আদালতে যেতাম। সকলেই লক্ষ্য করেছে যে মামলার বিচারের অব্যবহিত পূর্বে যখন আসামীদের কাঠগড়ায় নিয়ে আসত তখন তারা বেপরোয়াভাবে কৌতুক ও গল্প করত কিন্তু অরবিন্দ নির্লিপ্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁর উদার দৃষ্টি আদালতের পরিবেশ থেকে বহুদূরে নিবদ্ধ থাকত এবং তিনি যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন—কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনাও যেন তাঁর মনে স্থান পেত না। অরবিন্দ বহুদিন প্রেসিডেন্সী জেলের একটি ছোট কক্ষে একলা আটক ছিলেন। এই সময়ে যে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয় এবং দিব্যদর্শন হয় একথা তিনি নিজেই বলেছেন। অল্পকয়েক বছর আগে আমি কলকাতার শেরিফ থাকাকালীন সরকারী কাজে একবার এই জেল দেখতে যেতে হয়। আমার অনুরোধে কারাধ্যক্ষ আমাকে এই কক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। দরজায় ঢুকবার সময় দেখি দুপাশে অনেক ফুল বিল্বপত্র পড়ে আছে। কারাধ্যক্ষের কাছে শুনলাম জেলের জমাদার ওয়ার্ডার প্রভৃতি রোজ সকালে এখানে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করে।

আলিপুরের আদালতে অরবিন্দের বিচারের সময় তাঁর পক্ষের ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস বিচারপতিকে সম্বোধন করে সর্বশেষে মন্তব্য করেছিলেন—"ভবিষ্যতে একদিন এই বিচারের কাহিনী বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবে যাবে—কিন্তু সেদিনও ভারতের জাতীয়তার ঋষিরূপে অরবিন্দের নাম ও খ্যাতি জগতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত লোকের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হবে।" চিত্তরঞ্জনের এই ভবিষ্যদবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯০৯ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভ করার কিছুদিন পরেই অরবিন্দ প্রথমে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন' ও পরে বাংলা 'ধর্ম'

নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কর্মযোগিনের প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন—'ইহা সাধারণ সংবাদপত্র নয়, জাতির অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ (more of a national review than a weekly newspaper) যে সকল ঘটনা জাতীয় জীবনের অগ্রগতিতে সহায়তা করে বা প্রতিবন্ধক হয় কেবল তাহাই ইহাতে আলোচিত হইবে।' মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারে যে দেশের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী হবে এবং এ সম্বন্ধে দেশবাসীর কর্তব্য কি এই সমুদয়ের এক সুচিন্তিত ও বিস্তৃত আলোচনা কর্মযোগিন পত্রিকায় "আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি" নামে প্রকাশিত হয়। তিনি গোপনে সংবাদ পেয়েছিলেন যে সরকার শীঘ্রই তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেবে। এই জন্যই ঐ "খোলা চিঠি"র উপসংহারে লেখেন: "যদি আমি নির্বাসিত হই এবং আর ফিরিয়া না আসি তবে দেশবাসী যেন ইহাকেই আমার শেষ রাজনৈতিক উইল বলিয়া গ্রহণ করে।" এই 'খোলা চিঠি'র জন্য গভর্ণমেণ্ট অরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করে। কিন্তু ইহার পূর্বেই অরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করেন। শ্রীঅরবিন্দের কলিকাতা ত্যাগের ঘটনা সম্বন্ধে অন্ততঃ চারিটি বিভিন্ন মত আছে। অরবিন্দ ঐ সময়ে তার মেসো সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে থাকতেন। কৃষ্ণকুমারের পুত্র শ্রীসুকুমার মিত্র লিখেছেন: '১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন পূর্বাহ্ণে শ্রীঅরবিন্দের সহিত 'কর্মযোগিনের' প্রুফ দেখিতেছিলাম এমন সময়ে তাঁহার অন্যতম কর্ম্মী রামচন্দ্র মজুমদার আসিয়া বলিলেন যে 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় লিখিত কোনও প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের মামলা হইবে বলিয়া তিনি সঠিক খবর পাইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়াও অরবিন্দ নির্বিকার ও সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। অন্যান্য দিনের ন্যায়ই আহারের পরে নিশ্চিন্ত চিত্তে শ্যামপুকুরে 'কর্মযোগিন' কার্যালয়ে গেলেন। রাত্রে আর ফেরেন নাই। পরে জানিতে

পারিয়াছি যে, সেই সন্ধ্যা রাত্রে নৌকায় যাত্রা করিয়া অরবিন্দ, বীরেন্দ্র ঘোষ ও সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রত্যূষে চন্দননগরে পৌঁছেন। অরবিন্দের সহকর্মী, মানিকতলা বোমার মামলায় অন্যতম আসামী শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের নিকট লোক পাঠাইয়া সাহায্য করিবার অনুরোধ জানাইলেন কিন্তু চারুচন্দ্র সম্মত হইলেন না। ইহা শুনিয়া অরবিন্দ নৌকায় বসিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীমতিলাল রায় শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া আগ্রহের সহিত অরবিন্দকে লইয়া সকলের অগোচরে তাঁহার কাঠের গুদামে তাঁহাকে স্থান দিলেন।

এই বিবরণ মোটামুটি সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে ৺মতিলাল রায় আমাকে নিজে তাঁর বাড়ীর উপরতলায় ছোট যে একটা কক্ষে অরবিন্দ লুকিয়ে থাকতেন তা দেখিয়েছিলেন। এ ঘরটির বড় ব্যবহার হোত না—কেউ বড় একটা ও ঘরে যেত না। একদিন মতিবাবুর স্ত্রী হঠাৎ ও ঘরে ঢুকে অরবিন্দকে দেখে চিৎকার করে ওঠেন, তখন মতিলাল বাবু স্ত্রীকে সব কথা বলেন। সুতরাং অসম্ভব নয় যে প্রথমে অরবিন্দকে কাঠের গুদামেই রাখা হয়েছিল—পরে ঐ ছোট ঘরটি পরিষ্কার করে গোপনে শ্রীঅরবিন্দকে ওখানে নিয়ে রেখেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা থেকে চন্দননগর গমন সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ১৩৫৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাসিক বসুমতীতে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। এ সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রমাণ আমি পাইয়াছি তাহা হইতে আমার নিজের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। ৺গিরিজা শঙ্কর রায়ের উক্তি যে 'শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগিন' অফিসের দেওয়াল টপকাইয়া পাশের বাড়ী দিয়া বাহির হইয়া যান' —ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। শ্রীঅরবিন্দের সহযাত্রী বলেন তাঁহারা সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়াছিলেন—ইহা অবিশ্বাস

করিবার কোন কারণ নাই। (প্রবাসী, ১৩৫২, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)।

২। অরবিন্দ যে ভগিনী নিবেদিতার নিকটই তাঁহার আসন্ন গ্রেপ্তারের কথা প্রথম শুনিয়াছিলেন, যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বাগবাজারের মঠে যাইয়া পরমহংসদেবের সহধর্মিনী শ্রীমাতা ঠাকুরাণীকে প্রণাম করেন এবং গনেন মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে বাগবাজার ঘাটে পৌঁছাইয়া দেন—এ-সমুদয় কথা সত্য নহে। শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগিন' কার্যালয় হইতে সোজা আহিরী-টোলার ঘাটে যাইয়া নৌকায় উঠিয়াছিলেন—তাঁহার সঙ্গে ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বীরেন্দ্র ঘোষ।

৩। পূর্বোক্ত রামচন্দ্র মজুমদার (যিনি প্রথমে গ্রেপ্তারের সংবাদ দেন) লিখিয়াছেন যে অরবিন্দ তাহাকে নিবেদিতার কাছে গ্রেপ্তারের সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন; নিবেদিতা শুনিয়া বলিলেন "আপনার মনিবকে আত্মগোপন করিতে বলুন।" শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন, "ঠিক আছে-ব্যবস্থা কর।"

শ্রীনলিনীগুপ্ত লিখেছেন যে অরবিন্দ নিজেই বলেছেন যে অফিস খানাতল্লাসী ও তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ শোনামাত্রই তিনি হঠাৎ 'আদেশ' পেলেন 'চন্দননগর চলে যাও'। তিনি কাজও করলেন সেই অনুসারে।

(প্রবাসী, ১৩৫২, ফাল্গুন)

চন্দননগর থেকে শ্রীঅরবিন্দ গোপনে পণ্ডিচেরী যান এবং তাঁর বিচিত্র জীবন নাট্যের তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়। তাঁর অধ্যাত্মজীবনের উন্নতি ও পরিণতি এখানেই হয়—এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেওয়ার শক্তি বা সাধ্য আমার নাই। তবে এই আধ্যাত্মিক জীবনেও যে তিনি দেশের মঙ্গল চিন্তা করতেন এবং দেশের রাজনীতিক ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন—এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি ঘটনার উল্লেখ করেই আমি শেষ করব।

১৯৪২ সনের মার্চ মাসে, কতকটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অপ্রত্যাশিত সাফল্য ও দ্রুতগতিতে ভারত অভিমুখে অগ্রসর হয়ে রেঙ্গুন অধিকার করায় এবং কতকটা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের চাপে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতে শান্তি স্থাপনের জন্য মন্ত্রী ক্রিপসকে (Sir Stafford Cripps) ভারতে পাঠান। ক্রিপস ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে যে সকল প্রস্তাব করেন, তাতে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যখন এই প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসে খুব আলোচনা চলছে এবং মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছেন, তখন শ্রীঅরবিন্দ একটি লোকের মারফৎ গোপনে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলেন—কারণ এতে ভবিষ্যতে ভারতের মঙ্গল হবে। কংগ্রেস তাঁর পরামর্শ গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছুকাল পরেই কে, এম, মুনসী শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন যে তিনিও কংগ্রেসের নেতারা সকলেই এখন স্বীকার করেন যে শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ গ্রহণ না করে কংগ্রেস মস্তবড় ভুল করেছে। শ্রীযুক্ত মুনসী শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই নীচে এসে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তকে এই কাহিনী বিবৃত করেন। আমি নিজে নলিনীবাবুর মুখে এ কথা শুনেছি।

শ্রীঅরবিন্দ শেষ জীবনে বড় একটা কারোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা আলোচনা করতেন না। অনেকে প্রশ্ন লিখে পাঠাত—তিনি পাশে উত্তর লিখে দিতেন। এরূপ অনেক প্রশ্ন ও উত্তর পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে বই আকারে ছাপা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের আট দশ বছর আগে নলিনীবাবু লিখে পাঠান যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাতে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতা না পেলে—এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অবসান হবে না। তিনি (অর্থাৎ অরবিন্দ) যোগবলে এই স্বাধীনতা যাতে তাড়াতাড়ি আসে তার ব্যবস্থা কেন করছেন না?

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—"স্বাধীনতা শীগগিরই আসছে তার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নাই—কিন্তু এই স্বাধীনতা পেলে আমাদের নেতারা কিরূপ ব্যবহার করেন সেইটাই আমার দুর্ভাবনা (worries me)।"

এই দুটি ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায় যে পণ্ডিচেরী আশ্রমের আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতেন এবং দেশের রাজনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।

যাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষ বলে মনে করেন—এই দুটি ঘটনায় তাঁরা নিজেদের বিশ্বাসের সমর্থন পাবেন।

এই প্রবন্ধের কিংয়দংশ কলিকাতা কেন্দ্রে ২৭-১০-৭১ তারিখে প্রদত্ত আমার বেতার ভাষণ হইতে গৃহীত। ইহার পুনঃপ্রকাশের অনুমতির জন্য আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অধ্যক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।

*

দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ[১]

ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(ক)

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে যে নতুন জীবনবোধের সূত্রপাত তারই পরিপূর্ণ রূপটি আমরা দেখতে পাই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনচিন্তায়। এই নতুন যুগের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁরা মনে করতেন ভারতীয় জীবন দর্শন তার শত সম্ভার সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মতোই একপেশে, যদিও একেবারে বিপরীতমুখী। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন এ-দুয়ের সমন্বয়। তাঁরা মনে করতেন সমস্ত ভারতীয় চিন্তার শেষ লক্ষ্য মোক্ষ নামক এমন এক পরম পুরুষার্থ যা নিতান্তই ব্যক্তিগত, যার সঙ্গে গোষ্ঠিজীবনের কোনও সম্পর্ক নেই, এবং শুধু তাই নয়, যার কাছে এমন কি ব্যক্তি-জীবনেরও দেহ প্রাণ এবং মনোজগতের কোন বালাই নেই, যা এ-সকলের ঊর্ধ্বে এক ধরণের তুরীয় উৎকর্ষ—নাম তার নিঃশ্রেয়স্, সোজা কথায় আধ্যাত্মিকতা। অপর পক্ষে, এরা মনে করতেন পাশ্চাত্ত্য চিন্তার মূল সূত্র হলো অভ্যুদয়, অর্থাৎ ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন, যে শ্রীবৃদ্ধি মুখ্যতঃ দেহ-প্রাণ ও-মনঃ-সর্বস্ব ব্যক্তিমানবের, এবং সমষ্টিজীবনের কল্যাণ যার কাছে কেবল পরম্পরাগত।[২]

১। অরবিন্দদর্শনের গভীরে প্রবেশ করতে হলে অনেকখানি পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন। সেই প্রস্তুতি পর্বে তাঁর চিন্তাধারার যেটুকু পরিচয় লাভ একান্ত আবশ্যক, এই প্রবন্ধে কেবল সেইটুকু পরিচয়ই দেওয়া হলো।

২। বলা বাহুল্য, তাঁদের এই ধারণা ত্রুটিপ্রবাদশূন্য ছিল না। ভারতের আসল চিন্তাধারা যে একপেশে ব্যক্তি-মোক্ষাভিমুখী নয় শ্রীঅরবিন্দ তো

সুসমঞ্জস সার্থক জীবনে এই দুই চিন্তাধারা পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে কিনা, তা নিয়ে নব্যভারতে সেদিন পর্যন্ত অনেক পরীক্ষা নীরিক্ষা হয়েছে। বড় বড় কবি সমাজসংস্কারক ধর্মসংঘস্থাপয়িতা ও রাজনীতিজ্ঞ নেতা এ-বিষয়ে অনেক কথা বলে গেছেন। কিন্তু বেশ অনেক দিন পর্যন্ত কেউই এ-বিষয় অবলম্বনে মৌলিক কোনও academic দর্শন গোড়ে তোলেন নি। এ-জাতীয় দর্শনের সূত্রপাত গত শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে। নব্যভারতীয় দর্শনের পুরো-ভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজনেরই নাম সমধিক উল্লেখ-যোগ্য—শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং আচার্য সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন। আচার্য কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন বহুতলগভীর অনুভব মহিমায় মহিমান্বিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণসম্ভারে সমৃদ্ধ। কিন্তু সে দর্শন ছিল মূলতঃ একলক্ষ্যাভিমুখী, ডাইনে-বাঁয়ে তার ব্যাপ্তি ছিল না। আচার্য সর্বেপল্লীর গ্রন্থরাজি অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, এবং তাঁর রচনাশৈলী নিঃসন্দেহে অতি অপূর্ব, কিন্তু এটাও ঠিক যে, তিনি কৃষ্ণচন্দ্র বা অরবিন্দের মতো অতটা গভীরে প্রবেশ করেন নি। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন উভয় দোষ মুক্ত। তাঁর দর্শন বহুতলগভীর, অথচ তা দশদিক্ পরিব্যাপ্ত, তাঁর লক্ষ্যবস্তু মূলতঃ এক হলেও তা বিশ্বের প্রতিটি খুঁটি-নাটিতে যথাধিকার পরিব্যাপ্ত ও আত্মপ্রকাশ, যথাপ্রয়োজন বিশ্লেষণ ও যুক্তিজাল বিস্তার তাঁর গ্রন্থরাজির ছত্রে ছত্রে স্বতঃউৎসারিত এবং সেই স্থিতধী প্রাজ্ঞের রচনাশৈলী ক্লাসিক-

---

সে-কথা নানাভাবে তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিপন্ন করেছেন। পাশ্চাত্য জগতেও গ্রীসীয় ও মধ্যযুগে দেহ-প্রাণ-ও-মনঃ-সর্বস্ব অভ্যুদয় মাত্র জীবনের লক্ষ্য বলে বিবেচিত হতো না এবং পরবর্তী যুগেও অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক সমষ্টিজীবনের কল্যাণকে ব্যক্তিজীবনের কল্যাণের মতোই মৌলিক মনে করেছেন, অনেকে আবার এমন কথাও বলেছেন যে সমষ্টিগত কল্যাণই মৌলিক এবং ব্যক্তিগত কল্যাণ পরম্পরালভ্য।

পর্যায়ভুক্ত—সংযত সুন্দর এবং সুমহান। নব্যভারতীয় দর্শনে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

তাঁর দর্শন আক্ষরিক অর্থে সামগ্রিক। এতে যথাযুক্ত মহিমা লাভ করেছে জড়জগৎ প্রাণ মন বুদ্ধি ও অধ্যাত্মজগৎ এবং ব্যক্তি ও সব রকমের গোষ্ঠিজীবন। তিনি দেখিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলীর স্বরূপই এমন যে, তার থেকে বুদ্ধি মন প্রাণ এবং ভূত জগতের বৈচিত্র্য নৈসর্গিক নিয়মেই আত্মলাভ করে, এবং বিপরীত ক্রমে ঐ একই নিয়মে ভূত জগৎ থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি থেকে অধ্যাত্ম স্তরে উত্তরণ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, প্রাকৃত মানুষের মনে আধ্যাত্মিক অতিমানসের স্পর্শমাত্রই বুদ্ধি মন প্রাণ দেহ এবং ভূত জগতের এমন এক দিব্যাবস্থা ঘটে যার ফলে জীবন আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে না, আপনা হতেই তা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, এবং পরিশেষে বৃহত্তম গোষ্ঠিকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। অতিমানসের স্ফুটস্পন্দন তখন সমগ্র জীবজগতে অনুভূত হয়।

(খ)

জড়জগৎ দেহ প্রাণ মনও বুদ্ধির সারভূত এই যে অতিমানস তারও যে নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে, যার নাম অধ্যাত্ম সত্তা, এক সহজ যুক্তির সাহায্যে তা প্রমাণ করা যায় যুক্তিটি এইরূপ :

যদিও সাধারণ জাগ্রৎ জীবনে মন ইন্দ্রিয়-মাধ্যমেই জ্ঞান আহরণ করে, তবুও, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান-আহরণ ব্যাপারে মনের ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ কার্যকারিতাও দেখা যায়—স্বাপ্নপ্রতীতি ও সুখদুঃখাদি মানসবৃত্তির প্রতীতিলাভে মন একাই কাজ করে, ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখে না। অনুরূপ ভাবে, বুদ্ধিও সচরাচর মন এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করলেও নিজের স্বতন্ত্র কার্যকারিতায় অন্য একপ্রকার জ্ঞানও লাভ করে।

গণিত ও তর্কচর্চা এবং যুক্তিজাল-বিস্তার ক্রমে অধ্যাত্মচর্চা শুদ্ধ-বুদ্ধিলব্ধ এই জাতীয় জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হয়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ এই জ্ঞানের নাম দিয়েছেন rational knowlege বা knowledge of apriorities। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে—বুদ্ধির স্বাভাবিক কাজ তো হলো ভূতজগৎ ও দেহাদি বিষয়েই সুসমঞ্জস্য জ্ঞান লাভ, অথচ গণিত বা তর্কশাস্ত্রে বুদ্ধি যে-বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হয় তা তো কেবল নিজেরই কার্যাবলী বা প্রকারাবলী (forms); এজাতীয় জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় কি কর্মকর্তৃবিরোধ ঘটে না? তা ছাড়া, বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যই হলো জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে নিজের প্রকারাবলীর সাহায্যে যুক্তিযুক্ত আকারে সাজান; সুতরাং বুদ্ধি যখন ঐ প্রকারগুলিই জানবার চেষ্টা করবে তখন তাদেরও কি ঐ-ভাবে সাজাতে হবে না? এতে চক্রক বা অনবস্থা দোষ পরিহার করা কি সম্ভব হবে?

আরও কথা, যে-বুদ্ধি স্বভাবই প্রাকৃত ভূতজগদাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত, তার পক্ষে অপ্রাকৃত অধ্যাত্ম জগতের পরিচয় লাভের সম্ভাবনা কোথায়? ভূত জগদাদির সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য অনেক সময় তাকে অপ্রত্যক্ষ অনেক বিষয় স্বীকার করতে হয়, এ-কথা ঠিক, কিন্তু সেগুলি সবই তো স্বীকৃত হয় প্রাকৃত জগতের অন্তর্ভূত রূপে। বুদ্ধির কাছে অপ্রাকৃত জগৎ স্বীকারের প্রয়োজন কোথায়?

অথচ এ-কথাও সর্বজনস্বীকৃত যে, যে-ভাবেই হোক বুদ্ধিস্তরে আমরা গণিত ও তর্কশাস্ত্রের অনেকখানি জ্ঞান লাভ করি, এবং অধ্যাত্ম জগতেরও পরোক্ষ পরিচয় বেশ কিছুটা পাই। অতএব স্বীকার না করে' গত্যন্তর নেই যে, এ জাতীয় জ্ঞান অন্য নিরপেক্ষ বুদ্ধির মাধ্যমে হয় না, এ-জাতীয় জ্ঞানে বুদ্ধিস্তরে তদূর্ধ্ব কোন স্তরের খেলা কোন ভাবে সংঘটিত হয়। এই খেলার অনুভূতিই অধ্যাত্মপ্রতীতি।

বুদ্ধি স্বপ্রকাশ নয়। এমন কথা বলা যাবে না যে, ভূতজগদাদির

পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বুদ্ধি নিজেরও সমগ্র স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে। এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা ভূতজগদাদির অনেক কিছু জেনেছেন অথচ গণিতবিদ বা তর্কশাস্ত্রবিদ নন। (অনেক বুদ্ধিমান পুরুষ তো অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞই থেকে যান।) ভূতপদার্থাদির পরিচয় লাভ কালে আমরা বুদ্ধির প্রকারাবলীর যে-রূপটি দেখতে পাই তা নিছক ব্যাবহারিক, তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠু ব্যবহার মাত্রে পর্যবসিত। তারাও যে তত্ত্ব এবং তাদের সম্বন্ধেও যে প্রকৃষ্ট থেকে প্রকৃষ্টতর জ্ঞান লাভ সম্ভব, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক এক ব্যাপার। এ-জাতীয় জ্ঞান আমরা পাই আধ্যাত্মিক প্রতীতিতে, যা বুদ্ধিরও ঊর্ধ্বে।

আধ্যাত্মিক প্রতীতি কিন্তু স্বপ্রকাশ। অধ্যাত্মপ্রতীতি লাভে তদূর্ধ্ব ভিন্নজাতীয় কোন প্রতীতির প্রয়োজন হয় না। অন্য সব প্রতীতিই এই আধ্যাত্মিক প্রতীতিসাপেক্ষ, অথচ আধ্যাত্মিক প্রতীতি কোন কিছুর অপেক্ষায় থাকে না। ভূতপদার্থাদির প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভে প্রয়োজন হয় বিচার-বিশ্লেষণ অনুমানাত্মক বুদ্ধিরূপ প্রতীতি ; বিচার-বিশ্লেষণ-অনুমানাত্মক বুদ্ধিপ্রতীতির প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভে প্রয়োজন হয় অধ্যাত্ম প্রতীতি ; অথচ আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলীর জ্ঞান লাভে আমরা তদুত্তর কোন প্রতীতির প্রয়োজন বোধ করি না। এখানেই আধ্যাত্মিক প্রতীতির নিজস্ব মহিমা। এরই নাম স্বপ্রকাশত্ব।

আধ্যাত্মিক প্রতীতি স্বপ্রকাশ। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, আধ্যাত্মিক প্রতীতি প্রথম থেকেই নিজের সমস্ত সম্ভার উজাড় করে দেবে। অধ্যাত্ম জগৎ বহুতল, ধাপে ধাপেই তার প্রকাশ। তার জন্য যা প্রয়োজন তা শুধু ক্রমবর্ধমান অভিনিবেশ, যার অপর নাম যোগ। জ্ঞান মাত্রেই অভিনিবেশসাপেক্ষ, অথচ এই অভিনিবেশ নিজে কিছু প্রকাশ করে না। সাক্ষাৎ ভাবে বিষয় প্রকাশিত হয় ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির কার্যকারিতায়, অভিনিবেশ সব ক্ষেত্রেই সহকারী-মাত্র।

অধ্যাত্মজ্ঞানও তদনুরূপ। অভিনিবেশ সেখানেও সহকারী-মাত্র, তত্ত্ব প্রকাশিত হয় অধ্যাত্মপ্রতীতিতে।

ক্রমবর্ধমান অভিনিবেশ সহকারিতায় অধ্যাত্মপ্রতীতি ধাপে ধাপে স্পষ্টতর হয়। নিম্নতম প্রাণ-মনঃ-স্তরেও অস্পষ্টপ্রকাশ অধ্যাত্মপ্রতীতির খেলা থাকে, যারই ফলে সেই সেই স্তরের জীব প্রতিটি বস্তুকে অপর অনেক বস্তু-সম্পৃক্ত বলে মনে করে, যারই ফলে নৈসর্গিক নিয়মে আদিম মানবহৃদয়েও জন্মলাভ করে জগৎ-ব্যাপারে এক অপার্থিব সামগ্রিক দৃষ্টি, ফুটে উঠে এক-জাতীয় অনাড়ম্বর সৌন্দর্যবোধ, এবং কর্মক্ষেত্রে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেও নির্দিষ্ট হয় ভালমন্দ নানাবিধ বিধিনিষেধ। ঊর্ধ্বতন বুদ্ধিস্তরে পরে যা ঘটে তা হলো এই আদিম সামগ্রিক প্রতীতির স্পষ্টতা লাভ। বিনা সামগ্রিক সম্বন্ধস্থাপনে বৌদ্ধিক জ্ঞানই হয় না। ভৌতিক জগৎ দেহ প্রাণ ও মনের সুসম্বদ্ধ জ্ঞান বর্জনে বুদ্ধির যে-প্রকারাবলী অপেক্ষিত হয় সেগুলি বস্তুত এই ভৌতিক জগৎ ও দেহাদির প্রতি প্রবৃত্ত অধ্যাত্মপ্রতীতিরই বিভিন্ন রূপ। খাঁটি অধ্যাত্মজ্ঞানে পূর্বতন বৌদ্ধিক প্রকারগুলি তাদের তাৎকালিক ব্যবহারিক রূপ পরিত্যাগ করে' স্বরূপে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে, প্রকাশ লাভ করে। খাঁটি অধ্যাত্মজগতেও অনেক ধাপ আছে, এবং প্রতিটি উচ্চতর ধাপে অধ্যাত্মপ্রকাশ প্রকৃষ্টতর। অপ্রকৃষ্ট প্রকাশের একমাত্র কারণ অভিনিবেশ-ন্যূনতা, যারই অপর নাম অন্তঃকরণের আপেক্ষিক বহির্মুখীনতা।[১]

১। খাঁটি অধ্যাত্মপ্রতীতি যে নিজের মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকবে এমন নিয়ম কিন্তু নেই। অন্তত শ্রীঅরবিন্দের মতে পুরাপুরি আত্মস্থতা বজায় রেখেও এই প্রতীতি নতুন ভাবে বহির্মুখী হতে পারে। অথবা, প্রতিটি উচ্চস্তরে এই প্রতীতি যতটা অন্তর্মুখী হয় ঠিক সেই পরিমাণে সংস্কারাদি-মুক্ত হয়ে বহির্মুখী হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের মতে সংস্কারাদি-বিনির্মুক্ত বহির্মুখীনতা অন্তর্মুখীনতারই পূর্ণতর রূপ।

(গ)

বুদ্ধি মানবমনেরই এক উচ্চস্তর ভূমি। এই ভূমির এক প্রান্তে যেমন আছে মন এবং মনের সঙ্গে সংস্পৃষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও ভৌতিক জগৎ, তেমনই অপর প্রান্তটি স্পর্শ করে আছে বিশুদ্ধ অধ্যাত্মজগৎ। আধা-আধ্যাত্মিক এই বুদ্ধির মাধ্যমেই অধ্যাত্মজগৎ নেমে আসে প্রকৃতি রাজ্যে। মন ইন্দ্রিয় প্রাণ ও ভূতজগৎ নিয়মশৃঙ্খলায় ধরা দেয়, চারিদিক সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠে। অধ্যাত্মজগৎ যে-মূর্তিতে বুদ্ধিকে স্পর্শ করে তাকেও বলা যায় অতিমানস, এবং ঐ সঙ্গমস্থলে বুদ্ধিও নিজে অল্পাধিক অতিমানস। বুদ্ধির এই আধা-অতিমানসিকতার নামই তার উর্ধ্বমুখীনতা। উর্ধ্বমুখীন বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে সত্য আহরণ করে' মনোরূপ নিজেরই কাছে সেগুলি জ্ঞানাকারে উপস্থাপিত করে।

মন ইন্দ্রিয় প্রাণ ও ভৌতিক জগৎ বুদ্ধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতারই অবতরণের বিভিন্ন ধাপ। ধাপগুলি, আবার, আগে থেকে থাকে না, এগুলি আধ্যাত্মিকতারই আধা-সুপ্ত ও সুপ্তাবস্থ বিভিন্ন পরিণামবিশেষ। যে নৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক জগৎ প্রকৃতি-রাজ্যের বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন নিয়মশৃঙ্খলা ও মূর্তি সৌন্দর্যে পরিণত হয়, সেই একই প্রক্রিয়ায় একই ঝোঁকে (এবং প্রলয়াতর সৃষ্টির বেলায় ব্যক্তি-জীব এবং সমষ্টি জীবের অদৃষ্টানুসারে) পরিবেশ-গুলিরও সৃষ্টি হয়, কেননা, নিয়মশৃঙ্খলা ও অল্পাধিক মূর্তিসৌন্দর্য বিবর্জিত আদিম পরিবেশ কল্পনাও করা যায় না। ফলশ্রুতি, প্রতিটি নিচের স্তরে উপরের সমস্ত তত্ত্বই সুপ্তভাবে বর্তমান।

বিপরীত মুখে বলা যায় যে, প্রতিটি উপরের স্তরে ঠিক নিচের তত্ত্বটি উর্ধ্বগতি বুদ্ধির আনুকূল্যে যথাযথ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। স্তরে স্তরে এই প্রকার আত্মপ্রকাশের নামই evolution বা উর্ধ্বমুখী বিবর্তন। যে-বুদ্ধির আনুকূল্যে এটা সাধিত হয় তা ব্যক্তি-বুদ্ধি হতে

পারে, সমষ্টি বুদ্ধিও হতে পারে। ব্যক্তিবুদ্ধির আনুকূল্যে কেবল তত্ত্বান্বেষী পুরুষের কাছেই এই বিবর্তন ধরা পড়ে। কিন্তু সমষ্টি বুদ্ধির আনুকূল্যে যে বিবর্তন সাধিত হয় তা সামগ্রিক বা নৈর্ব্যক্তিক। এই অখণ্ড সমষ্টিবুদ্ধিই নিত্যধ্যানরত দেবাদিদেব মহাদেব। সামগ্রিক জগতের উর্ধ্বমুখী বিবর্তন তাঁরই নিত্যধ্যানের ফল। বৃত্তিনিরোধ-রূপ ধ্যানসাধনে বিক্ষেপনিরসন মাধ্যমে চিত্তকে এমনভাবে একলক্ষ্যা-ভিমুখী করতে হয় যাতে উর্ধ্বতন তত্ত্ব আপনা হতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। দেবাদিদেব মহাদেবের বিশ্বজোড়া চিত্তের ক্রমবর্ধমান এক-লক্ষ্যাভিমুখিতাই সামগ্রিক জগতের বিবর্তনের কারণ। বৈজ্ঞানিকগণ এই বিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন, প্রাকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে কারণানুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রাকৃত দৃষ্টির অন্তরালে যে-বিশ্বজোড়া সাধন চলেছে তার সন্ধান তাঁরা রাখেন নি।

মোট কথা এই যে, কি ব্যক্তিক্ষেত্রে কি সমষ্টিক্ষেত্রে বুদ্ধির মানস অবস্থাতেই বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের স্পর্শ লাভ হয়। বুদ্ধিই, অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ মনই, প্রাকৃতিক মানুষ (natural man) ও অধ্যাত্মমানুষ (spiritual man)-এর সঙ্গমস্থল। শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা এখানেই নিজের পূর্ণ স্বরূপ বজায় রেখে অশুদ্ধ জগতের রূপ ধারণ করে। বুদ্ধির নিম্নতর কোন স্তরেই তার শুদ্ধত্ব আর আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে, নিচের স্তরগুলি আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত। সেই সব সুপ্তাবস্থায় আধ্যাত্মিকতা যথানুরূপ নিয়মশৃঙ্খলা ও মূর্তিসৌন্দর্যের আকারে নিজেকে আধা-প্রকাশ করে। বুদ্ধির প্রাকৃত কার্যকারিতায় আমরা এই আকারগুলি পরোক্ষভাবে যথাপ্রয়োজন ধরতে পারি। কিন্তু যদি কোনও শুভ মুহূর্তে সাত্ত্বিক বুদ্ধির কাছে তৎ-সংলগ্ন আধ্যাত্মিক জগৎ সাক্ষাৎভাবে ধরা দেয় অমনই এক দিব্যানুভূতির আবেগে আমরা দেখি মন ইন্দ্রিয় প্রাণ ও ভূতজগৎ অপরূপ অধ্যাত্ম আলোকে উদ্ভাসিত। সমস্ত সৃষ্টি-

প্রক্রিয়াটাই তখন যেন আমরা সরাসরি দেখতে পাই। কেবল দেখা কেন, এই শুভ লগ্নে আধ্যাত্মিকতার জোয়ারে আমাদের সব মনোভাবই —আমাদের আবেগ ইচ্ছা প্রযত্নও—অসীম উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই অবস্থাই হলো জ্ঞান রসানুভূতি এবং কর্তব্যনিষ্ঠার চরমোৎকর্ষ। এই মর্তলোক স্বল্পকালের জন্য হলেও স্বর্গে রূপান্তরিত হয়। একে স্থায়ীভাবে পাওয়াই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ, এবং তার জন্য প্রয়োজন সংযত জীবনে একাগ্র সাধনা। সাধনার রহস্য অতি গভীর। সমস্ত জিনিষটাই ব্যক্তিগত[১] প্রচেষ্টা, বড়জোর গুরুশিষ্য কেন্দ্রিক। স্থান কাল পাত্র ভেদে সাধনার নানা বৈচিত্র্য আছে। শ্রীঅরবিন্দের নিজের সাধনা ছিল প্রাচীন আর্যঋষিদের পন্থানুযায়ী। এই সাধনার ফলে তিনি অধ্যাত্মজগতের যে-পরিচয় লাভ করেছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে অতিবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন বলে তিনি ঐ-সব গ্রন্থে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে সর্বক্ষণই নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অপর মনীষীদের অভিজ্ঞতার তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন।

বুদ্ধিস্তরে সাক্ষাৎ-অনুভূতিলব্ধ অধ্যাত্মতত্ত্ব যে-রূপে নিজেকে ধরা দেয় তারই নাম তিনি দিয়েছেন অতিমানস। বুদ্ধিস্তরে অতিমানসের এই স্বর্গলাভেরই নামান্তর হলো মনোরাজ্যে অতি-মানসের অবতরণ। বুদ্ধির প্রয়োগে যখনই আমরা কোন সমস্যার সমাধানে উপনীত হই তখন এটাও সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করি যে, বেশ কিছু দূর পর্যন্ত বুদ্ধির খেলা চললেও চরমসীমায় সমাধানটি আপনা হতে নেমেও আসে। উত্তরণ ও অবতরণ এই ভাবে চরমে একবিন্দুস্পর্শী

১। দেবাদিদেব মহাদেবের সাধনাও একভাবে ব্যক্তিগত। অনন্ত-সংখ্যক-ব্যক্তিব্যাপক হলেও তিনি নিজেও একব্যক্তি—মহা ব্যক্তি।

হয়। অতিমানসও ঠিক এইভাবে স্বর্গরাজ্য থেকে মর্ত্যলোকে নামে। এরই অপর নাম পরম তত্ত্বের অনুগ্রহশক্তি (grace)।

ব্যক্তিগত জীবনে সাধক আধ্যাত্মিকতার প্রকৃষ্ট স্পর্শে দিব্যজীবন লাভ করে। সমষ্টিগত বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায় যে, অতিমানসের অবতরণের ফলে বুদ্ধি-অভিমানী মানুষের জাতিগত রূপান্তর ঘটবে, জাতিগতভাবে মানুষ তখন সমগ্র জগৎকে দেখবে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, জগৎ তখন তার কাছে হবে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। কিন্তু, কি ব্যক্তিদৃষ্টিতে কি সমষ্টিদৃষ্টিতে, এই দিব্যজীবন কখনই প্রাকৃত জীবনকে বাদ দিয়ে অচ্ছুৎমার্গী হয় না। অধ্যাত্ম আলোকে উদ্ভাসিত দিব্যসুষমান্বিত ও ধর্মপ্রসাদপুষ্ট আভূতবুদ্ধি পর্যন্ত প্রাকৃত জীবনই নবরূপ লাভান্তে দিব্যজীবনে পরিণত হবে, সমগ্র মানবগোষ্ঠি লাভ করবে তার চির-আকাঙ্খিত পূর্ণতা।

(ঘ)

অতিমানসের পিছনে আছে শেষ তত্ত্ব ব্রহ্ম ও তাঁর চিতিশক্তি।[১] ব্রহ্ম হলেন সৎস্বরূপ। চিতিশক্তি তাঁরই সৃজনীশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন নন। সন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম যে-বিশিষ্টরূপে আত্মলাভ করেন তারই চরম বীজাবস্থার নাম শুদ্ধশক্তি, মহাশক্তি; ব্রহ্মের অজাতপ্রকার এই চিৎ শক্তি ব্রহ্মসন্নদ্ধ হয়েই স্তরে স্তরে তত্ত্বান্তরত্ব লাভ করেন। শক্তিসাহচর্যে সৃজনোন্মুখ ব্রহ্মই হলেন চরমতত্ত্ব। সৃষ্টিকালীন সৃষ্টিকর্তা রূপে তিনিই ঈশ্বর। প্রাকৃত মানুষ শক্তি-সমন্বিত এই ব্রহ্মেরই তত্ত্বান্তর পরিণাম, তাঁর সৃষ্টি। ব্রহ্ম থাকেন অপরিবর্ত, পরিবর্তন হয় ব্রহ্মসন্নদ্ধ শক্তির। অবতরণের মুখে

---

[১] ক্ষুদ্রায়তন এই কটি অনুচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মদর্শন অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

চিতিরূপ শক্তি নিজ স্বরূপটি ক্রমশঃই অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত করে ফেলেন এবং আপাত-অচেতন ভূতজগতে এই আবরণ যেন পূর্ণ তিরোধানের পর্যায়ে এসে পড়ে। এই আবরণ বা তিরোধানশক্তিরই অপর নাম মায়া। শঙ্করপন্থীদের ন্যায় মায়াকে তিনি মিথ্যাস্বরূপিনী বলেন নি। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তিবিশেষ—তিরোধানশক্তি। এই তিরোধানশক্তি রূপেই পরমাশক্তি তত্ত্বান্তরত্ব লাভ করেন, যার নাম সৃষ্টি। এ-জগৎ যে নিছক মিথ্যা নয় অপলায়নপরমনোবৃত্তিক শ্রীঅরবিন্দের কাছে তা স্বতঃস্ফূর্ত। তবুও তিনি অন্যান্য শঙ্কর-বিরোধীদের মতো অনেক যুক্তিরও অবতারণা করেছেন।

তাঁর মতে এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার মিলন। প্রতীচ্য প্রাকৃতমানুষ ও জগৎকে দুহাতে সরিয়ে দেয়নি। প্রতীচ্যের চিন্তা-নায়কেরা প্রাকৃতমানুষের কল্যাণেই নানাভাবে জগতের পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে এর জন্য অধ্যাত্মজগতের প্রয়োজন থাকে ভালই, না-থাকলেও ক্ষতি নেই। শ্রীঅরবিন্দ দেখাতে চেয়েছেন যে, পরম ঐহিক কল্যাণের জন্যই—ব্যক্তিমানব এবং সমষ্টি-মানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্যই—আধ্যাত্মিক অতিমানসের অবতরণ একান্ত প্রয়োজন, এবং এই অবতরণের সৌকর্যার্থেই তিনি চেয়েছেন সাধনা, যে সাধনা তাঁর মতো মহাসাধকের পক্ষে প্রথম থেকেই নিছক অধ্যাত্মমুখী হলেও সর্বসাধারণের কাছে তা প্রথম থেকেই হবে সর্বাঙ্গীন—এমন এক সাধনপন্থা যার সুরু থেকেই সাধককে প্রাণ মন পরিবেশ সমাজ রাষ্ট্র, এমন কি, বৃহত্তর মানব গোষ্ঠির উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হতে হবে।[১] ঊনবিংশ শতকের দিক্‌পালেরা ভারতের, তথা সমগ্র বিশ্বের, কল্যাণবিধায় যে মহাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ যেন তাতে পূর্ণাহুতি দিলেন।

---

[১] পণ্ডিচেরি আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ এই সাধনারই প্রবর্তন করেছেন।

অরবিন্দ দর্শনে চরম তত্ত্ব হলেন শক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিজে সৎস্বরূপ, শক্তি মূলতঃ চিৎস্বরূপা। উভয়ের সম্মিলনে হয় সৃষ্টি। সৃষ্টিতেই আনন্দ। শক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম এই আনন্দস্বরূপের আকর। ব্রহ্মসন্নদ্ধ সৃষ্টিব্রতী শক্তিই আদি আনন্দ। এইজন্যই শ্রীঅরবিন্দ পরমতত্ত্বের আখ্যা দিয়েছেন সচ্চিদানন্দ। ব্যক্তিমানব এবং জগৎ এই সচ্চিদানন্দেরই পরিণাম, অতএব তা থেকে অভিন্ন। উপনিষদ-গীতা-বেদ-বেদাঙ্গ-তন্ত্র-পুরাণ-মন্থক শ্রীঅরবিন্দের মতে এই হল খাঁটি ভারতীয় অদ্বৈত দর্শন। প্রতীচ্যের অনেক মনীষীও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। প্রাচ্যেই হোক প্রতীচ্যেই হোক, যাঁরা তা করেন নি তাঁরা, কি ব্যক্তিমানব কি সমষ্টি মানব, কারুরই কল্যাণের প্রকৃত হদিশ দেন নি।

*

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক তত্ত্ব

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

প্রথম পরিচয়ে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনা সুরু হতে পারে। প্রথমত বলা যেতে পারে, তাঁর ভাষা গুরুভার এবং দুর্বোধ্য। তার কারণ দুটি: প্রথম, বিষয় একান্ত জটিল এবং দ্বিতীয়, তাঁর রচনারীতি ক্লাসিকালধর্মী। এ বিষয় বোধ হয় তাঁর সঙ্গে হেগেল-এর তুলনা চলতে পারে।

দ্বিতীয়ত যা চোখে পড়ে তা হল তাঁর প্রতিপাদিত দর্শনের অত্যন্ত বেশী কল্পনা-নির্ভরতা (Speculative)। এ কথা স্বীকার্য যে দর্শন ঠিক বিজ্ঞানের পথে চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত তত্ত্বকে ভিত্তি করে চলে না। তার বিষয় এমন জটিল যে তাকে কল্পনার (Speculation) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সকল দর্শনই অল্পবিস্তর কল্পনাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তবে দেখা যায় শ্রীঅরবিন্দের দর্শন অত্যন্ত বেশী-কল্পনা আশ্রিত। সেটা বোধ হয় ঘটেছে তিনি একাধারে মনীষী ও কবি ছিলেন বলে।

তৃতীয়ত লক্ষ্য করবার এই যে তিনি জড়কে স্বীকার করেন, কিন্তু জড়বাদকে আদৌ গ্রহণ করেন নি। তিনি এক বিকাশধর্মী বিশ্বে বিশ্বাসী; তিনি বিশ্বের মধ্যে একটি ঐষী ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং তাঁর দর্শনকে ইচ্ছাতত্ত্ব নির্ভর (Voluntaristic) বলা যায়। এবিষয় তাঁর দর্শন খানিক পরিমাণে 'বের্গসঁ-এর দর্শনের সহিত তুলনীয়। অতিরিক্তভাবে তিনি বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টির

মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়া করছে। সুতরাং তাঁর দর্শনকে সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্যভিত্তিক ও (Telefinalistic) বলা যেতে পারে। এ বিষয় তাঁর দর্শনের সহিত রবীন্দ্র নাথের দর্শনের এবং ডু-নুই-এর (Du Nouy) দর্শনের তুলনা চলতে পারে। উভয়েই ক্রমবিকাশের মধ্যে এক উন্নত আদর্শে উজ্জীবিত মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা দেখেছেন। শ্রীঅরবিন্দও আরও জটিল পথে এক দিব্য মানব জাতির বিকাশের সম্ভাবনা দেখেছেন।

সবার শেষে বলা যায় যে ভারতীয় দর্শনে তাঁর দার্শনিক চিন্তা এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেছে। ভারতে অতি প্রাচীন কালে উপনিষদের যুগে এবং বুদ্ধের যুগে দার্শনিক চিন্তায় সম্পূর্ণ স্বাধীনচিন্তার পথ উন্মুক্ত ছিল। ষড় দর্শনের যুগে সূত্রাকারে বিভিন্ন দার্শনিক মতগুলি গ্রথিত হবার পর থেকে যেন স্বাধীন চিন্তার পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দার্শনিক হতে হলে মানুষকে একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে হত এবং যে গোষ্ঠীর মত সে গ্রহণ করত তাকেই সমর্থন করে যেতে হত। অনন্য সাধারণ মনীষার ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটতে পারত, যেমন শঙ্করাচার্যের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তিনি ব্রহ্মসূত্রের ওপর নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা আরোপ করে এক নূতন দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করেছিলেন। তাকেই আমরা বলি অদ্বৈতবাদ। কিন্তু তা ব্যতিক্রমই। দীর্ঘকাল পরে শ্রীঅরবিন্দই স্বাধীন পথে চিন্তা ও সাধনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ নিজস্ব দর্শন স্থাপন করে এই গতানুগতিকতার উপর ছেদ টেনেছেন। এইখানেই তাঁর দর্শনের বিশেষ সার্থকতা।

(২)

বর্তমানে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের একটি সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া। বিষয়টি বড় জটিল; তাই তাকে সহজগ্রাহ্য রূপে স্থাপন করবার চেষ্টা হবে। আমরা এখনই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের

সঙ্গে হেগেল-এর দর্শনের তুলনা করেছি। এই তুলনার পথে এগিয়ে গেলে আমার ধারণায় অরবিন্দ দর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করা তুলনায় সহজ হবে। তার কারণ, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর এবং মৌলিক ধারণার মধ্যে খানিকটা মিল পাওয়া যায়। হেগেল-এর পরিকল্পনায় বিশ্বসত্তার দুটি পর্যায়ে প্রকাশ। একটি অবস্থায় তিনি স্থান কালাতীতভাবে আপনাতে আপনি বিরাজমান ; সেখানে তিনি সৎ এবং চিৎশক্তিসম্পন্ন (Absolute-in-itself)। আর একটি অবস্থায় তিনি জড়প্রকৃতির সন্তান মানুষের মনের মধ্যে দার্শনিক জ্ঞান রূপে বিধৃত হয়ে নিজেকে নিজে চিন্তা করেন। তখন তিনি নিজের ধারণার জন্যই মানুষের মনে পূর্ণ এবং অখণ্ড দার্শনিক জ্ঞানরূপে বিভাসিত হন ; তিনি নিজেকে নিজের ধারণার জন্য স্থাপন করেন (Absolute-for-itself)। সেই জন্য তিনি স্থাণু অবস্থায় (Static) যে কেবল সৎ (Being) ছিলেন তা হতে স্থানকালাশ্রয়ী পরিবর্তনশীল সত্তায় (Becoming) পরিণত হন। তারপর প্রকৃতি ও মানব মনের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকেই নিজের চেতনায় ধারণ করেন। আমরা অরবিন্দ দর্শনের সহিত পরিচিত হলে দেখতে পাব যে এই তত্ত্বগুলির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মৌলিক তত্ত্বগুলির মিল আছে। স্থাণু সত্তা (Being) এবং পরিবর্তনশীল সত্তা (Becoming)—এই দুটি পরিভাষা শ্রীঅরবিন্দও গ্রহণ করেছেন। (১) অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা আরও জটিল এবং আরও অনেক নূতন কথা বলেছে। তবু তুলনার মধ্য দিয়ে গেলে তাকে সহজে গ্রহণ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের দুটি মূল তত্ত্ব আছে। তাদের একটি হল মূল সত্তার স্বরূপে অবস্থিত অবস্থা। তা স্থান কালাতীত এবং স্থাণু ; তা যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের নাগালের বাহিরে (Unknowable)। তাকে তিনি সচ্চিদানন্দরূপ বলেছেন। এইরূপে তিনি সৎ অর্থাৎ

আছেন, চিৎ শক্তি বিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। এই তৃতীয় শব্দটির একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে যার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একপক্ষে বলা যায় শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা ভারতীয় চিন্তার ধারক। তাঁর দর্শন মূলত বেদ ও প্রাচীন উপনিষদের বচনে নির্ভরশীল; কিন্তু ষড় দর্শন হতে এবং স্মৃতিশাস্ত্র হতেও তিনি তত্ত্বকণা গ্রহণ করেছেন। তাই দেখি তাঁর দর্শনে মায়া, প্রকৃতি, পুরুষ, শক্তি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সচ্চিদানন্দ নাম করণ তাঁর যেমন নিজস্ব তত্ত্বের পরিচয় দেয় তেমন তাঁর এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় দেয়। সচ্চিদানন্দ শব্দটি প্রাচীন উপনিষদে নেই। তবে মূল সত্তাকে বর্ণনা করতে সেখানে যে কথাগুলির প্রয়োগ হয়েছে তাতে তার স্বীকৃতি আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'; আরোও আছে 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'[১]। এই দুটি বচনের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ তত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে ব্রহ্ম সম্পর্কে এবং ভক্তিবাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ স্বরূপে অবস্থিত মূল সত্তাকে সূচিত করতে তাকে ব্যবহার করেছেন। এই সচ্চিদানন্দ রূপক তিনি সৎ (Being) বলেছেন। তা নিত্য, সনাতন এবং স্থান-কালের অতীত।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি হল এই মূল স্থাণুসত্তার বিকাশধর্মী রূপ। একে তিনি বিকাশপরায়ণ সত্তা বলেছেন (Becoming)। সে অবস্থায় তা স্থান ও কালে বিধৃত এবং গতিশীল সত্তা; তা একটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে বিকশিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, যিনি ছিলেন স্থাণু তিনিই

---

1. We have, therefore, two fundamental facts of pure existence, a fact of Being and a fact of Becoming. Life Divine, Bk. I, Chap. VII.

তাঁর জ্ঞান ও বল শক্তির যোগে (Conscious Force) এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশ্বে পরিণত হলেন। বিশ্বের এই বিকাশেরও দুটি স্তর আছে। একটিতে পাই জড় বিশ্ব; তাকে অবলম্বন করে প্রাণের বিকাশ এবং পরে মানব মনের বিকাশ। জড় প্রকৃতিতেই স্বরূপে অবস্থিত সত্তার আরোহণ (Descent) সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তার পরেই বিকাশের পথে আরোহণের (Ascent) সূত্রপাত হয়। প্রথম স্তরে যে আরোহণ ঘটে তা সংঘটিত হয় প্রাণশক্তি ও মানব মনের বিকাশের মধ্য দিয়ে। এই পর্য্যন্ত আমরা সাধারণত অবহিত।

কিন্তু সেখানেই বিকাশের পথে আরোহণের সমাপ্তি ঘটে না। দ্বিতীয় স্তরে তা আরও এগিয়ে চলে। মানুষের মন যুক্তির পথে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের (Analysis and Synthesis) মধ্যে পূর্ণতর জ্ঞানে এগিয়ে চলে; কিন্তু সে জ্ঞান অসম্পূর্ণ জ্ঞান। মানুষকে পূর্ণতর জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে ভিন্ন পথে; স্বতঃলব্ধ জ্ঞানই (Intuitions) হবে অবলম্বন। এই পথে উন্নততর জ্ঞানশক্তির বিকাশের ফলে তা এমন এক অবস্থায় উন্নীত হয় সেখানে মূল সত্তা নেমে এসে তার সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। ফলে তা পরিপূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের (Integral knowledge) অধিকারী হয় এবং মানব চরিত্রের রূপান্তর (Transformation) ঘটে। মানুষ তখন স্বতঃজ্ঞানের অধিকারী (Gnostic Being) হয়। এই হল আরোহণের চূড়ান্ত অবস্থা এবং বিকাশের পরিণতি।

প্রশ্ন ওঠে যিনি স্থাণু স্থান-কালের অতীত হয়ে সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজ করছিলেন তিনি কেন জড় প্রকৃতির রূপে পরিবর্তিত হবেন; আবার কেনই বা আরোহণের পথে মানুষের মনের মধ্য দিয়ে এক রকম স্বরূপে ফিরে যাবেন? বলা হয়েছে বিকাশের শেষ সীমায় মানুষ যখন স্বতঃজ্ঞানের অধিকার পাবে তখন ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ব (Personality) থাকবে না; সচ্চিদানন্দের আবির্ভাবের বিশেষ

কেন্দ্ররূপেই সে কাজ করবে। এই আরোহণ এবং জটিল পথে আরোহণের প্রয়োজন কি? শ্রীঅরবিন্দ বলেন কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন নেই এবং থাকতে পারে না। এটা মূল সত্তার লীলা বা খেলা। এ যেন এমন খেলা যেখানে তিনি নিজেই খেলোয়াড়, নিজেই খেলার মাঠ এবং নিজেই খেলা।[২] এ যেন কোন শিশু কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে নয়, খেলার উদ্দেশ্যেই একটি মই দিয়ে নীচে দেখে আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। নামাটা যত তাড়াতাড়ি হয়, এটা ততটা নয়। কারণ, দ্বিতীয় অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে। শ্রীঅরবিন্দের ধারণায় মূল সত্তার অবতরণ ও অনুরূপভাবে তুলনায় সহজ, কিন্তু আরোহণ তত সহজ নয়, কারণ জড় প্রকৃতি তাকে নীচে টানে।

এখন অবরোহণ কি ভাবে ঘটে তার শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। মূল সত্তার যে শক্তি তাকে জড় বিশ্বে পরিণত করে তিনি তাকে জ্ঞান সমন্বিত শক্তি (Conscious Force) বলেছেন। এখানে যা সত্য তাই সৃজনধর্মী হয়ে পড়ে এবং যা সৃষ্টি হয় তাও সত্য। অর্থাৎ জড় সত্তা বা প্রকৃতি ও বিশ্ব সত্তার আর এক রূপ। চলমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বে যা পাই তাও একটি জ্ঞান শক্তি-সম্পন্ন' সত্তা।[৩] এই তত্ত্বটি ঋগবেদের মত-সত্য বা মত-চিৎ তত্ত্বের সমস্থানীয়। মনবেদের ধারণায় যা চিৎ-

---

2. Creating and recreating Himself for the sheer bliss of self-creation, of that self-representation—Himself the play, Himself the player, Himself the playground. Life Divine, Bk. I, Chap. XII.

3. It is conscious Reality throwing itself into mutable forms of its own imperishable and immutable Substance.

Life Divine, Bk. I, Chap. XIII.

শক্তি তা যুগপৎ বলশক্তিও বটে। যে শক্তি বিশ্বকে সৃষ্টি করেন তিনি একাধারে জ্ঞান ও বটে বল ও (Force) বটেন। তাঁর মধ্যে জ্ঞান ও বলক্রিয়া স্বাভাবিক। সুতরাং সচ্চিদানন্দের চিৎ শক্তি বলশক্তিও বটে এবং জ্ঞানসমন্বিত বলশক্তিরূপে তিনিই নিজেকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশ্বরূপে পরিবর্তিত করেছেন। মন বেদের মত-চিৎ পরিকল্পনাই যে এ বিষয় তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে তিনি তা স্বীকার করেন।[8]

(৩)

এরপর বিকাশের পথে আরোহণ পর্ব সুরু হয়। আরোহণের প্রথম অবস্থায় তিনটি স্তর আছে। প্রথম জড় প্রকৃতি, তারপর পাই তাকে অবলম্বন করে প্রাণশক্তির বিকাশ, তারপর পাই ক্রমবিকাশের শেষ সীমায় মানব জাতির উৎপত্তি। জড় প্রকৃতির মধ্যে চিৎ-শক্তি সুপ্ত অবস্থায় (Inconscient) থাকে। সাধারণ প্রাণীর ক্ষেত্রে চিৎশক্তি জাগ্রত (Vital awareness) হয়; কিন্তু সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বিশেষ ক্রিয়াশীল থাকে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানের মধ্যে জীবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। তারপর আসে মানুষ। মানুষের মধ্যে অতিরিক্তভাবে ধীশক্তি ক্রিয়াশীল হয়। ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অতিক্রম করে সে অনুমানের সাহায্যে পরোক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু মানুষের মনের জ্ঞানশক্তিও সীমাবদ্ধ। তা নিজেকে জানে,

---

4. I take the phrase from the Rig Veda ঋত-চিৎ which means the consciousness of essential truth of being (সত্যম্) ordered truth of active being (ঋতম্) and the vast self-awareness (বৃহৎ).

Life Divine, Bk, I, Chap. XIII, foot note

পরিবেশকে জানে। তা অভিজ্ঞতা হতে তথ্যকে বিশ্লেষণ করে সংগ্রহ করে এবং সেই সংগৃহীত তথ্যগুলি জুড়ে জুড়ে ব্যাপক আনুমানিক জ্ঞান সঞ্চয় করবার ক্ষমতা রাখে। তবু তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সমগ্র সত্তার জ্ঞান সম্ভব হতে হলে তার চাই সামগ্রিক অখণ্ড জ্ঞান। (Integral knowledge) এবং এই অখণ্ড জ্ঞান সম্ভব যুক্তি মার্গে নয় স্বতঃ জ্ঞানের (Intuition) এর মার্গে। এই স্বতঃজ্ঞানের এমন শক্তি আছে যে বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ করতে পারে। তাঁর মতে এই অখণ্ড জ্ঞানলাভের (Integral knowledge) প্রকৃষ্ট পথ হল এই বিচার অতিক্রামী স্বতঃজ্ঞান। মানুষের সার্থকতা এইখানে যে তার মধ্যে এই সামগ্রিক জ্ঞানের আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে।[৫]

শ্রীঅরবিন্দ এই সামগ্রিক জ্ঞানের (Integral knowledge) একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ধারণায় মূল স্বরূপে অবস্থিত সত্তা যাকে তিনি সচ্চিদানন্দ বলেছেন তার মধ্যে এই সামগ্রিক জ্ঞান বা অখণ্ড-জ্ঞান বিধৃত। বিশ্বের সম্বন্ধে সকল সম্ভাব্য জ্ঞানই তার মধ্যে যুগপৎ স্থান পেয়েছে। সুতরাং সে জ্ঞানের বাস্তবে অবস্থিতি আছে। তাকে মানুষের সঞ্চয় করতে হবে না, তাকে আবিষ্কার করতে হবে মূল সত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন কর।[৬]

---

5. That integral emergence is the goal of evolving Nature.

Life Divine, Bk. II, Part 2, Chap. XII.

6. The integeral knowledge is something that is already there in the integral Reality ; it is not a new or still non-existent thing that has to be created, acquired, learned, invented or built up by the mind ; it must be rather discovered or uncovered.

Life Divine, Bk. II, Part 2, Chap. XV.

সুতরাং মানবমনের মধ্যেই অখণ্ডজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটাতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের ধারণায় তা সংঘটিত হতে পারে কতকগুলি বিভিন্নস্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে অখণ্ডজ্ঞানের সহিত সংযোগ স্থাপন করে। এ যেন মই দিয়ে ধাপে ধাপে ওপরে ওঠা। মানুষ নিজ সাধনার বলে ধাপে ধাপে উঠে যেতে পারে; কিন্তু নিজের চেষ্টায় গন্তব্য স্থানের দরজা অবধি যেন সে পৌঁছাতে পারে। তারপর প্রয়োজন উপরের শক্তির সাহায্যের। আর নেমে এসে মানুষকে উপরে তুলে নিতে হবে। এ যেন কোন উচ্চস্থানে ওঠবার পথে সিঁড়ি দিয়ে শেষ ধাপ পর্যন্ত উঠলাম; কিন্তু তারপর ঠিক গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার শক্তি রইল না। তখন ওপর থেকে একজন হাত বাড়িয়ে ধরে টেনে তুলে নিলেন। যিনি হাত বাড়িয়ে দেন তিনি উপরে অবস্থিত স্বভাবে স্থিত সত্তার স্থাণু রূপ হতে প্রবাহিত শক্তি।

এই আরোহণ মার্গের শ্রীঅরবিন্দ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে। তাঁর ধারণায় মানুষের মনের সহিত এই অখণ্ড চেতনার সংযোগ স্থাপন করতে মানুষের তিনটি পরিবর্তন লাভের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রথমে চাই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের প্রয়োজন (Psychic change)। তারপর চাই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন (Spiritual change), যার ফলে উপরের শক্তি নীচে প্রবাহিত হয়ে তার জীবনকে চেতনা, শক্তি, পবিত্রতা ও আনন্দে আপ্লুত করবে। পরিণতিতে চাই অতিমনের (Supermind) মধ্যে আরোহণ এবং অতিমানস চিৎশক্তির (Supramental consciousness) অবরোহণ।[৭]

এখন মানসিক পরিবর্তনের কথা ধরা যাক। তাকে প্রস্তুতিপর্ব বলা যায় তা সম্ভব হয় কয়েকটি উপায় অবলম্বন করে। প্রথমত

7. এই প্রসঙ্গে Life Divine, Bk. II, Part 2, Chap. XXV দ্রষ্টব্য।

সত্য মঙ্গল ও সুন্দরের সহিত সংযোগ স্থাপন করে আধ্যাত্মিক সত্তার সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত প্রীতি ও ভক্তির চর্চারি মধ্য দিয়ে হৃদয়বৃত্তির প্রসার ঘটান যেতে পারে। তৃতীয়ত ঈশ্বরের কাছে একটি আত্মসমর্পণের মনোভাব গড়ে তোলা যেতে পারে। এইভাবে মনকে জড় প্রকৃতি হতে সরিয়ে এনে অন্তর্মুখী করা যায় এবং মনের উর্দ্ধে অবস্থিত লক্ষ্যে আরোহণের পথ সুগম করা যায়।

প্রস্তুতিপর্বের পর প্রকৃত আরোহণ পর্ব সুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দের ধারণায় এই আরোহণ পর্বের তিনটি ধাপ আছে। তাদের লক্ষ্য হল ধাপে ধাপে মানুষের চেতনাকে (consciousness) পরিবর্তিত করে মূল সত্তার দ্বারদেশে পৌঁছে দেওয়া। সেই ধাপগুলি হল এই: প্রথম আসে উচ্চতর মন (Higher Mind); তারপর আসে আলোকিত মন (Illumined Mind)। এই দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ সহায়তা করে স্বতঃজ্ঞান (Intuition); কারণ যুক্তির পথে যে জ্ঞানকে পাই তা আমাদের মনকে এভাবে আলোকিত করতে পারে না। তারপর আসে অতিক্রমীমন (Overmind)[1]। মানুষ নিজের সাধনার বলে এই পর্যন্ত উঠতে পারে। তারও ওপরে উঠতে হলে উপরের শক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা এখন আরোহণের পথে মানুষের মনের এই বিভিন্ন পরিবর্তনের (Transmutation) বিষয় একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

প্রথম ধাপে পাই উচ্চতর মন (Higher Mind)। এই

---

1. These gradations may be summarily described as a series of sublimations of the consciousness through Higher Mind, Illumined Mind and Intuition into Overmind and beyond it.

Life Divine, Bk. II, Part 2, Chap. XXVI

অবস্থায় মন তার আংশিক অজ্ঞান এবং আংশিক জ্ঞানের মধ্যে বিচরণ করে বিভ্রান্ত হয় না। এখানে তার আধ্যাত্মিকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ফলে শুধু তার জ্ঞানশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় না, তার কর্মশক্তিতেও নূতন বল সঞ্চারিত হয়।[১]

তার পরবর্তী ধাপে পাই আলোকিত মন (Illumined Mind)। এখানে মনের মধ্যে জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তা দিনের আলোর মত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে যুগপৎ দৃষ্টি গোচর করায়। উন্নত মনের অবস্থায় এবং আলোকিত মনের অবস্থায় মানুষের মন যে নূতন জ্ঞানশক্তির অধিকারী হয় তা উপর হতে আসে এবং তা স্বতঃজ্ঞানের প্রকৃতির। অখণ্ড জ্ঞানের (Knowledge by Identity) সহিত তার প্রকৃতিগত ঐক্য আছে।[২]

তারপর আসে অতিক্রামী মন (Overmind)। আগের দুটি ধাপ তারই প্রস্তুতি। এই অতিক্রামী মন মূল সত্তার সঙ্গে একীভূত যে অতিমানসিক স্বতঃজ্ঞান (Supramental gnosis) তারই প্রতিনিধিরূপে মানব মনে আবির্ভূত হয়।[৩] অতিক্রামী মনই মানব মনের আরোহণের শেষ সীমা। নিজের চেষ্টায় আত্মবিকাশের মধ্য

---

1. This is the Higher Mind in its aspect of cognition ; but there is also the aspect of Will, of dynamic effectation of the Truth. Ibid

2 Intuition is a power of consciousness nearer and more intimate to the original knowledge by identity.

Ibid

3 In its nature and law the Overmind is a delegate of the Supermind Consciousness, its delegate to Ignorance.

Life Divine, Bk. I, Chap. XVIII

দিয়ে নিজের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের মন এর বেশী উঠতে পারে না।[১]

(৪)

তারপর আসে অতিমন (Supermind)। আগেই বলা হয়েছে অতিক্রামী মন হল অতিমনের প্রতিনিধি। দুই শক্তিই রহস্যাবৃত এবং তাদের উৎসভূমি হলেন স্বয়ং স্থাণু সত্তা সচ্চিদানন্দ। এরা উপর থেকে নেমে আসে মানুষের মনকে উন্নীত করে অতিমনের সহিত সংযুক্ত করতে। এটি সংঘটিত না হলে মানব মনের পরিবর্তন (transformation) সম্পূর্ণতা পায় না।[২] আমরা জেনেছি শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা অনুসারে মূল সত্তার দুই প্রান্তে দুটি রূপ আছে। একটি সচ্চিদানন্দ স্থানকালাতীত স্থাণুরূপ, অপরটি গতিশীল বিশ্বে অবস্থিত মানব মন রূপ। মানুষের মন যখন অতিক্রামী মনের অবস্থায় ওঠে তখন তা এই সচ্চিদানন্দ রূপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উপযুক্ত হয়। যে শক্তি সংযোগ স্থাপন করে তাকেই তিনি অতিমন বলেছেন।[৩] তার অস্তিত্ব আছে। তা নিম্নস্তরের মনের মত দৃশ্যমান

---

1. The overmind change is the final consummating movement of the dynamic spiritual transformation, it is the highest possible status-dynamics of the spirit in the spiritual mind plane.

Life Divine, Bk. II, Part 2, Chap. XXVI

2. This descent is the *sine qua non* of the transition and transformation. Ibid

3. The intermediate link exists. We call it the Supermind or Truth Consciousness, because it is a principle superior to mentality and exists, acts and proceeds in the fundamental truth and unity of things.

Life Divine, Bk I, Chap. XVI

জগৎ হতে খণ্ড আকারে যুক্তির ভিত্তিতে জ্ঞান আহরণ করে না; তা মানুষকে অখণ্ড জ্ঞানের অধিকারী করে।

শ্রীঅরবিন্দের ধারণায় মানব মনের মধ্যে এই অতিমনের অবতরণের ফলে মানুষের সত্তার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের ফলে এই ভাবে যে সত্তার আবির্ভাব ঘটে তাকে তিনি 'নসটিক' সত্তা (Gnostic being) বলেছেন। তার তাৎপর্য বুঝতে এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থ কি তা বিশ্লেষণ করে দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। Gnosis অর্থে বুঝি উচ্চস্তরের ধর্ম সম্পর্কিত বা দর্শন সম্পর্কিত রহস্য মুলকজ্ঞান। এই ধরণের রহস্যগত জ্ঞানের (gnosis) উল্লেখ ইহুদীদের এবং খৃষ্টানদের ধর্ম-গ্রন্থে উল্লেখ আছে। গ্রীকদের (Pagan) মধ্যেও তা ছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীর রহস্যমূলক জ্ঞানের একটি প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। তা হল এই যে তা জ্ঞান সঞ্চয় করে যুক্তির প্রয়োগে নয়, স্বতঃজ্ঞানের মাধ্যমে (Intuition)। শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনায় এই উন্নত অবস্থায় মানুষ স্বতঃজ্ঞানের ভিত্তিতে অখণ্ডজ্ঞানের অধিকারী হয় বলেই বোধ হয় তিনি তার এই নাম করণ করেছেন। তাকে হয়ত আমরা স্বতঃজ্ঞানের অধিকারী সত্তা বলতে পারি।

এই 'নসটিক' সত্তার প্রকৃতি কি রকম হবে শ্রীঅরবিন্দ তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ধারণায় তার কাজ করবার শক্তি ও ইচ্ছা থাকবে, কি করতে হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকবে এবং তার সেই জ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়িত করবার শক্তি থাকবে। অজ্ঞান হেতু ভ্রান্ত পথে মানুষ যা করে বসে সে তা করবে না। সে কাজ করবে কর্মফল প্রাপ্তির আশায় নয়। জীবন ধারণে এবং কর্মে তার কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকবে না; আধ্যাত্মিক সত্তা রূপে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আনন্দের আকর্ষণে সে কাজ

করবে।[১] এই 'নসটিক' সত্তা ব্যক্তি হবে কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব থাকবে না। অর্থাৎ তা কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হয়ে একটি চরিত্রতে বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হবে না। কারণ তার স্থান-কালাতীত স্থাণু সত্তার অভিব্যক্তির একটি বিশেষ ক্ষেত্ররূপে কাজ করতে হবে।[২]

এই 'নসটিক' সত্তার মধ্যে যে জীবন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তাকেই তিনি দিব্যজীবন (divine life) বলে বর্ণনা করেছেন। মানুষের জীবনের বিকাশের শেষ পরিণতি সেইখানে। এই সত্তার জীবনকে দিব্যজীবন বলা হয়েছে কারণ তা দেবতার মধ্যেই বিধৃত ; তাকে কেন্দ্র করেই দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি এবং দিব্যআনন্দ জড় প্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত হয়।[৩]

---

1. Its action is not for the seeking for a fruit or result; its joy is in being and doing, in pure state of spirit, in pure act of spirit, in the pure bliss of spirit.

Life Divine, Bk. II Part 2, Chap. XXVII

2. Conscious expression of the universal and the transcendent. Ibid

3. For it would be a life in the Divine, a life of the beginnings of a spiritual divine light and power and joy manifested in material Nature.

Life Divine, Bk II, Part 2, Chap. XXVII

*

"ভারত হৃদয়ারবিন্দ"

ডক্টর রমা চৌধুরী

শ্রীঅরবিন্দ! এই একটী মাত্র নামে চিরকাল রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌বে সমগ্র ভারতের, তথা, জগতের পুণ্য কলেবর। কারণ, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মধুর-মোহন পুণ্য-ধন্য অনন্য নামের মতই বিশ্বের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিলেন একটী অম্লান অরবিন্দের মতই, দিকে দিকে তাঁর অমল রং বিকীর্ণ করে, দিকে দিকে তাঁর অফুরন্ত মধু সিঞ্চিত করে, দিকে দিকে তাঁর অনন্ত সৌরভ বিস্তৃত করে। কি সেই রং? তা'ত হল জ্ঞানের শুভ্র রং। কি সেই মধু? তা'ত হল ভক্তির সঞ্জীবনী মধু। কি সেই সৌরভ? তা'ত হল কর্মের মধুর সৌরভ। এইভাবে, জ্ঞান ভক্তি কর্মের একটী অপূর্ব সমন্বয়, একটী মূর্ত প্রতীক, একটী জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, একটী জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন সর্বজনবন্দ্য যুগবতার পুণ্য শ্লোক—ধন্যজীবন অনন্য-চরিত্র শ্রীঅরবিন্দ। আজ এই অশেষ শুভ-আবির্ভাব উৎসবের প্রারম্ভে তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে শতসহস্রকোটী প্রণতি নিবেদন করে পরম কৃতার্থ বোধ কর্‌ছি।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একজন বরিষ্ঠ গরিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু তাঁর দিব্য জীবনের একটী পরম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কেবল দার্শনিকই ছিলেন না; কেবল শুষ্ক শূন্য তত্ত্বের আলোচনাতেই জীবনাতিপাত করেননি। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন সাধক শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ পুরুষ। কারণ, সেই তত্ত্বকে তিনি সাধনার বলে নিজের জীবনে সত্য বলে প্রমাণিত করেছিলেন; নিজের জীবনকে সেই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং সাক্ষাৎভাবে

পরীক্ষিত কেবল সেই সত্যকেই জনসমাজে প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।

বস্তুতঃ, শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক মতবাদ অতি নিগূঢ়—অল্প কথায় ব্যক্ত করা তা' অসম্ভব। তাঁর বিশ্ববিক্রুত, সুবৃহৎ "The Life Divine" নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর অপূর্ব সুন্দর সুষমামণ্ডিত ভাষায় তাঁর নিজের দর্শন সম্বন্ধে প্রপঞ্চিত করেছেন। এই মহাগ্রন্থটী দর্শন-শাস্ত্রের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অবশ্য পাঠ্য। অতি সংক্ষেপে এই মহনীয়-বরণীয়-রমণীয় গ্রন্থটী সম্বন্ধে সামান্য দু'একটী কথা বলবার প্রচেষ্টা করছি।

অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শ্রীঅরবিন্দও প্রগাঢ় অনুভূতি, অথচ, নিগূঢ় প্রজ্ঞা-সহকারে বলছেনঃ—

"First, we affirm an absolute as the origin and support and secret Reality of all things."

"প্রথমেই আমরা ব্রহ্মকেই স্বীকার করে নিই সানন্দে-সগৌরবে, যে ব্রহ্ম—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ; তার ভিত্তি স্বরূপ; এবং তার গোপন সত্য।"

এরূপে এই Absolute বা ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; জগতের শ্রষ্টা ও পালক; সকল সত্য-তত্ত্ব-সত্তা-শক্তি-আনন্দের মূলাধার; জগল্লীন হয়েও জগদ্‌বহির্ভূত।

এই পরমপুরুষের দুটী দিক্-Being বা সত্তা; এবং Becoming বা পরিণতি। সেজন্য নিত্য-সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ক্রমান্বয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হচ্ছেন। এই অনুপম প্রক্রিয়ার নাম "*Divine Descent*" বা "Involution" of God into the World." এরূপে, পরমেশ্বর সাতটী ক্রমনিম্ন স্তরের মাধ্যমে ক্রমশঃ জড় প্রকৃতিতে পরিণত বা রূপান্তরিত হচ্ছেন—এই সাতটী স্তর হল যথাক্রমেঃ—

Divine Existence (ঐশ্বরিক সত্তা), Divine Con-

sciousness (ঐশ্বরিক জ্ঞান), Divine Delight (ঐশ্বরিক আনন্দ), Divine Power (ঐশ্বরিক শক্তি), Mind (মানব-মন) Life (মানব-প্রাণ), Matter (জড়-প্রকৃতি)

এরূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক তৃণগুচ্ছ, প্রত্যেক বারিবিন্দু, প্রত্যেক ধূলিকণা, প্রত্যেক অণু-পরমাণু সেই অখণ্ড সত্তা, সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের মূর্ত প্রতিচ্ছবিই মাত্র। সেজন্য জড়প্রকৃতিও প্রকৃতপক্ষে কেবল জড়মাত্রই নয়, প্রকৃতকল্পে ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মসত্তাময়।

বস্তুতঃ, জড়ের মধ্যেও পরমেশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি নিহিত হয়ে রয়েছে বলে, জড়বস্তু কেবল জড়ভাবেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না—সেই অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি বলে, অথবা, Divine Potentialityর জন্য, জড় থেকে পুনরায় হয় ঠিক বিপরীত ক্রম ধরে ক্রমোচ্চ বিকাশ বা আবির্ভাব—জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে, মন থেকে আত্মায়, আত্মা থেকে ব্রহ্মে পরিপূর্ণ বা চরম বিকাশ। এই প্রক্রিয়ার নাম "Divine Ascent", বা "Evolution"।

একই ভাবে, জড়দেহধারী মানবও দেহকে অতিক্রম করে, এমন কি মনের সীমাও অতিক্রম করে', এক Supramental বা অতি-মানস স্তরে নিজের আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করেন; অর্থাৎ নিজের ব্রহ্মস্বরূপত্ব সাক্ষাৎ ভাবে, পরিপূর্ণ ভাবে, শাশ্বতভাবে অনুভব করেন সগৌরবে। এই সময়ে, তাঁর এই নিজের মধ্যেই যে স্বয়ং পরব্রহ্ম আদ্যন্তকাল বিরাজ করছেন তাঁর অনন্ত অসীম সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে, এই মধুর-মোহন প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় সেই সাধকের। তখন ত তিনি আর তাঁর পূর্বতন সঙ্কীর্ণ-স্বার্থসঙ্কুল সত্তার বা গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবন অনন্ত অসীম ভূমা মহান পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায় বলে, তিনিও

নিজে একই ভাবে অনন্ত, অসীম, ভূমা মহান হন। তখনই তিনি Man বা মানব-মাত্রই নন; "Super-Man", বা "অতি মানব", অর্থাৎ, দিব্য মানব।

এই ত হল মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—শ্রীঅরবিন্দের অনুপম ভাষায়—"It is a necessity for the Soul in the Universe" to become one with the Divine Being to raise its nature to the Divine Nature, its existence into the Divine Existence, its consciousness into the Divine Consciousness, its delight of being into the Divine Delight of Being." (The Life Divine, P. 540)

"পরমেশ্বরের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হওয়া; মানবস্বরূপকে দিব্যস্বরূপে, মানবজ্ঞানকে দিব্যজ্ঞানে, মানব-আনন্দকে দিব্যানন্দে উন্নীত করাই হল সাংসারিক জীবের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

শ্রীঅরবিন্দ এই অমৃতময়ী, মহিমময়ী, মধুরিমময়ী, মঙ্গলময়ী, বাণীই আমাদের দিয়েছেন বারংবার তাঁর রমণীয় রসঘন-ভাষায়—

"The natural man has to evolve himself in to the Divine Man; the sons of Death have to know themselves as children of Immortality".

"জড়দেহের, পশুস্বভাবের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে, সাংসারিক মানবকে দিব্যমানবে পরিণত হতে হবে; মৃত্যুর সন্তানদের নিজেদের অমৃতের পুত্ররূপে জানতে হবে।"

কিন্তু এতেও, এইভাবে দিব্যজীবন লাভ করেও ত, আমাদের সাংসারিক জীবদের সকল কর্তব্য সমাপ্ত হবে না, যদি না আমরা সেই দিব্যজীবনকে জগতেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। সেজন্য সিদ্ধ-পুরুষ, বা "অতিমানব" অর্থাৎ, দিব্যমানব পরমেশ্বরের দিব্যরাজ্যকে

নামিয়ে আনবেন এই ধরণীরই ধূলিতলে, এই মর্ত্যেরই মাটীতে। নিজের দিব্যজীবনকে তিনি এই ভাবে সম্প্রসারিত করে দেবেন, সঞ্চারিত করে দেবেন সকলের মধ্যে। কেবল নিজে মুক্তিলাভ করলেই তাঁর চলবেনা—সকলকে মুক্তিলাভের পন্থা তাঁকেইত নির্দেশ করে দিতে হবে; নিজের নিষ্কাম কর্ম ও পরসেবার মাধ্যমে তাপিতা-ধরণীর ভার তিনি লঘু করবেন—তবেই ত তাঁর মুক্ত জীবন পূর্ণতম সার্থকতা লাভে ধন্যাতিধন্য হবে।

এইভাবে, শ্রীঅরবিন্দের মহামহিমময় দর্শনের তিনটী স্তর—Descent→Ascent→Descent. প্রথম স্তরে, ঈশ্বরের ক্রমান্বয়ে জগতে অবরোহণ; দ্বিতীয় স্তরে, জড় দেহধারী মানবের ঈশ্বরে আরোহণ; তৃতীয় স্তরে, ঈশ্বরস্বরূপ অতিমানব, অথবা দিব্য-মানবের ঈশ্বর থেকে পুনরায় জগতে অবরোহণ জগতের শিক্ষার জন্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উপায় হল "যোগ।"

এইভাবে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিব্য-জীবনের সমস্ত সুষমা দিয়ে আমাদেরও সেই পথ নির্দেশ করেছিলেন—সুফীদের ভাষায়, যে পথে আমাদের যাত্রা হবে ত্রিবিধ—Journey *away from* God Journey *to* God Journey *from* God *with* God: ঈশ্বর থেকে অবরোহণ করে ঈশ্বরের সঙ্গে বিরহ; ঈশ্বরে আরোহণ করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন; ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে, ঈশ্বরকে নিয়েই ঈশ্বর থেকে অবরোহণ।

কি অনুপম—অভিনব এই দর্শন! কারণ, সেই সব অবিশ্বাসের যুগেও, অশ্রদ্ধার যুগেও, অর্বাচীনতার যুগেও, তিনি যেভাবে সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, এবং সর্বভূতে ঈশ্বর পূজনের বিধি দিয়েছিলেন, তা' ভারতবর্ষে নূতন কথা না হলেও, কেবল ভারতবর্ষকে নয়, সমগ্র বিশ্বকেও তা' মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল। তার কারণ হল এই যে, তিনি এই ঈশ্বর সমন্বিত দিব্য জীবনকে স্থির বিশ্বাস বলে' সেই

জড়বাদ বস্তুতন্ত্রবাদের যুগেও সত্য রূপে প্রমাণিত করেছিলেন। তাঁর এই রোমাঞ্চকর "দিব্যজীবনবাদ" যে কেবল কথার কথামাত্রই নয়; কেবল শূন্যগর্ভ, শুষ্ক তত্ত্বমাত্রই নয়; কেবল পণ্ডিতের অহেতুক গর্বমাত্রই নয়; কেবল স্বপ্নবিলাসীর স্বপ্নমাত্রই নয়; কেবল আকাশবিহারী কবির আবেগোচ্ছ্বাসমাত্রই নয়—সে কথাও তিনি জগৎসমক্ষে অকাট্য ভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। এইটাই আমাদের পরমলাভ। কারণ, অতি উচ্চ, অতি শুদ্ধ, অতি পূর্ণ তত্ত্ব-বিষয়ে আমরা অনেক পড়ি, অনেক শুনি, অনেক বলি। কিন্তু প্রায়ই তা আমাদের ক্ষেত্রে বাইরের জিনিষ মাত্রই হয়ে থাকে চিরকাল। তার কারণ হয়ত এই যে, চোখের সামনে রূপায়ণ না দেখলে, এরূপ সুকঠিন তত্ত্বকে আমরা সত্যই জীবনে উপলব্ধি করতে পারি না, গ্রহণ করতে পারি না, ধারণ করতে পারি না, বরণ করে নিতে পারি না। সেজন্য প্রয়োজন হয় আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, বাস্তব উদাহরণ, মূর্ত প্রতিচ্ছবির। এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, বাস্তব উদাহরণ, মূর্ত প্রতিচ্ছবিই আমরা পেয়েছি শ্রীঅরবিন্দের ভূমা মহান, মহামহিমময় গরিমময় দিব্য জীবনে। তা' সত্ত্বেও, যদি আমরা আমাদের অধন্য-অপূর্ণ জীবনকে অন্ততঃ কিছুটা দিব্য করে তুলতে না পারি, তাহলে তা ত হবে আমাদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ, নিঃসন্দেহে।

বস্তুতঃ, তিনি যে দিব্যজীবনবার্তা আমাদের নিকট বহন করে এনেছেন আমাদের অশেষ কল্যাণের জন্য, তা' আমাদের অনিবার্য নিয়তি—এই জীবন আমাদের লাভ করতে হবেই হবে। ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বীজেরও যেমন সুবিশাল বনস্পতিতে পরিণতি অবশ্যম্ভাবী, ঠিক তেমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবেরও সুবিশাল দিব্যমানবে পরিণতি অনিবার্য। চির-আশাবাদী, সত্যদ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ সেজন্য তাঁর যুগান্তকারী মহাগ্রন্থ "The Life Divine"এ শেষ কথা বলছেন

এই ভাবে পরম আশা ভরে, অশেষ বিশ্বাস সহকারে, অনন্ত আনন্দ সঞ্চারে :—

"If there is an evolution in material Nature and if it is an evolution of being with consciousness and life as its two key-terms and powers, this fulness of being, fulness of consciousness, fulness of life must be the goal of development towards which we are tending and which will manifest at an early or later stage of our destiny. The self, the spirit, the reality that is disclosing itself out of the first inconscience of life and matter, would evolve its complete truth of being and consciousness in that life and matter. It would return to itself—or, if its end as an individual is to return into its Absolute, it could make that return also,—not through a frustration of life but through a spiritual completeness of itself in life. "(The Life Divine—Last para. P. 947)

*

'গভীর সুরে গভীর কথা'

গৌরী ধর্মপাল

ভাববিভোল কীর্তনিয়া প্রাণমাতান কণ্ঠে গান ধরেছেন, 'সপ্তম দ্বার' পরে রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী।' শ্রোতাদের মধ্যে আছেন বাল বৃদ্ধ বনিতা সাধারণ অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞ অতত্ত্বজ্ঞ সবাই। রসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সুরের ভেলায় ভাসতে ভাসতে যে তত্ত্বটি এল, তাকে কেউ খুঁটিয়ে বুঝলেন, কেউ অতশত বুঝলেন না, কিন্তু সবারই হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়ে সে ঘা দিল। এমনভাবে, যে তাকে মনে হল বড়ই চেনা, বড়ই আপন। এ তত্ত্ব যে সেই আদ্যিকাল থেকে সংহিতা উপনিষদ্ তন্ত্র দর্শন ধর্ম পুরাণ লোকসাহিত্যের সাত ঘাটে জল খেতে খেতে এই কীর্তনের কূলে এসে ভিড়েছে সে-ইতিহাসকে কোন পাত্তা না দিয়েই হৃদয়রাজা দু-হাত বাড়িয়ে ডেকে নিলেন এই দূতীকে, দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারের আগলখোলা আপনভোলা দরজার মধ্যে দিয়ে দূতী গিয়ে পৌঁছল তাঁর খাসমহলে, আত্মায়, আঁতে; সপ্তম দ্বার 'পরে রাজা বৈঠত তাঁহা হাঁ হাঁ যাওব নারী! তারপর রাজায়-নারীতে কী আলাপচারী হল সে-খবর জানেন শুধু কীর্তনিয়া, তাঁর সমঝদার শ্রোতা আর তাঁদের অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।

এই তত্ত্বের তুষার গলে রসের জাহ্নবী হতে কয় শতাব্দী বা সহস্রাব্দী সময় লেগেছে তার সঠিক হিসাব আমাদের অজ্ঞাত। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্ট তত্ত্বগুলি যেদিন এমনি করে লোকমানসের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে, মহাকালের হাতের সেই অমোঘ নিকষে নিকষিত হয়ে প্রমাণ করবে যে তারা ভুঁইফোঁড় নয়, ভুঁই-ফোঁড় (মাটি থেকে গজানো), সে-দিনটিরও দিনক্ষণতিথি আমাদের অজানা। কেননা

মানুষের বুদ্ধি এখনো মন্থরা, হৃদয় এখনো জর্জর, পরিপাক প্রক্রিয়া এখনো বিলম্বিনী, তার ওপর খাদ্যের বৈচিত্র্যও আবার দিনে দিনে বর্ধমান। এ অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দকে ভারতবর্ষকে পৃথিবীকে মানুষের পরম পুরুষার্থকে যাঁরা ভালবাসেন মূল্য দেন বুঝতে চান পেতে চান, তাঁরা কী করবেন? সোনার ধানকে নিজের নিজের গোলায় আতুপুতু করে মজুত করে রাখবেন? না, তরী বোঝাই করে কালস্রোতের অপেক্ষায় বসে থাকবেন কালো হ্যয়ং নিরবধির্ বিপুলা চ পৃথ্বী' ব'লে? না, খেতময় খেতময় মণময় প্রাণময় ছড়িয়ে দেবেন দরাজ হাতে? মজুতদার বা যদ্‌ভবিষ্য নয়, ঐ ধানছড়ানো প্রাণ-ভরানো চাষার আশাতেই বসে আছি আমরা। তিনি বা তাঁরা, আসতে থাকুন, ইতিমধ্যে ঐ ধানগুলির আকৃতি-প্রকৃতি উপাদান-অপাদানের একটু খোঁজ-খবর নিয়ে রাখা যাক মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ, ক'রে।

দিব্যজীবনের প্রথম খণ্ডের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ হল The seven fold Chord of Being—সত্তার সপ্ততন্ত্রী, আর দ্বিতীয় খণ্ডের একবিংশ পরিচ্ছেদ হল The Order of the Worlds—লোকসংস্থান। শ্রীঅনির্বাণের দিব্যজীবন প্রসঙ্গে এই দুটি পরিচ্ছেদের মূলসূত্রটি এইভাবে দেওয়া আছে—'লোকসংস্থানের একটা প্রাচীন ছক হল সপ্তব্যাহৃতিতে উল্লিখিত সপ্তলোক, উপনিষদে যাদের বলা হয়েছে 'আপঃ'। আমাদের সত্তার সপ্ততন্ত্রের সঙ্গে এই সপ্তলোকের একটা সমান্তরতা আছে, কেননা আগেই বলেছি আত্ম-চেতনা আর লোকচেতনা একই চিৎশক্তির প্রত্যক্ (subjective) এবং পরাক্ (objective) বিভঙ্গ মাত্র। লোকদৃষ্টিতে যা সত্য তপঃ জন মহঃ স্বঃ ভুবঃ এবং ভূ, অধ্যাত্ম অনুভবে তাই সৎ চিৎ আনন্দ বিজ্ঞান মন প্রাণ এবং দেহচেতনা। সবই এক অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশ—জীবের আকারে এবং জগতের আকারে···পিণ্ডে

যা ঘটছে, ব্রহ্মাণ্ডেও তাই ঘটছে।' (পৃ ৩:৮)

মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আর আজ্ঞাচক্র পেরিয়ে চেতনা সহস্রারে পৌঁছলে সত্তার এই সপ্ততন্ত্র সপ্ততন্ত্রী বীণা হয়ে বাজতে থাকে সুরসপ্তকে লোকসপ্তকে। সপ্তধা অবিদ্যার আবরণ মিলিয়ে গিয়ে ফুটে ওঠে সপ্তধা বিদ্যার আলো, সপ্তশীর্ষ্ণী ধী (দ্র. দিব্যজীবন ২য় খণ্ড একবিংশ পরিচ্ছেদ Out of the Sevenfold Ignorance Towards the Sevenfold Knowledge—সপ্তধা অবিদ্যা হতে সপ্তধা বিদ্যার পথে), সাত দরজার সাত কপাট রূপ বদ্‌লে হয়ে যায় দ্বারাধীশের দ্বারকাধীশের সাতটি সিংহাসন, রাখাল রাজার বাঁশির সাতটি ফুটো।

এই দেহের বীণা-বংশীতে বৃহৎসাম, অনন্তের-সুর সাধা—এই হল বেদের ঋষি থেকে আরম্ভ করে নদের বাউল পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার ধারা। এই সাধনায় সিদ্ধ হয়েই ঋগ্বেদের ঋষি বৃহদ্দিব অথর্বা নিজের তনুকেই ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছিলেন (ঋ ১০।১২০।৯); অথর্ববেদের ঋষি বলেছিলেন, এই দেহই হল দেবতাদের অষ্ট-চক্রা নব-দ্বারা অযোধ্যা অপরাজিতা পুরী, সোনার কেল্লা, এই পুরে বাস করেন বলেই ব্রহ্ম হচ্ছেন পুরুষ (অথর্ব ১০।২।৩০—৩৩); আর বাউল বলেছেন, এই দেহের মধ্যে মানুষ আছে চিদানন্দময়। শ্রীঅরবিন্দের সাধনাও এই ভাগবতী চিন্ময়ী সত্ত্বতনুরই সাধনা, Even the body shall remember God, তনু হবে তন্ময়। অর্থাৎ বেদে তন্ত্রে দেহতত্ত্বের সাধনায় যা ঘটেছিল, শ্রীঅরবিন্দেও তাই ঘটেছে।

কিন্তু ঠিক কি তাই? না, ঠিক তা-ই নয়, একটু অন্যরকম। বেদের যুগ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের সংস্কৃতি যে-কয় হাজার বছর ধরে পথ হাঁটছে পৃথিবীর বুকে, সেই চলার ইতিহাস সাধনা ও দু-দণ্ড সিদ্ধিকে এক নজরে দেখে বুঝে অঙ্গীকৃত করে

শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্ব ও উত্তরা মহত্তরা সিদ্ধির সাধনা, এক কথায় শ্রীঅরবিন্দের জগৎ, তার নিজস্ব রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধ নিয়ে জেগে উঠেছে সেই পাখির নীড়ের মত যেখানে বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্, যে-কুলায়ে কুলিয়ে যায় সমস্ত বিশ্ব। সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ। অহোরাত্রে প্র জায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপয়োঃ ॥— বলছেন অথর্ববেদ (১০।৮।২৩)। অর্থাৎ, 'যা ছিল সনাতন, তাই আবার আজ নতুন হবে। দিন থেকে জন্ম নেয় রাত, রাত থেকে জন্ম নেয় দিন।' আমাদের বহুশতাব্দীব্যাপী রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, আসছে সুদিন, আসছে সনাতন নতুন রূপে নতুন বেশে পুনর্ণব হয়ে। তার মধ্যে যা সনাতন তাকে চিনতে হবে মিলিয়ে নিতে হবে চিরাগত ধারার সঙ্গে, আর যা নূতন তাকে বুঝতে হবে, ধরতে হবে। ধারণ করতে হবে প্রত্নপাত্রে নূত্ন মদিরা।

যদি মনে করি এ একেবারেই পুরোন, তাহলে মস্ত ভুল হবে, সেই তাঁর মতো যিনি বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আর নিজে কী লিখেছে? সবই তো উপনিষদ্ থেকে চুরি।' তাঁকে বলতে ইচ্ছে করে,

মাটি-চোর গাছগুলো, মাটিরাও গাছ-চোর
একে যদি চুরি বল, সকলেই জোচ্চোর।
পৃথিবীটা হল কিসে? সূর্যের গা-চুরি না?
এটাকে বলছ চুরি? কথাগুলো গা-জুরি না?

যে কোন যুগমানবের বৈশিষ্ট্য তাঁর তত্ত্বকথার সারবস্তুতে নয়, তাঁর বলার ভঙ্গীতে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে। ব্যক্তির মধ্যে সত্য যখন রূপ ধরে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে আর দাড়ি-ওলা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ থাকে না, সে হয়ে যায় দামাল শিশু, ঊর্জো নপাৎ, বীর্যের সন্তান, সহসঃ সূনুঃ, শক্তির পুত্র।

আবার যদি মনে করি এ একেবারেই নতুন, তাহলেও মস্ত ভুল হবে। A genius cannot afford to be original। যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার চমৎকারিত্ব যাদুকরের খেলের মতো নয়, যে হল ধ্রুবা স্মৃতির ঝলক। আত্মার অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়। মনের গভীর তলদেশ হঠাৎ নাড়া খেয়ে জেগে ওঠে, এই যে, এই তো তার চিহ্ন, তবে সে কোথায়? খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়!

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যা সনাতন তাকে চেনার কতগুলি হদিশ তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন তাঁর দিব্যজীবনের প্রতি অধ্যায়ের শীর্ষ-উদ্ধৃতিগুলিতে। এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে আছে ঋগ্বেদের ৭৬টি মন্ত্রের অনুবাদ। ষষ্ঠ এবং অষ্টম এই দুটি মণ্ডল ছাড়া বাকি আটটি মণ্ডল থেকেই এই সব মন্ত্র চয়ণ করা হয়েছে। দুর্ব্যাখ্যাবিষ-মূর্চ্ছিত এই ঋঙ্‌মন্ত্রগুলিকে তিনি স্বানুভবের সঞ্জীবনী দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে শিরোধার্য করে তাদের স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়া আছে অথর্ববেদের অনবদ্য ভূমিস্ূক্ত থেকে ৫টি ঋক্; যজুর্বেদ থেকে একটি, ঈশ বৃহদারণ্যক কেন ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয় কঠ শ্বেতাশ্বতর প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য মৈত্রী এবং মহোপনিষদ্—এই ১২টি উপনিষদ্ (এর মধ্যে ঐতরেয় আর কৌষীতকী এই দুটি ঋগ্বেদীয় উপনিষদ্ ছাড়া আর সব কটি প্রধান উপনিষদ্ই রয়েছে) থেকে ১০০রও বেশী মন্ত্র, গীতার বিভিন্ন অধ্যায় থেকে ৩১টি শ্লোক, বিষ্ণুপুরাণ থেকে একটি এবং বিবেকচূড়ামণি থেকে দুটি শ্লোকের অনুবাদ।

এই উদ্ধৃতিগুলি হল প্রতি অধ্যায়ের বীজমন্ত্রস্বরূপ। এই সনাতন বীজমন্ত্রগুলি তাঁর মধ্যে দিয়ে নতুন ভাষায় নতুন ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে—এইখানে তাদের এবং তাঁর পুনর্নবত্ব। তিনি ঐ মন্ত্রের টীকাকার বা ভাষ্যকার নন শুধু, তিনি ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা পুনর্দ্রষ্টা এবং প্রয়োগকুশল ব্রহ্মা। ন মন্ত্রাণাং জামিতা অস্তি। মন্ত্র কখনো

পুনরাবৃত্ত হয় না। পুনরাবৃত্ত হলে তা আর মন্ত্র থাকে না। প্রতি আবৃত্তিতেই তা নতুন। উপলব্ধার উপলব্ধির মধ্যে তার জন্মান্তর রূপান্তর ভাষান্তর ঘটে। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, ঠিক তেমনি মন্ত্রেরও শৈশব কৌমার যৌবন এবং জরা আছে। বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি লুকিয়ে থাকে তেমনি একটি বিশেষ স্থানে-কালে বিশেষ একজনের দ্বারা দৃষ্ট-শ্রুত মন্ত্রের মধ্যেও সর্বকালীন সর্বজনীন মহাসত্যের সপ্তচ্ছন্দা সপ্তচ্ছদ মহাকায় লুকিয়ে থাকে। একজনের উপলব্ধিতে সেই মন্ত্র যখন ধরা দেয়, তখন মহাসত্ত্ব হলেও সে শিশু, সে অঙ্কুর। পঞ্চজনের মধ্যে দিয়ে যখন তার পাঞ্চজন্য ঘোর নির্ঘোষে বেজে ওঠে, তখন তার প্রদীপ্ত যৌবন। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের এই যৌবনকালের সাক্ষী অরবিন্দ, সাক্ষী বাংলাদেশ, সাক্ষী ভারতবর্ষ। আবার উপলব্ধির ধার ভোঁতা হতে হতে মন্ত্র কেমন বুড়ো হয়ে মরে যায় তারো দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সবচেয়ে চমকপ্রদ হচ্ছে বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি, সেইভাবে অপব্যাখ্যা কুসংস্কার ও যান্ত্রিক আবৃত্তির জীর্ণবাস পরিত্যাগ করে মরামন্ত্রের রাম হয়ে ওঠা। একটি অতি আধুনিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুববাংলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। যে-রবীন্দ্রসঙ্গীতকে স্বরলিপি বানান করে ইনিয়ে-বিনিয়ে গেয়ে গেয়ে একেবারে নিষ্প্রাণ করে ছেড়েছিলাম আমরা, সেই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়তেই সে কিভাবে খাড়া হয়ে উঠে বসল, সে-বৃত্তান্ত সবাইকারই জানা।

আমাদের জীবনমন্ত্রকে এই অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। 'দেবা বৈ মৃত্যোর্ বিভ্যতস্ ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্, তে ছন্দোভির্ আত্মানম্ অচ্ছাদয়ন্,' বলেছেন ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (১।৪।২), অর্থাৎ দেবতারা মৃত্যু থেকে ভয় পেয়ে ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবেশ করলেন, তাঁরা ছন্দ দিয়ে নিজেদের ঢাকলেন।' এই বর্ণনাটি শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। আমাদের

জাতীয় জীবনের মহামৃত্যুর স্বরূপ দেখে তিনি ব্যথিত সন্ত্রস্ত বিচলিত হয়ে তার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে অন্তরের আলো অনুসরণ করে প্রবেশ করলেন ত্রয়ী বিদ্যায়। তাঁর ক্ষেত্রে এ ত্রয়ী হল ঋগ্বেদ উপনিষদ্ আর গীতা। লিখলেন 'বেদরহস্য' (Secret of the Veda) এবং বেদের ৬৩টি সূক্তের অনুবাদ ; 'উপনিষদষ্টক' (Eight Upanishads), 'ঈশ', 'কেন', আর 'গীতা প্রবন্ধ' (Essays on the Gita)। এই মহাজ্ঞানকে সমস্ত পৃথিবীর পটভূমিকার ওপরে দাঁড় করিয়ে আঁকলেন সমস্ত মনুষ্যজাতির দিব্যনিয়তির একটি কল্পচিত্র 'দিব্যজীবন' (The Life Divine) আর সেই দিব্যজীবন লাভের উপায় নির্দেশ করলেন 'যোগসমন্বয়ে' (The Synthesis of Yoga)। সমাজে আর রাষ্ট্রে এই দিব্য নিয়তি আস্তে আস্তে কী রূপ নিচ্ছে-নেবে তার হদিশ দিলেন 'মানব-বর্তনি' (The Human Cycle) আর 'বিশ্ব একনীড়' (The Ideal of Human unity) গ্রন্থে। আর এই সবকিছু ঘিরে জড়িয়ে ওতপ্রোত করে দিয়ে দিলেন একটি অপরূপ ছন্দের আলো-আবরণ, যার আঁচল হল মহাকাব্য সাবিত্রী। ঋষি বিশ্বামিত্র বলেছেন সনাতনী চিরযৌবনা সাত বোন সপ্ত বাণীর কথা, যারা একই সঙ্গে অ-বসনা আর অনগ্না, নিজেদের ঢাকেনি অথচ ঢেকেছে, ঋষির হৃদয়ের জ্যোতির্জরায়ুতে যারা ধারণ করে আছে একই গর্ভকে, সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীর্ একং গর্ভং দধিরে সপ্ত বাণীঃ (ঋ ৩।১।৬)। ঋষি অরবিন্দেরও এই চিরন্তনী স্থিরযৌবনা রহস্যাবৃতা অনাবৃতা সপ্ত বাণী—বেদভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, গীতা ভাষ্য, দিব্যজীবনদর্শন, যোগসমন্বয়, সমাজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর কাব্য। তারা একযোগে ধারণ করে আছে একটি গর্ভকে, বিশ্বব্যাপী প্রলয়পয়োধি-জলে ভাসমান একটি হিরণ্যগর্ভকে—মানুষের ভবিষ্যৎ।

অনেক শতাব্দী আগে বেদের সরস্বতী দুর্বোধ্যতার মরুপথে এমনি করে আর একবার হারাতে বসেছিল। তখন মেয়েদের বেদ

পাঠ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, শূদ্রদের বেদাধিকার নেই, দ্বিজরাও সবাই বেদ পড়ে না'শোনে না। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা, স্ত্রীলোক শূদ্র আর কুব্রাহ্মণ এদের কানে বেদ যায় না। অর্থাৎ সমাজের একটা বিরাট অংশ, হয়তো শতকরা ৯০ ভাগ কি তার চেয়েও বেশি, জাতির সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফসল থেকে যে কারণেই হোক বঞ্চিত। তখন বড়রা বিধান দিলেন, ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থম্ উপবৃংহয়েত্, ইতিহাস আর পুরাণ দিয়ে বেদের অর্থকে ফলাও কর। আরম্ভ হল বেদের ভাবকে অন্তরে রেখে ভাষান্তরীকরণ। মহাভারতে, আঠারটি পুরাণে, আরো অজস্র উপপুরাণে অনেক শতাব্দী অনেক পুরুষ ধরে চলল এই প্রক্রিয়া। মাটির মর্মমুল পর্যন্ত পৌঁছল বেদের রস, উচ্চতম নিম্নতমকে স্পর্শ করল, আকাশ পাতালে গিয়ে মিশল, নীলাম্বর নীলাম্বুকে চুম্বন করে দুয়ে মিলে একাকার হয়ে গেল। সেই রস পান করে পুষ্ট হল মহাভারতের অরণ্যানী, পুরাণের 'জনস্থান' মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি, লোকসাহিত্যের 'চলন' বিল। ভরা আসরে দুর্গাপ্রতিমার রূপ রসিয়ে রসিয়ে কানে-মনে-মরমে পশিয়ে পশিয়ে গেয়ে শেষকালে গোবিন্দ অধিকারী যখন মন্তব্য গেয়ে উঠলেন, 'ধরলে পরে জ্ঞানের বাতি মিশায় গিয়ে ওঙ্কারে', তখন তাঁর বিমুগ্ধ শ্রোতাদের দলে বসে মাথা নাড়লেন মাণ্ডুক্য মুণ্ডক কঠ ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক সবাই।

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে দিয়ে বেদোদ্ধরণের আর একটি নতুন পর্ব সুরু হয়েছে। এদেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর দ্বিজত্বলিপ্সু পুনর্জন্মেচ্ছু উত্তম অধিকারী উৎকর্ণদের কানে মন্ত্র ঢেলেছেন তিনি—নবজীবন-বেদের মন্ত্র, পরিয়েছেন কবচ-কুণ্ডল। প্রদেশের এবং এদেশের ভৌগোলিক সীমা পেরোতে হবে, সনাতনকে রূপটান মাখিয়ে সর্বজনের চৈতন্যের দরজায় পৌঁছে দিতে হবে, তাই তাঁর বেদসরস্বতী আশ্রয় করেছিল বিশ্বের সর্বাধিক জনবোধ্য ভাষা ইংরিজিকে। বিধাতা

তাঁকে সেইভাবেই তৈরি করেছিলেন। বৃহস্পতির স্পর্শে ইংরিজি ভাষা রাতারাতি পরার্ধপতি হল। তার ঐশ্বর্যের সীমা পরিসীমা রইল না। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ মহিমা আর সমুদ্রের মহাবিস্তার এসে মিলন তার মধ্যে, সে ঋষিত্ব লাভ করল, দুলে উঠল আকাশ পাতাল জোড়া মহাপ্রেঙ্খায় 'য ঈ˜ঙ্খয়˜ন্তি পর্বর্তান্ তিরঃ˜ সমু˜দ্রমর্ণবম্˜ (ঋ ১।১৯)……। সে হল সংস্কৃত ইংরিজি, বৈদিক ইংরিজি। পূর্ব আর পশ্চিম দুই সমুদ্রের অতলে অবগাহন করে আগামী পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে দাঁড়ালেন শ্রীঅরবিন্দ।

এখন এই মানদণ্ডকে মাপবে কে?

এর যে প্রান্তটি পূর্বসমুদ্রে অবগাহন করে আছে, তার দার্শনিক পটভূমিকাটি পরম নৈপুণ্যে পুনরাবিষ্কার করেছেন এযুগের সর্বদর্শন সংগ্রহকার মহামনীষী শ্রীঅনির্বাণ। তাঁর Life Divine এর অনুবাদ 'দিব্যজীবন' যেন চেনাচেনির, জোড়-মেলানোর এক আশ্চর্য অপরূপ খেলা। সেই বৈদিক যুগ থেকে সুরু করে এই অতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত এদেশের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে অনুভবের দানা জমে জমে যত পরিভাষা তৈরি হয়েছে সব যেন তাঁর নখদর্পণে ধরা আছে। শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষা এবং ভাষা যত কঠিন, আপাতদৃষ্টিতে যত দুর্বোধ্যই হোক না কেন, তিনি ঠিক তার প্রতি-ধ্বনিটি খুঁজে বার করে জোড় মিলিয়ে দিয়েছেন। ধরা পড়ে গিয়ে ইংরিজির আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বাক্। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিই—

The bud of the third is love which seeks both to possess and be possessed, to receive and to give itself (The Double Soul in Man, Vol. I, P. 263)—এর অনুবাদ হল, 'তৃতীয় পর্বে জাগল প্রেমের কোরক—যুগপৎ আত্মসাৎ আর আত্মদান করবার প্রবৃত্তিতে সমঞ্জসা রতি ফুটল যার মধ্যে।' To possess and be possessed এই ভাবটিকে বৈষ্ণব পরিভাষা

'সমঞ্জসা রতি'র সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। তাঁর দৌত্যে অরবিন্দ-ভাষা একমুহূর্তে ইংরিজি কঞ্চুক ছেড়ে ভারতীয় নীলাম্বর পরিধান করল।

And this is what we have described as the fourth status of Life in its ascent towards the Godhead (the Problem of Life, Vol. I, P. 262)—এই 'দিব্য জন্ম ও কর্মের' সাধনাকেই আমরা বলেছি 'ব্রহ্মণঃ পথি বিততঃ' বিশ্ব-প্রাণের উদয়নীয় যজ্ঞের তুরীয় পর্ব।' ব্রাহ্মণ, গীতা (৪।৩২) এবং অরবিন্দ-বাণীকে একসূত্রে গ্রথিত করে দিব্যজীবন-রহস্য এবং যজ্ঞরহস্য একই সঙ্গে উদ্ভাসিত করে দেখালেন, দুটিই এক। তাঁর দিব্যজীবন, দিব্যজীবনপ্রসঙ্গ, যোগসমন্বয়প্রসঙ্গ এবং সাবিত্রীব্যাখ্যান (অপ্রকাশিত) এই চারে মিলে অরবিন্দভাষ্যের চারটি প্রধান স্তম্ভ রচনা করেছে।

শ্রীঅরবিন্দের আজীবন সহচর সহযোগী অন্তরঙ্গ ও উত্তরসাধক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের বিবিধ রচনা ও অনুবাদ অরবিন্দবাণীসৌধের প্রবেশদ্বারস্বরূপ। তাঁর সাম্প্রতিক অনুশীলন—ঋগ্বেদের সূক্তগুলির বাংলা অনুবাদ ও গূঢ়ার্থব্যাখ্যান—সব দিক থেকেই অমূল্য। বিশেষ করে কবি অরবিন্দের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্যে তাঁর ও শ্রীশেঠনার কাছে আমরা ঋণী। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যসঙ্কলনের ভূমিকায় নলিনীকান্ত লিখেছিলেন, 'শ্রীঅরবিন্দ একসময়ে বলেছিলেন তিনি সর্বাগ্রে এবং মুখ্যত কবি ও রাজনীতিক, যোগী তিনি হয়েছেন পরে। এই উক্তিকে অনায়াসে একটু বদলে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে তিনি যখন রাজনীতিক হন নি, তখনো তিনি ছিলেন কবি। কবি হয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তিনি একজন জাতকবি। শ্রীঅরবিন্দের এই দিকটা একটি ছোট অন্তরঙ্গ গোষ্ঠির বাইরে বড় একটা কেউ জানে না' (অনুবাদ)।

ভারতবর্ষের সুষুম্নার বজ্রানী-নাড়ী হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ। এই বজ্রকে ভেদ করার শক্তি সুলভ নয়। যে-বিদ্যুৎ থেকে এই বজ্রের

উদ্ভব সে হল তাঁর পরাবর-পারাবার-বিলাসী-কবিচিত্ত। তাতে প্রবেশ করাও সহজসাধ্য নয় মোটেই। কিন্তু রামকৃষ্ণকথামৃত, জাতক মালা বা যীশুর রূপককথার আপাতসহজতার চোরা জোয়ার সামলে সাঁতরে পারে ওঠাও কি সহজ ?

অর্থগৌরব গুরু কবি ভারবির টীকাকার মল্লিনাথ বলেছেন, ভারবির বচন নারিকেলের মতো, বাইরে শক্ত খোল, ভেতরে জল টলটল। এই আমি তা ভেঙে দিলাম, এখন রসিকরা তার স্বাদুরস যথেচ্ছ পান করুন।

শ্রীঅরবিন্দের সপ্তবানী—গভীর সুরে গভীর কথা—র নারিকেল তাঁর মল্লিনাথেরা কিছু কিছু ভেঙে দিয়েছেন, বিদগ্ধ রসিকেরা তার অতিস্বাদু রস যথেচ্ছ পানও করেছেন। এখন সেই রস চলকে যাতে মাটিতে পড়ে, তাঁর শততম জন্ম জয়ন্তী উৎসবে তার ব্যবস্থা করা হোক। পাত পেড়ে বসে আছি আমরা সবাই।

*

পূর্ণযোগের তাৎপর্য

অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরী

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার যোগের নাম দিয়াছেন পূর্ণযোগ (Integral or Synthetical Yoga)। শ্রীঅরবিন্দ-যোগের যা-কিছু বৈশিষ্ট্য এই 'পূর্ণযোগ' কথাটার সম্যক্ বিশ্লেষণ করিলেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ণযোগের লক্ষ্য হইল পূর্ণ সত্যের অখণ্ড অনুভূতি। ঐ অখণ্ড সত্যানুভূতির আলোতে দেখা যায় যে কর্ম ও জ্ঞান দুই-ই সত্য, জগৎ ও ব্রহ্ম দুই-ই সত্য, জীবন ও নির্বাণ দুই-ই সত্য। তাই পূর্ণযোগের চেষ্টা হইল জ্ঞানের যূপকাষ্ঠে কর্মকে বলিদান করা নয়, জ্ঞানের আলোতে কর্মকে রূপান্তরিত করা; ব্রহ্মলাভের আগ্রহে জগৎকে উপেক্ষা করা নয়, ব্রহ্মের বলে বলীয়ান হইয়া জগতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করা; নির্বাণের অধীর আকঙ্খায় জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত করা নয়, নির্বাণলব্ধ প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তিতে পার্থিব জীবনকেই অমৃতময় করিয়া তোলা। ভারতের বিভিন্ন যোগ সাধনায় যে সব খণ্ড সত্য প্রেরণা যোগাইয়াছে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাপক আত্ম-উপলব্ধির মধ্যে তাহাদের চরম পরিণতি ও সার্থকতা লাভ হয়। তাই পূর্ণযোগের বাণী হইল এক মহা সমন্বয়ের বাণী। অধ্যাত্ম-সাধনার বিভিন্ন ধারা, মানুষের উর্ধ্বমুখী কর্মপ্রচেষ্টার বিচিত্র গতিবেগ, পূর্ণযোগের সমন্বয়মূলক সাধনার মধ্যে আসিয়া সম্মিলিত হয়।

যোগ বলিতে আমরা একদিকে যেমন বুঝি জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা লাভের অবস্থা, অপরদিকে আবার বুঝি সেই সাধনপ্রণালী যাহার সহায়ে চরম আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা যায়। লক্ষ্য ও পথ, উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী এই উভয়দিক হইতেই পূর্ণযোগ এক আশ্চর্য

সমন্বয় সাধন করিয়াছে। আমাদের প্রাচীন যোগপন্থাগুলি সত্যকে যেন ঠিক সমগ্রভাবে লাভ করিতে পারে নাই, আংশিকভাবে পাইয়াছে, অনেক সময় পরস্পরবিরোধী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিয়াছে। মাঝে মাঝে একটা সমগ্র দৃষ্টি নামিয়া আসিলেও সাধনার বাস্তবক্ষেত্রে যেন তাহা অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে। পাতঞ্জলযোগে যখন বলা হইল—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, তখন পতঞ্জলি সত্যকে এক নির্গুণ নির্বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন। তিনি এমন এক অবস্থার সন্ধান দিলেন যেখানে জীবনের সমস্ত কর্ম-কোলাহল স্তব্ধ হইয়া যায়, যেখানে পৌঁছিলে প্রকৃতি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যায়, এবং যেখানকার নিস্পন্দ নিষ্ক্রিয় অবস্থা আত্মাকে আপনার মধ্যেই মগ্ন করিয়া রাখে। শঙ্করাচার্যও এরূপ এক নির্গুণ অবস্থারই সন্ধান দিলেন; শঙ্করের "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" বিশ্বের কর্মপ্রবাহের অতীত এমন এক অবস্থা যেখানে পৌঁছিলে জীবনটা এক মায়ামরীচিকায় পরিণত হয়, কর্মের অথবা ভক্তির আর কোন অবকাশ থাকে না। কর্মের অবকাশ থাকে না, কারণ কর্মের উদ্দেশ্য জীবনকে সমৃদ্ধ করা, কিন্তু ব্রহ্মবিদের নিকট জীবন হইয়া পড়ে তুচ্ছ, অলীক, "সুখের স্বপন"। ভক্তিরও সেখানে স্থান নাই, কেননা একমাত্র ব্রহ্ম যেখানে নির্বিশেষ সত্তারূপে বিরাজমান সেখানে কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্ত ও ভগবান সেখানে এক হইয়া গিয়াছেন। শুধু সত্তার দিক হইতে নয়, ক্রিয়া বা প্রকাশের দিক হইতেও ভক্ত ভগবানের বিভেদ মায়াবাদে অস্বীকৃত। বুদ্ধদেবের নির্বাণ বা পরিনির্বাণ মায়াবাদীর ব্রহ্মবিলয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কিছু নয়। অবশ্য শঙ্করপন্থী যেখানে পারমার্থিক সত্তাকে জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, বুদ্ধ সেখানে এক মহাশূন্যেরই শুধু ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের শেষ কথা "অনির্বচনীয় অবাঙমনসোগোচরঃ", আর বুদ্ধও শূন্য অর্থে বুঝিয়াছেন এমন এক

অবস্থা—অবশ্য তাহা পরমজ্ঞান ও পরম আনন্দেরই অবস্থা—যাহা আমাদের বুদ্ধি মনের নিকট এক অনন্ত অনধিগম্য শূন্যতা, যে শূন্যতাকে বা দুর্জ্ঞেয় অনন্তকে প্রকাশ করিবার একমাত্র ভাষা মৌন।

পতঞ্জলি, শঙ্কর, বুদ্ধ প্রভৃতি যেমন সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন এক নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ অবস্থায়, রামানুজ, বল্লভ, চৈতন্য প্রভৃতি আবার সত্যের অনন্তগুণসম্পন্ন বিচিত্রলীলাময় রূপ দেখিয়া ভক্তি ও আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সত্য-উপলব্ধি অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। মানুষের বুদ্ধি যেমন ভগবানকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয়রূপে দেখিতে চায়, তাহার ভোগপিপাসু প্রাণ ও কর্মপ্রবৃত্তিও তেমনই ঈশ্বরকে সগুণ লীলাময়রূপেই পাইতে চায়। বুদ্ধির দাবী যেমন উপেক্ষা করা যায় না, প্রাণের ক্ষুধাও তেমনই অগ্রাহ্য করা কঠিন। প্রাণের দাবী উপেক্ষা করিয়া একমাত্র বুদ্ধিকে মানিয়া লওয়া অথবা বুদ্ধিকে অস্বীকার করিয়া শুধু প্রাণাবেগের নিকট আত্মসমর্পণ করা, এ উভয়ই সত্যের আংশিক অনুভূতি এবং একদেশদর্শিতা। তাই শ্রীঅরবিন্দ গীতা ও উপনিষদের গভীরতম অনুভূতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ভগবান নির্গুণ হইয়াও গুণী "নির্গুণো গুণী" নিষ্ক্রিয় হইয়াও সক্রিয়। পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম নির্গুণ ও গুণী, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় এই উভয় অবস্থাই অতিক্রম করিয়া এক পরম রহস্যময় সত্তা, কিন্তু তিনিই আবার যুগপৎ বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশিত হইয়া আপনার যোগৈশ্বর্য বিস্তার করিয়াছেন। সত্যকে এরূপ সমগ্রভাবে দেখিলে আমরা এক ব্যাপক সমন্বয়ের দৃষ্টি লাভ করিব, যাহার ফলে আমাদের সত্তার প্রত্যেক অঙ্গ এক দিব্য সার্থকতায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

পূর্ণযোগ যেমন সত্যকে সগুণ, নির্গুণ ও তদতিরিক্ত সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এবং পরাৎপর, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম এই সকল অবস্থায়ই উপলব্ধি করিতে চায়, এক হইতে অপরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অথবা একের নিকট অপরকে

বলিদান করিয়া নহে, সকলকে একই অখণ্ড সত্যের বহুলপ্রকাশ রূপে, তেমনই আবার ব্রহ্মকে দেখিতে চায় শুধু তাঁহার বিশ্বাতীত অনির্বচনীয় স্বরূপে নয়, বিশ্বের অন্তরে এবং ব্যক্তিরও অন্তর্যামী রূপে। খৃষ্টধর্মে ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে,—God the Father, God the Holy Ghost এবং God the Son. শ্রীঅরবিন্দের মতে ইহারা ভগবানের বিশ্বাতীত (Transcendental), বিশ্বগত (Cosmic or Universal) এবং ব্যষ্টিরূপী (Individual) বিভিন্ন অবস্থান-ভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই নহে। ভগবান যেমন সকল নামরূপ অতিক্রম করিয়া নিজের স্বরূপে অবস্থিত এক বিরাট রহস্য, তেমনই আবার তিনিই নামরূপের মধ্য দিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন আপন আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রেরণায়, এবং তিনিই আবার ব্যক্তির মধ্য দিয়া আপনাকে এক নূতন ছন্দে লীলায়িত করিয়া তুলিতে তৎপর। একদিকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" যেমন সত্য, তেমনি আবার "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "অহং ব্রহ্মোঽস্মি" তাহাও সত্য। প্রাচ্য বিশেষভাবে সাধনা করিয়াছে ভগবানকে তাহার অবাঙ্‌মনসোগোচর সচ্চিদানন্দরূপে উপলব্ধি করিতে, কিন্তু সময় সময় একান্তভাবে ঐ বিশ্বাতিরিক্ত সত্যকেই লাভ করিতে গিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় ছন্দকে উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছে, বিসর্জন দিতে চেষ্টা করিয়াছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে। ওদিকে আবার পাশ্চাত্য ভগবানকে বিশেষভাবে দেখিতে চাহিয়াছে বিশ্বের ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে। কিন্তু ভগবানের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায়, পাশ্চাত্য ভগবানকে হারাইয়াছে নামরূপের কঠিন আবরণের মধ্যে, জীবনের কর্মকোলাহলের মধ্যে, এবং প্রকৃতি ও মানুষকে একান্তভাবে বড় করিয়া যুক্তিবাদ ও বস্তুতন্ত্রের পথে আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বিরুদ্ধ আদর্শের সমন্বয়। ভগবান সব কিছু অতিক্রম করিয়াও আবার সব কিছুর মধ্যে প্রকট হইয়াছেন আপনাকে এক

নূতন ছন্দে প্রকাশ করিতে। বিশ্ব সেই আত্মপ্রকাশের আয়তন, আর ব্যক্তি সেই আত্মপ্রকাশের কেন্দ্র। ভগবানকে এরূপ পূর্ণভাবে বা সমগ্রভাবে দর্শন করাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। পূর্ণযোগীর আকাঙ্ক্ষা অনন্তের সহিত যুক্ত হইয়া অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হওয়া আবার অনন্তশক্তির যন্ত্র হইয়া দিব্যকর্মের প্রবাহে বিশ্বকে এক দিব্যধামে পরিণত করা। পূর্ণযোগীর জীবনে একদিকে থাকিবে প্রাচ্যের আত্মপ্রতিষ্ঠ শান্ত সমাহিতভাব, অন্যদিকে আবার থাকিবে পাশ্চাত্যের অবিরাম অক্লান্ত কর্মতৎপরতা। ঐ কর্মের প্লাবন প্রকৃতিকে মানুষের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োজিত করিবে না, উহাকে এক দিব্য রূপান্তরের পথে লইয়া যাইবে।

আমাদের দেশে মুক্তির নানাবিধ কল্পনা আছে। ভক্তিমার্গের উপাসক যাঁহারা তাঁহারা চান সালোক্য বা সামীপ্য মুক্তি। ভক্ত-হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্খা হইল প্রকৃতির মোহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া আরাধ্য দেবতার সান্নিধ্যলাভে জীবনকে সার্থক করিয়া তোলা, তাঁহার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া সেই দিব্য আনন্দলোকে অবস্থান করা। ভক্তের চক্ষে কর্ম যেমন সংসার বন্ধনের কারণ, নিছক জ্ঞানও তেমনই একটা শুষ্কতা বা শূন্যতারই পথপ্রদর্শক। অহেতুকী ভক্তিই শুধু দিতে পারে অনাবিল অফুরন্ত আনন্দ—ভগবদ্ লাভের আনন্দ, ভগবদ্ সেবার আনন্দ এবং ভগবদ্ সাহচর্যের আনন্দ। জ্ঞানযোগী কিন্তু চান সাযুজ্য মুক্তি। অজ্ঞানপ্রসূত জীবনযাত্রার তুচ্ছ অসারতা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের সহিত একাঙ্গ হইয়া অনন্তের বুকে ফুটিয়া উঠা, অথবা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, জ্ঞানযোগীর মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞানীর চোখে কর্মের উৎস অবিদ্যা, আর জ্ঞানবিহীন ভক্তি শুধু হৃদয়ের অন্ধ উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ। প্রজ্ঞান বা পরাবিদ্যাই শুধু জীবনকে এক দিব্য আলোকে পূর্ণ করিয়া অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত

করিতে পারে। কর্মযোগীর আদর্শ আবার সম্পূর্ণ পৃথক। ব্রহ্মের নির্ব্যক্তিক সত্তায় আপনাকে নিমজ্জিত করা, অথবা জীবনের কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসান্নিধ্যে অনন্তকাল অতিবাহিত করা, ইহার কোনটাই কর্মযোগীর নিকট কোন আকর্ষণ বিস্তার করে না। কর্ম-যোগীর লক্ষ্য হইল সাধর্ম্য বা সাদৃশ্য মুক্তি। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়া ভগবানের স্বধর্ম বা সত্যধর্ম লাভ করা, তাঁহার পূর্ণতাকে নিজের জীবনে ফলাইয়া তোলা, ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সর্বতোভাবে অনন্তের ইচ্ছাধীন করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার হাতে যন্ত্রস্বরূপ হওয়া—কর্মযোগীর একমাত্র কামনা।

শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন যে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সত্যকার কোন বিরোধের অবকাশ নাই। জ্ঞান যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন দেখা যায় যে সেই পূর্ণজ্ঞান হইতেই ফুটিয়া উঠে পরাভক্তি, আবার পূর্ণজ্ঞান হইতেই উৎসারিত হয় সেই দিব্য কর্ম যাহা পৃথিবীকে ঢালিয়া সাজিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, যাহা এক নূতন সৃষ্টির নূতন অভিব্যক্তির জন্ম দেয়। প্রাচীন জ্ঞানযোগে কর্মের তেমন কোন স্থান ছিল না; কর্মের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল শুধু পাপক্ষয় বা আত্ম-শুদ্ধির জন্য। পূর্বসংস্কার সব দূরীভূত হইয়া শুদ্ধজ্ঞানের যখন উদ্ভব হয়, কর্ম তখন আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে, কারণ জ্ঞানের প্রজ্বলিত বহ্নিতে কর্মের মূল উৎস ভোগতৃষ্ণা বা বাসনা কামনা সব নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়। আবার এই জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃত ভক্তিরও কোন সঙ্গতি থাকিতে পারে না। জ্ঞানযোগী সত্যকে এক নির্বিশেষ সত্তারূপে উপলব্ধি করেন। জীবের সহিত জীবের ভেদ, জীবের সহিত জগতের ভেদ, ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগতের ভেদ, এই সর্বপ্রকার ভেদই সেখানে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়, থাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ অনন্ত সত্তা আর যোগীরও ব্যক্তিত্বের অবসান হইয়া বিলয় প্রাপ্তি হয় সেই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ সত্তার মধ্যে। এখানে আর ভক্তির স্থান

কোথায় ? ভক্ত ও ভগবানের কোন পার্থক্যই যেখানে স্বীকৃত হয় না, ভক্তি সেখানে অর্থহীন। অথচ ভক্তির অভাবে আমাদের সত্তার একটা প্রধান অংশ অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। এখানেই মায়াবাদের গলদ। শ্রীঅরবিন্দের মতে ভগবান অদ্বিতীয় হইয়াও বহু, অথবা অদ্বিতীয় বলিয়াই তাঁহার বহুল প্রকাশ। প্রকৃত অখণ্ডতা তাহাই, অনন্ত বহুত্বও যাহাকে বিভক্ত করিতে পারে না, যে অখণ্ডতা সহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াও আপন অদ্বৈত রূপ অক্ষুণ্ণ রাখে। সত্তার দিক হইতে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেও প্রকাশের দিক হইতে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশস্বরূপ। তাই জীব ও পুরুষোত্তমের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য ভক্তিবন্ধন চিরকালই বিদ্যমান। তাহা হইলে দেখা গেল যে, জ্ঞান ভক্তির বিরোধী হওয়া দূরে থাক পরা বা বিশুদ্ধ ভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। কর্মের সহিতও জ্ঞানের এইরূপ নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান। কর্মের প্রকৃত চরম উৎস বাসনা কামনা নয়, ভগবানের ইচ্ছাশক্তি, পরাপ্রকৃতি বা মহামায়ার ইঙ্গিত। অজ্ঞানের স্তরে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া সেই ভাগবদিচ্ছাই বিকৃত হয় ভোগ-বাসনারূপে। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা এবং অজ্ঞানপ্রসূত সকল কামনা নির্মূল করিয়া যে যোগী সমগ্রভাবে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহার মধ্য দিয়া মঙ্গলময়ের ইচ্ছা অব্যাহতভাবে কাজ করিবার সুযোগ পায়। ফলে কর্মস্রোত এক নূতন খাতে বহিতে থাকে, কর্মজীবনে এক দিব্যধারার প্রবর্তন হয়। ভগবান নিজে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইয়াও নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মরত। পূর্ণযোগের সাধকও তেমনই অন্তরে নিয়ত নিশ্চল আত্মপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু বাহিরে তাহার মধ্য দিয়া অবিরাম কর্মস্রোত বহিয়া যায়, ভগবানের লীলাময়ী শক্তি আপন ইচ্ছামত তাহার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং পূর্ণযোগীর মুক্তি হইবে যুগপৎ সাযুজ্য, সালোক্য ও সাধর্ম্য মুক্তি। পূর্ণযোগী উপলব্ধি করিবেন যে ভগবানের সত্তার সহিত তিনি একাঙ্গ, আবার

ভগবানের সহিত তুরীয়ধামে অবস্থান করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যে তাঁহার সেবার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মগ্ন থাকিবেন, আবার ভগবানের স্বধর্মপ্রাপ্ত হইয়া অন্তরে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় হইয়াও বাহিরে হইবেন নিয়ত কর্মরত। পূর্ণযোগীর জীবনে জ্ঞান হইবে কেন্দ্রস্থল ; জ্ঞানের ভিত্তিতে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ ভক্তি বিকশিত হইবে, তেমনই আবার অপ্রতিহত দিব্য কর্মের উৎস খুলিয়া যাইবে।

পূর্ণযোগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার লক্ষ্য শুধু, দেহ, প্রাণ ও মনের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এক পরম সমাধির অবস্থা লাভ করা নয়, সমগ্র সত্তাটির সহায়ে ভগবানকে উপলব্ধি করা, আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে—দেহে, প্রাণে, মনে—তাঁহার আনন্দ-ঘন রূপকে প্রতিষ্ঠা করা। পূর্ণযোগে তাই আরোহণের (ascent) সঙ্গে সঙ্গে অবরোহণের (descent) প্রয়োজন আছে। একদিকে যোগী যেমন উঠিয়া যাইবেন অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সমুচ্চশিখরে, পক্ষান্তরে আবার তুরীয়লোক হইতে সচ্চিদানন্দের বিজ্ঞান শক্তিকে নামাইয়া আনিয়া কার্যকরী করিবেন আমাদের সত্তার নিম্ন স্তরসমূহে। ইহার ফলে দেহ, প্রাণ ও মনেরও এক অপূর্ব রূপান্তর ঘটিবে, সমগ্র সত্তাটি ভাগবতছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিবে, মানুষের মধ্যেই জন্ম নিবেন ভগবান তাঁহার বিচিত্র ঐশ্বর্য লইয়া। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, পূর্ণযোগীর উদ্দেশ্য শুধু মুক্তি নয়, শুদ্ধি, ভুক্তি ও সিদ্ধিও বটে। প্রথম উদ্দেশ্য মুক্তি, কারণ ত্রৈগুণ্যময়ী অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সন্ধান পাওয়া, সচ্চিদানন্দের সন্দর্শন লাভ অসম্ভব। কিন্তু পূর্ণযোগী চান তাঁহার সত্তার সমস্ত স্তর, অচেতনের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত, ঊর্ধ্ব-লোকের শক্তির সহায়ে পূর্ণভাবে শুদ্ধ করিয়া তুলিতে, কেননা আধার সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে ভগবান তাহাতে নামিয়া আসিবেন কিরূপে? ঊর্ধ্বের শক্তিকে বহন করিবার জন্য যে সামর্থ্যের যে যোগ্যতার

প্রয়োজন শুদ্ধি হইতেই তাহার উদ্ভব হয়। অশুদ্ধ আধার ভাগবতী শক্তির প্রথম স্পর্শেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তারপর আসে সিদ্ধি ও ভুক্তি। অর্থাৎ আধার শুদ্ধ হইলে সত্তার বিভিন্ন স্তরে সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠা হয়; যেখানে যত দুর্বলতা অক্ষমতা, সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া এক নূতন সৃষ্টির অভ্যুদয় হয়; এবং সাধক আনন্দঘনকে উপভোগ করেন শুধু বিশ্বের বাহিরে এক ঊর্ধ্বলোকে নয়, সৃষ্টির প্রতি অঙ্গে, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক ঘটনার অন্তস্তলে। সাধকের চক্ষে তখন পৃথিবীর প্রতি অণু পরমাণু এক দিব্যরসে ভরিয়া উঠে, সমগ্র বিশ্ব দেখা দেয় ভগবানের লীলানিকেতনরূপে।

মুক্তি, শুদ্ধি, সিদ্ধি ও ভুক্তি—পূর্ণযোগের এই চতুর্বিধ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিকে লইয়া নয়, সমগ্র বিশ্বমানবকে লইয়া। ভগবানে তুরীয় বা বিজ্ঞানশক্তিকে নামাইয়া আনিয়া মানুষের জাগ্রত চেতনায় প্রতিষ্ঠা করা, এবং তাহার সাহায্যে সমগ্র সত্তার রূপান্তর সাধনের অর্থই হইল প্রকৃতির বিবর্তন-ধারার মধ্যে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে নিরন্তর কাজ করিতেছে তাহাকে সার্থক করিয়া তোলা। প্রকৃতির মধ্যে দেখিতে পাই যে ক্রমোন্নতির ফলে চেতনার উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির বিকাশ সাধন হইতেছে। এই অভিব্যক্তি-ধারার প্রথম অবস্থা অচেতন জড়, পরবর্তী অবস্থা অবচেতন বা মগ্নচেতন উদ্ভিদ্, তাহারও পর দেখা দিল অর্ধচেতন পশুপক্ষী এবং সর্বশেষে আবির্ভূত হইয়াছে চেতনার মানসশক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি মানব। এইবার মানুষের ঊর্ধ্বমুখী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার সহায়ে ব্যাপকভাবে চেষ্টা চলিয়াছে চেতনার ঊর্ধ্বতর রূপকে, ভগবানের অতিমানস শক্তিকে নামাইয়া আনিয়া প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে। এই প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইলে এক নবসৃষ্টি সূত্রপাত হইবে, মানুষের মধ্য হইতে অভ্যুদয় হইবে অতিমানবের। মানুষ হইতে অতিমানবের জন্ম, জড় হইতে উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদ হইতে

প্রাণীর যে জন্ম তাহা হইতে অনেকাংশে পৃথক। মানবসৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত নিম্নস্তরসমূহে প্রকৃতি কাজ করিয়াছে সম্পূর্ণভাবে আপন ইচ্ছায়, আপন উদ্দাম গতিবেগে, সৃষ্টবস্তুর নিকট হইতে কোন সহযোগের অপেক্ষা না রাখিয়া। কিন্তু মানুষ আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তাই মানুষের সজ্ঞান সহযোগ ব্যতীত মানুষের সত্তাকে রূপান্তরিত করিয়া কোন মহত্তর বৃহত্তর সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এইজন্যই চাই যোগ—ভগবানের সহিত মানবাত্মার যোগ, ভাগবতী শক্তির লীলাছন্দের সহিত মানুষের সচেতন ইচ্ছা আস্পৃহার যোগ। এই যোগের ফল হইবে শুধু মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, মানবসঙ্ঘের মুক্তি। অতিমানবত্বের বিকাশ মানুষের সমষ্টি-চেতনার মধ্যে এক দিব্য জীবনের স্পন্দনের সূচনা করিবে। প্রাণীজগতে আমরা বহুধা আত্মবিভাজনের নীতি দেখিতে পাই (Law of Self-multiplication); জীব সন্তানের মধ্য দিয়া নিজেকে বহুত্বে প্রকাশ করে। অধ্যাত্মিক জগতেও অনুরূপ নীতি কার্যকরী। একজন মাত্র যোগী যদি অতিমানসশক্তিকে নিজের মধ্যে শাশ্বতভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, এবং সেই শক্তির সহায়ে তাঁহার সত্তার অচেতন স্তর পর্যন্ত দিব্য ছন্দে রূপান্তরিত করিতে পারেন, তবে অতি সহজেই এই নবজীবনের তরঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়া নব নব কেন্দ্রে দেবজন্মের সহায়তা করিবে।

পূর্ণযোগের ফল যেমন বিচিত্র ও অখণ্ড ইহার সাধন-পদ্ধতিও তেমনই এক মহাসমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে বহুপ্রকার যোগপন্থার জন্ম হইয়াছে। হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, তান্ত্রিকযোগ প্রভৃতি প্রত্যেক যোগমার্গই সত্যকে এক বিশেষ উপায়ে উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। অনেকের মতে এই সকল বিভিন্ন যোগপদ্ধতি একই গন্তব্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ। আমরা যে পথেই যাত্রা সুরু করি না কেন অবিচলিত

হইয়া একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইলে অখণ্ড সত্যস্বরূপ ভগবানের সাক্ষাৎ-কার লাভ করিব। কথাটা ঠিক, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নহে। আধ্যাত্মিক জীবনে পথ ও গন্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরস্পর নির্ভরশীল। সত্য এক হইয়াও অনন্তরূপী, বিচিত্র,—অখণ্ড হইয়াও বহুল প্রকাশময়। সত্যকে আমরা কিরূপে দর্শন করিব, ভগবানকে তাঁহার কোন্ বিশেষ অবস্থায় উপলব্ধি করিব তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদের সাধন পদ্ধতির উপর। সাধক যে ভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করেন, ভগবান সে ভাবে সে রূপেই তাহার নিকট আবির্ভূত হন। তাঁহাকে সমগ্রভাবে জানিতে ও পাইতে হইলে সাধন-ধারার মধ্যেও একটা ব্যাপক সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ এইরূপ এক সমন্বয়মূলক যোগপন্থারই সন্ধান দেয়। হঠযোগ চায় দেহের মধ্যে ভগবানের স্পর্শ লাভ করিতে। কায়াশুদ্ধির দ্বারা ভগবানের অমৃতত্বের আস্বাদন করা এবং দেহকে অনন্তশক্তি ধারণের যোগ্য করিয়া তোলা হঠযোগীর উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দ কায়াশুদ্ধি বা কায়িক-সিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, ভক্তিযোগী অথবা জ্ঞানযোগীর মত দেহকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করেন না। কিন্তু হঠযোগী দেহকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিবার ফলে নানারূপ যোগৈশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবানকে হারাইতে বসেন। পূর্ণযোগী দেহের সিদ্ধি চান তাঁহার নিজের জন্য নহে, ভগবানের জন্য; দেহের সম্যক রূপান্তরের মধ্য দিয়া ভগবানের আত্মপ্রকাশ যেন হয় সর্বাঙ্গসুন্দর এবং তাহার কর্ম যেন হয় অপ্রতিহত। সুতরাং যে পরিমাণ কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হঠযোগী অগ্রসর হন, পূর্ণ-যোগীকে সে পথ অবলম্বন করিলে চলিবে না। রাজযোগ প্রাণ-বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারা সুখদুঃখ ভাল-মন্দের অতীত এক নিষ্ক্রিয় কৈবল্য মুক্তি কামনা করে। প্রাণশক্তির সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া এক ভূমানন্দের দিকে অগ্রসর

হওয়া রাজযোগের সাধন-প্রণালী। পূর্ণযোগী মনে করেন যে রাজ-যোগের যাহা উদ্দেশ্য তাহাতে শুধু ব্রহ্মের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অবস্থারই উপলব্ধি হয়, তাহার সগুণ সক্রিয় লীলাময়রূপের বিস্মরণ ঘটে। পূর্ণযোগী চিত্তবৃত্তিকে বিনষ্ট করিতে চান না, লীলাময় ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের উপযোগী করিয়া রূপান্তরিত করিতে সচেষ্ট হন। পূর্ণযোগের সাধনা তাই আরম্ভ হয় নীচ হইতে প্রাণবায়ুর আঘাতে সুপ্তচেতন কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা হইতে নয়, ঊর্ধ্ব হইতে চির-জাগ্রত-চেতন সচ্চিদানন্দময়ীকে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া আবাহন করিয়া। ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ প্রভৃতি যোগপন্থাগুলি হৃদয়াবেগ, জ্ঞানপিপাসা, কর্মপ্রেরণা প্রভৃতি মনের এক একটা বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া মনবুদ্ধির অতীত এক মহামুক্তির অবস্থায় মগ্ন হইতে চায়, মনকে বুদ্ধিকে শুধু সাধনার সোপান হিসাবেই স্বীকার করে। পূর্ণযোগী কিন্তু মনের বিভিন্ন শক্তিকে সাধনার সহায়রূপে ব্যবহার করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চান না, উহাদিগকে সিদ্ধির সামর্থ্যে পূর্ণ করিয়া ভগবানের কাজের জন্য তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিতে যত্নবান হন। মনবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া শুধু সচ্চিদানন্দলোকে উঠিয়া যাওয়া নয়, সচ্চিদানন্দের শক্তিকে নামাইয়া আনিয়া আবার মানসভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা—ইহাই পূর্ণযোগীর লক্ষ্য।

হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগ, এ সকলই বৈদান্তিক যোগের অন্তর্গত, কেননা ইহাদের সকলেরই ভিত্তিভূমি জ্ঞান। বৈদান্তিক যোগসাধনামাত্রেই সাধক সত্তার বিভিন্ন স্তরকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানের আলোকে অগ্রসর হন ভগবানের 'সৎ'-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে, তাঁহার বিরাট সত্তায় নিমজ্জিত হইতে। পুরুষের আপন চেষ্টা ও তপস্যা বৈদান্তিক যোগের প্রাণ। কিন্তু তান্ত্রিক যোগ ভগবানকে শক্তিরূপে উপলব্ধি করিতে চায়। জ্ঞানের পরিবর্তে শক্তিকেই তান্ত্রিক যোগে সাধনার পথপ্রদর্শক হিসাবে মানা হয়,

কেননা তান্ত্রিকের চোখে শক্তি অচেতন জড়াত্মিকা নয়, চিন্ময়ী,— মহাশক্তির চেতনাতেই শিব চিরবিকশিত। তান্ত্রিক তাই নিজের চেষ্টাকেও উৎসর্গ করেন মহামায়ার নিকট এবং মহামায়ার শক্তি তাঁহার মধ্য দিয়া বিচিত্রভঙ্গীতে কাজ করিবার সুযোগ পায়। তান্ত্রিকযোগের এই শক্তি-পূজাকে শ্রীঅরবিন্দ খুব বড় স্থান দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে শক্তির অব্যাহত ক্রিয়াশীলতা ব্যতিরেকে চেতনার আমূল রূপান্তর অসম্ভব ; শুধু নিজের তপস্যায় মানুষ তাহার মানসলোকের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনার প্রধান বিপদ এই যে, সাধক অনেক সময় ভাগবত শক্তিকে নিজের স্বার্থে নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হন, প্রকৃতির উন্মার্গগামী স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অনাচার-কলুষিত হইয়া পড়েন। পূর্ণযোগে তাই প্রথম হইতেই একটা নির্লিপ্ত নিস্পৃহ ভাবের উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। আর যে পর্যন্ত না আত্মশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়, যে পর্যন্ত কণামাত্র অহঙ্কার কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায়, ততদিন সাধকের আপন প্রচেষ্টার, বিচারবিবেকেরও প্রয়োজন আছে। বৈদান্তিক শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সৎ-কেই বড় করিয়া দেখিতে চান, তান্ত্রিক সৎ-কে বিস্মৃত হইয়া শক্তির পূজাতেই মগ্ন থাকেন। পূর্ণযোগীর দৃষ্টি এখানে উদার ও সমগ্র। পূর্ণযোগীর চক্ষে সৎ ও শক্তি এক এবং অভিন্ন ; সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই যেমন শক্তি কার্যকরী হয়, তেমনই আবার শক্তির মধ্য দিয়াই সত্তা আপন আনন্দকে লীলায়িত করিয়া তোলেন। তান্ত্রিকের শক্তি বৈদান্তিকের জ্ঞান হইতে পৃথক নহে, কারণ ঐ শক্তি চিন্ময়ী, জ্ঞানেরই স্বধর্ম, ভগবানের তপঃশক্তি। পূর্ণযোগের সাধনায় তাই দেখি সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি সাধককে হাত ধরিয়া পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন, আবার সেই জ্ঞানের বিচিত্র ঐশ্বর্য সাধকের সত্তার বিভিন্ন স্তরে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পান।

পূর্ণযোগের তাৎপর্য সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলা হইল এবার

সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। পূর্ণযোগের লক্ষ্য হইল পরাসত্যের পূর্ণ বা অখণ্ড অনুভূতি। এরূপ অখণ্ড অনুভূতি লাভ হইলে দেখা যায় যে ভগবান শুধু নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নির্গুণ বা অক্ষর নন, অথবা পক্ষান্তরে ভগবান শুধু সক্রিয়, সাকার, সগুণ ও ক্ষর নন; তিনি এ উভয়ই,—তিনি "নির্গুণো গুণী"। আবার এ উভয়ই অতিক্রম করিয়া তিনি পরাৎপর, পরম রহস্যাবৃত, অচিন্ত্য পুরুষোত্তম। অখণ্ড জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে আরও জানা যায় যে ভগবান একাধারে বিশ্বাতীত, বিশ্বপরিব্যাপ্ত ও ব্যষ্টিরূপী। জীবাত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম একই পুরুষোত্তমের অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি, তাহার অখণ্ড চেতনার বিভিন্ন অবস্থান। পূর্ণযোগীর লক্ষ্য হইল তাঁহার আদর্শের মধ্যে সাযুজ্য, সালোক্য ও সাধর্ম্য মুক্তির সমন্বয় সাধন করা এবং তাঁহার জীবনে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা। তাঁহার লক্ষ্য হইল ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের লীলাসাথী হওয়া, এবং তাঁহার দেহমনপ্রাণ রূপান্তরিত করিয়া মা ভগবতীর দিব্যযন্ত্রে পরিণত করা। তাঁহার চেষ্টা হইল তাহার জীবনের কেন্দ্রস্থলে পূর্ণজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করা, যেন সেই জ্ঞান হইতে বিশুদ্ধ ভক্তি বিকশিত হইতে পারে এবং দিব্যকর্মের বিশ্বপ্লাবী ধারা উৎসারিত হইতে পারে। শুদ্ধি, সিদ্ধি, মুক্তি ও ভুক্তি ইহাদের কোনটাই পূর্ণযোগী উপেক্ষা করিতে চান না। পূর্ণযোগীর উদ্দেশ্য শুধু অন্তরে ভগবানের অনুভূতি-লাভ নয়, বাহিরের কর্মক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য রচনা করা। তাই তিনি আধারটি এমনভাবে শুদ্ধ করিতে চান যেন উহা নিখুঁত দিব্যযন্ত্রে পরিণত হইতে পারে, যোগলব্ধ শক্তিনিচয় এমনভাবে প্রয়োগ করিতে চান যেন পৃথিবীতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হয়, অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এমন এক নিষ্কাম নিস্পৃহ অবস্থা লাভ করিতে চান যেন ভগবানের সুযোগ্য লীলাসাথী হইতে পারেন। সক্রিয়ভাবে ভগবদ্‌লীলায় অংশগ্রহণ করারই অপর নাম

হইল ভুক্তি। ভুক্তির মধ্য দিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষ মানবসংঘের সমষ্টিগত মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। শুদ্ধি, সিদ্ধি, মুক্তি ও ভুক্তি এই চতুর্বিদ পরমার্থলাভ করিবার জন্য পূর্ণযোগ-সাধনায় একদিকে যেমন আরোহণের প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে আবার অবরোহণও অবশ্য-প্রয়োজনীয়, একদিকে যেমন পার্থিব চেতনা অতিক্রম করিয়া তুরীয় ধামে উঠিয়া যাওয়া দরকার, অন্যদিকে আবার তুরীয়লোক হইতে নামিয়া আসিয়া তুরীয় শক্তিকে পার্থিব চেতনার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। অধ্যাত্ম-সাধনার এই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে হইলে হঠযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং তান্ত্রিকযোগ প্রভৃতি প্রাচীন যোগপন্থাগুলির প্রত্যেকটি হইতে উহার সত্যাংশ গ্রহণ করিয়া এক সমন্বয়মূলক সাধন-প্রণালীর উদ্ভাবন করা চাই। পূর্ণযোগের মধ্যে এই মহাসমন্বয়ের প্রচেষ্টা-ই আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি।

*

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব*

ডাঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের অবস্থান অভিব্যক্তির এক সন্ধিভূমিতে। সে তার অতীত অব-মানস বা পাশব প্রকৃতিকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না এবং তার ভবিষ্যৎ অতিমানস সম্ভাবনার সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে সচেতন নয়। প্রকৃতি এবং চিতি এই দুই শক্তির সংবেগে পরিচালিত মানুষ এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে, এগোচ্ছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারার তুলনায় মানুষ একটি অলৌকিক ঘটনা। কারণ, মানুষ একটি মনন-শীল জীব; সে প্রকৃতির ধারার ভিতরে অবস্থিত, সেই ধারার সঙ্গে প্রয়োজনের সম্বন্ধে সংযুক্ত, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও প্রকৃতির একান্ত অনুগত বা দাস নয়। প্রকৃতি মানুষের কাছে একটি রহস্য; তার উদ্দেশ্য মাত্র অংশত পরিস্ফুট এবং অনেকাংশেই গুহ্য বা অবগুণ্ঠিত। মানুষ এমন এক বিশিষ্ট সংগঠনের অধিকারী যে মননের দ্বারা সে প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হতে সমর্থ।

মানুষ প্রকৃতির মনস্কতার যন্ত্রবিশেষ। অন্যকথায়, প্রকৃতি মানুষে এসে আত্ম-সচেতন হয়েছে। জড়ের স্তরে চৈতন্য মূর্চ্ছিত ও তিমিরাবৃত। প্রাণের স্তরে চৈতন্য অজ্ঞান-আচ্ছন্ন; তিমির এই স্তরে অপসৃয়মান। মানুষের স্তরে চৈতন্য বুদ্ধিধর্ম্মী; এই স্তরে আলোক গোধূলির আলোকের মতো অর্দ্ধস্পষ্ট। মানুষের স্বভাবের অনিশ্চিত দ্বৈতভাবকে

---

* মূল প্রবন্ধটি ইংরেজী ভাষায় লিখিত। অনুবাদক: জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার আই. এ. এস (অবসরপ্রাপ্ত)।

ঘিরে আছে বুদ্ধির একবিধ প্রদোষচ্ছটা। যে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি মানুষকে অতিমানস স্তরে উন্নীত করতে পারবে সেই রশ্মির অধিকারী মানুষ এখনও সম্পূর্ণরূপে হতে পারে নি। মনন-শীল জীবরূপে মানুষ বহুবিধ জ্ঞানবৃত্তি ও শক্তির একটি পিণ্ডবিশেষ। "মানুষের মনের ভিতরেই আছে বহুবিধ স্তরের পর্য্যায়ক্রম এবং এই স্তরগুলির প্রত্যেকটি স্তরের নিজস্ব রূপ হল এটি পুনরায় বহুতর স্তরের একটি পর্য্যায়; মানুষের মনের শক্তির নানান্ থাক আছে এক্ চিন্তার সুবিধার জন্য এগুলিকে মনোময় জগতের বিবিধ ভূমি এবং উপভূমি বলা চলে।" (দিব্যজীবন ৬৩৯-৬৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

একথা যথার্থ যে প্রত্যেক মানুষই একই স্তরে প্রতিষ্ঠিত নয়। তবুও শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য হল এই যে মোটামুটি এটা সত্য যে মনুষ্যজাতি বুদ্ধির নিম্নতম স্তরের এতটুকু উপরে এখনও উঠতে পারেনি। এই নিম্নস্তরটি হল জড়াশ্রিত বুদ্ধির স্তর। আমরা যে-ভূমি বা উপভূমিতেই অবস্থান করি না কেন আমাদের দৃষ্টি সাধারণত প্রভাবিত হয় নিম্নতর স্তরের আবেগ ও প্রবেগের দ্বারা; কদাচিৎ কখনো কখনো উচ্চতর স্তরের আলোকের ইশারায় আমরা স্পন্দিত হই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত ও জড়সমন্বিত নিম্নতর প্রকৃতির প্রয়োজন অনুসারেই আমরা আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করি। এই প্রবণতা স্বাভাবিক বলেই দর্শনের বিচারের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষবাদ এবং নৈতিক জীবনে প্রচলিত রীতির আনুগত্য এতো জনপ্রিয় ও এগুলির শক্তি এতো প্রবল। অবশ্য এই উক্তিটির অর্থ এমন নয় যে আমাদের মধ্যে হেথা হোথা কখনো কখনো সাধারণ ধারা ভঙ্গ করে সৃজনশীল মানুষ ব্যতিক্রমরূপে আবির্ভূত হয় না। মনুষ্যজাতির নিয়তি নির্দিষ্টপথে অগ্রসর হয় প্রকৃতির একটি নিজস্ব ধারায়। আমাদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর গুণী তাঁদের ভিতরের প্রবেগ দিয়েই প্রকৃতি মনুষ্যজাতিকে অভিনব পথে নিয়ে যাচ্ছে।

চিতির উচ্চতর স্তরগুলিকে মূর্ত্ত করবার ব্যাপারে প্রকৃতি আমাদের উপর একান্ত নির্ভরশীল। অধিমানস ও অতিমানস ভূমিতে আরোহণই হল প্রকৃতির সকল প্রচেষ্টার গূঢ় অভিপ্রায়। কিন্তু এই অভিপ্রায়-সিদ্ধির ব্যাপারে জড়াশ্রিত ও দেহপ্রধান মানুষের সামর্থ্য অতি ক্ষুদ্র। মানুষের কর্ম্ম ও জ্ঞান, জড়মস্তিষ্ক, শারীরিক ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-নির্ভর মন দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ যে-রূপটিকে বস্তুসত্তার জড়রূপ বলেছেন একমাত্র সেই রূপটিই এগুলির সহায়তায় ধরা যায়; প্রকৃতির গোপন রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে এগুলি নিতান্তই অপারগ।

জড়প্রধান মানুষের ভিতর একটি প্রাণময় ভূমি আছে। এই ভূমিতে দেহী মানুষের স্বভাব হল মুখ্যত অন্ধ প্রকৃতির বা সংস্কারের দাসত্ব এবং আবেগ-প্রবণতা। এই প্রবৃত্তি ও প্রবেগগুলি অভ্যাসজাত ও জন্মগত। এগুলির মধ্যে শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অভাব। ইন্দ্রিয়জ সংবেদন বাসনা, আবেগ ও সুখের বোধ এগুলি সবই প্রাণময় ভূমির ফসল। এগুলি সবই বাহ্যজগতের বস্তুনিচয়ের সংস্পর্শজাত উত্তেজনার অন্ধ উত্তর। প্রাণবান পুরুষের স্বভাবই হল এই যে সে বাহ্য উত্তেজনার মধ্যে নিমগ্ন থাকতে ভালবাসে। যা-কিছু ব্যবহার্য্য, দ্রুতসাধ্য, অভ্যস্ত, সম্ভাব্য, সাধারণ ও সর্বজনসেব্য তার প্রতিই এই রকম পুরুষের আকর্ষণ।

দেহীপুরুষের মনোময় অংশটিও মুখ্যত জড়জগৎ ও জড়জগতের কল্পনা নিয়েই তৃপ্ত। বাহ্য, প্রচলিত, চিরাচরিত, প্রথাসম্মত ও ফলিত ভাবগুলিই এই মনের খোরাক ও সেগুলি নিয়েই দেহপ্রধান মানুষের মন সতত ব্যস্ত। এই মনের দৃষ্টিতে জীবনের উচ্চতর সম্পদগুলি নিষ্প্রয়োজন কিংবা বড়জোর কতগুলি কার্য্যকারী উপকরণ মাত্র। কার্য্যকারিতা ও অর্থকারিতার মূল্য দেহপ্রধান মানুষের মনে অত্যন্ত বেশী ও স্পষ্ট। সেইজন্য উচ্চতর চিন্তা বা উচ্চতর কর্ম্ম এই মনে কোনরকম আবেগ সৃষ্টি করে না। কল্পনা ও অনুভূতির সূক্ষ্ম গতি-

বিধিও এই মনের স্বভাব-বিরুদ্ধ। দেহ-প্রধান মানুষের কাছে যে-বস্তুটি এখনই ব্যবহার্য্য, বা বাহ্যত ও স্থূলত প্রয়োজনীয় নয় সেই বস্তুটি হয় একটি সুখকর বিলাসের সামগ্রী, নয় একটি নির্বস্তুক কল্পনার বৃথা প্রয়াস মাত্র। এই প্রকৃতির মন তার উপরের বা নীচের স্তরের সব-কিছুকেই অবান্তর আতিশয্য বলে বর্জন করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক স্তরের মধ্যে যে গভীরতর ঐক্য এবং ক্রমিকতা আছে সেগুলির সম্বন্ধে দেহপ্রধান পুরুষের মন অজ্ঞ। সেইজন্য কাজের প্রয়োজনে এই স্তরগুলিকে যখন তাকে স্বীকার করতে হয় তখন সে জড়জগতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী অথবা আচার বা প্রথা বা প্রসিদ্ধি দিয়ে এগুলির ব্যাখ্যা করে। সর্বদাই অনবগত তত্ত্বকে অবগত তত্ত্বের দ্বারা বুঝতে সে প্রয়াসী এবং এই প্রয়াসে ব্যর্থ। কারণ, তার ব্যাখ্যা দুর্বোধ্যতার দোষে দুষ্ট। দুঃখের বিষয় যে এই প্রকার ব্যাখ্যাকে অনেক সময়েই বিনা বিচারে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে প্রচার বা স্বীকার করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়ে একটি সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি আমাদের স্মরণ রাখতে বলেছেন যে যতদিন পর্য্যন্ত জড়োত্তর প্রকৃতির নিয়ম ও সম্ভাবনাগুলি আমরা জানতে না পারব ততদিন পর্য্যন্ত জড় প্রকৃতির নিয়ম ও সম্ভাবনাগুলিও আমাদের সম্পূর্ণরূপে গম্য হবে না। (মানবিক চক্র ৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) শ্রীঅরবিন্দ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে অবনত ব্যাখ্যা বলে সমালোচনা করেছেন এবং এই ব্যাখ্যার সাময়িক ও প্রারম্ভিক আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। তাঁর বিশ্বাস বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিশীলিত হয়ে এক উন্নত-শ্রেণীর বিজ্ঞান অচিরে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতা ও অর্থকারিত্বের এতাবৎ বলবান মোহটি কাটিয়ে উঠবে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচার ও দার্শনিক পর্য্যালোচনার দ্বারা নূতন দিগন্তের দিকে অগ্রসর হবে। কারণ, মহৎ পর্য্যালোচনা দ্বারা আশু কোনো ফল লাভ না হলেও বহু ভবিষ্যৎ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ইঙ্গিত এই বিচার ও পর্য্যালোচনা দিতে

পারবে (এম. এ. হায়েক্ বিজ্ঞানের প্রতিবিপ্লব ১৯৬৪ ১৭-২৪ পৃঃ দ্রঃ)।

কায়িক মনের উর্দ্ধে এবং দৈহিক সংবেদনের অন্তস্তলে একটি ভিন্ন প্রকারের চেতনা সক্রিয়। এই চেতনাকে শ্রীঅরবিন্দ প্রাণিক চেতনা বলে অভিহিত করেছেন। কায়িক মনের চেয়ে প্রাণিক মনটি চৈত্য-পুরুষের দিকে অধিকতর উন্মুক্ত ও অনাবারিত। এই মনটি প্রাণ-পুরুষের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি এবং এর অনুভবাদি অস্পষ্ট ; কিন্তু এটি চৈত্য-পুরুষ নয়। প্রাণপুরুষের কাজ কেবল প্রাণশক্তির খেলা নিয়ে। তার কাছে বিশ্বটি প্রতিভাত, প্রাণশক্তির আবেগ, উচ্ছ্বাস, সংগ্রাম ও জয়ের ক্ষেত্ররূপে। প্রাণপুরুষের কাছে শরীরনামক বস্তুটি একটি জড় অধিষ্ঠানমাত্র এবং তার একমাত্র উপযোগিতা হচ্ছে গূঢ় প্রাণশক্তির প্রকাশে ও পোষণে। প্রাণপুরুষ গূঢ় প্রাণশক্তির সঞ্চার ও প্রকাশ দ্বারা প্রকৃতির অভিব্যক্তির ধারা অনেকটা এগিয়ে দিতে সক্ষম। জড় জগতের অন্ধ দাসত্ব ও শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত বলে প্রাণপুরুষ তার ভিতরে ও বাইরে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির নিগূঢ় জীবনটিকে বুঝতে পারে ; শরীর এবং জড়জগতের প্রতীক গুলি তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। প্রাণপুরুষের দুটি অতিপরিচিত লক্ষণ হল প্রবেগের আতিশয্য এবং স্বামিত্বের প্রবৃত্তি। প্রাণপ্রধান পুরুষ হল রাজসিক পুরুষ। সে প্রধানত কর্ম্মী, ধ্যানী বা জ্ঞানী নয়।

মানুষের অভিব্যক্তির কায়িকস্তরের নীচে যেমন কতগুলি উপস্তর আছে তেমনি প্রাণিক স্তরের নীচেও কয়েকটি উপস্তর আছে। প্রথম প্রাণিক উপস্তরটি হল একটি অন্ধ ও অজ্ঞ প্রবেগের স্তর। এই স্তরের চেতনা হচ্ছে অতি অবিকশিত ; এই স্তরে ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা বা বিচারশীলতা নেই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় কোনো ধারণা নেই এবং এই স্তরের ইচ্ছা ও চেতনাটি বিশ্বগত ইচ্ছার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। ব্যক্তিত্বের বীজটি এই উপস্তরের মধ্যে অসংহত ও অস্পষ্টরূপে

প্রোথিত থাকে। দ্বিতীয় উপস্তরটি হল বাসনার ক্ষেত্র। এই উপস্তরে পূর্বোক্ত উপস্তরের পরাধীন ও বন্দী ইচ্ছাশক্তিটি একটু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, একটু মুক্তিলাভ করেছে; কিন্তু এই শক্তির সামর্থ্য সীমিত বলে অনেক আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। তৃতীয় উপস্তরে স্বামিত্বের আকাঙ্ক্ষা আর মূক ও অন্ধ থাকে না। এই উপস্তরে প্রাণপুরুষ তার সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অংশত সচেতন হওয়ার দরুণ অধিকতর লাভের জন্য স্থূল ও নিকটস্থ বস্তু-গুলি বিস্মৃত হয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার লোভে বর্ত্তমানকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়। এই জ্ঞান ও প্রস্তুতির ফলে এক নূতন শক্তির সঞ্চার হয়। এই শক্তি হল প্রেমের শক্তি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "তৃতীয় উপস্তরের কোরক বা কুড়ি হল প্রেম।" এই প্রেম শক্তির বলে প্রাণপুরুষ নিজেকে অতিক্রমণ করে এবং অন্য প্রাণীদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে ও সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা তার আত্ম-সচেতনতা অধিকতর সার্থক হয়। চতুর্থ উপস্তরে প্রেমের কুড়িটি পূর্ণতার ফুলে প্রস্ফুটিত হয়। এই উপস্তরে এসে প্রাণের অন্ধ আকূতি পরিশুদ্ধ হয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই উপস্তরে পৌঁছে জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও আস্পৃহাগুলি পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত।

প্রাণের স্তরে প্রকৃতির রাজ্যে বহুমুখী ও ক্রমিক উন্নতি হয়েছে; কিন্তু প্রাণ্ তার নিজ লক্ষ্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে ঠিক সচেতন নয়। জীবনের লক্ষ্য বা অভিপ্রায় শুধুমাত্র জীবনধারণ নয়। নিকটস্থ সব কিছুকে অতিক্রম করে প্রসারিত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। শুনতে বিপরীত হলেও একথা সত্য যে প্রাণশক্তিকে পূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা লাভ করতে হলে নিজগণ্ডি ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। জড়শক্তির আপাতমূর্চ্ছা ও প্রাণশক্তির আপাত ও অন্তর্নিহিত অজ্ঞতার দরুণ জড়-শক্তি ও প্রাণশক্তি বুঝতে অপারগ যে তাদের চেয়েও বলবত্তর হল চিত্তিশক্তি। জড়শক্তির সম্ভাবনাগুলি জড়প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সহজ-

লভ্য উপাদানগুলি দিয়ে উন্মেষিত করা সম্ভবপর নয়। প্রাণশক্তির সম্ভাবনাগুলিও প্রাক্-মননশীল স্তরের উপায় ও উদ্যোগ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে স্ফুরিত করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতির লক্ষ্য হল দ্বিমুখী ঃ প্রত্যেকস্তরেই সেই স্তরের সম্ভাবনাগুলিকে পরিপূর্ণতা দান করা হল একটি অভিপ্রায় এবং দ্বিতীয় অভিপ্রায়টি হল সমগ্র প্রকৃতির সম্ভাবনাগুলিকে যুগপৎ স্ফুরিত করা। প্রাক্-মননশীল স্তরে প্রকৃতি তার এই দ্বিমুখী অভিপ্রায়ের যৌগপত্ত বিষয়ে সচেতন নয়। যথার্থত, কোনো স্তরেই সেই স্তরের একান্ত নিজস্ব কোনো সম্ভাবনা নেই। একস্তরের সম্ভাবনাগুলি অন্য স্তরের সম্ভাবনাগুলির সঙ্গে অন্যোন্যসম্বন্ধে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একমাত্র চিতিশক্তির দৃষ্টিতে বিশ্বের যাবতীয় সম্ভাবনাগুলি তার নিজস্ব সম্পত্তি। এই সম্ভাবনাগুলির স্ফূরণ ও মুক্তিলাভের ক্ষেত্র হল অভিব্যক্তির যতোরকম স্তর বা উপস্তর আছে সেই সবগুলিই।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে মানুষ ঈষৎ-কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকার দরুণ তার একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরগুলি সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র ও অসম্বদ্ধ। প্রত্যক স্তরেই যেমন, মানুষকেও তার স্তরে তেমন তার নিজ গতি অতিক্রম করতে হবে। তবেই সে তার সর্ববিধ সম্ভাবনাগুলিকে প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম হবে। মানুষের এই চরম আত্মপ্রতিষ্ঠার উপযোগী যাবতীয় উপায় ও উপাদান সৃষ্টি করে চলাই বিশ্বগত ইচ্ছা শক্তির একমাত্র অভিপ্রায়। এবং এইটিই প্রকৃতির অন্তর্গত মানবেতর, মানব ও মানবোত্তর স্তরগুলির অভিব্যক্তির বিপুল ধারার যুক্তি এবং মর্ম্মার্থ।

প্রাণিক মনশ্চেতনার উর্দ্ধে একটি শুদ্ধ চিন্তা ও বুদ্ধির মধ্য-ক্ষেত্র আছে। এই ভূমিতে চেতনার কাছে ভাবগুলিই হল শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। যাঁরা দার্শনিক, মনীষী, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধ্যাশ্রয়ী স্রষ্টা, আদর্শবাদী ও ভাবুক

তাঁদের সকলের অবস্থান এই মধ্য-ক্ষেত্রের শীর্ষে। এঁরা বাহ্যজগতের বস্তুনিচয়ের বস্তুত্ব দ্বারা মুগ্ধ, আকৃষ্ট ও ভ্রান্ত হন না। এঁরা আপাত-কঠিন বস্তুগুলির আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম ও সমর্থ শক্তিগুলির খেলা ধরতে পারেন। শুদ্ধভাব ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের স্তরে এসে প্রকৃতির নিজ অভিপ্রায় অংশত সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মানবেতর স্তরে প্রকৃতির অভিপ্রায়গুলি অচেতনভাবে সম্পাদিত হয়। এই অব-মানব স্তরে জড়শক্তির সঙ্গে জড়শক্তি, জীবের সঙ্গে জীবের সংঘর্ষ বা সংগ্রাম একটি সত্য ব্যাপার। কিন্তু মনের সঙ্গে মনের সংঘাত দ্বারা প্রকৃতির অভিব্যক্তির মানবীয় স্তরটি সূচিত হয়। মানুষ প্রকৃতির মনঃস্বরূপ। প্রাণশক্তির অনমনীয় নিয়মগুলির কবল থেকে মানুষ অপেক্ষাকৃত মুক্ত এবং কাম্য ও শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির পরিপূর্ণতার জন্য এই নিয়মগুলির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করবার সামর্থ্য তার আছে। অভিব্যক্তির দ্বিমুখী অভিপ্রায় সিদ্ধির সূত্রটি এখানে স্মরণীয়। এই সূত্র অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে মানুষের আদর্শগুলি প্রকৃতিরও আদর্শের উপযোগী হওয়া উচিত। এই কারণেই মানুষ তার আদর্শগুলিকে পুরোপুরি প্রকৃতির কার্য-ধারার উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। মানুষ তার স্বভাবের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলির দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু সেগুলির অন্তঃস্থ মূল প্রবেগটিকে রূপান্তরিত করতে পারে না। প্রকৃতি এখনো মনোময় মানুষকে অবাধ কর্তৃত্ব দেয়নি। এখনো মনোময় মানুষকে জড়জগৎ ও প্রাণজগতের নিয়মগুলির আংশিক বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। জড়শক্তি ও প্রাণশক্তি যতোটা উগ্রতা ও অবাধ্যতার সঙ্গে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে ততোটা উগ্রতা ও অবাধ্যতা মানুষের মনের স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির মধ্যে নেই। তবুও জড়শক্তি ও প্রাণশক্তির একেবারে প্রভাবমুক্ত মানুষের মন নয়। মনের মধ্যেও নিজেকে একটি স্বতন্ত্রতত্ত্বরূপে স্বীকার করবার একটি ভ্রান্ত প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়।

এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই মানুষের মন তার কল্পিত আদর্শটি কায়িক-প্রাণিক স্তরের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে সফল করতে চায়। প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়টি হল অতিমানস সহ উন্নততর জীবের অভ্যুত্থান। সেইজন্য মনোময় পুরুষের তুষ্ট ও সঙ্কীর্ণ প্রচেষ্টার মূক ও উদাসীন সাক্ষীরূপে প্রকৃত বেশীকাল তিষ্ঠোতে পারে না। স্বভাবের বশবর্তী হয়েই মানুষ জড় ও প্রাণের প্রচণ্ড বিরোধ ও সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত সংহতিতত্বটি ধরতে চেষ্টা করে এবং তার নিজ জীবনকে এই সুসঙ্গতির আলোকে গড়ে তুলতে উদ্যত হয়। মানুষ যখন নিজ মন ও বুদ্ধির বিরোধগুলিতে জড়িয়ে পড়ে, সামঞ্জস্যের বা সংহতির আলোক দেখতে পায় না এবং এই আলোকের সাহায্যে বিরোধগুলি নিরসন করতে অসমর্থ হয় তখন প্রকৃতি তার চরম কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে। এবং প্রকৃতির প্রভুত্ব দ্বারা জড়শক্তি, প্রাণশক্তি ও চিত্তশক্তির স্বতন্ত্রক্রিয়া নিরাকৃত হয়।

প্রকৃতির অভিব্যক্তির মধ্যপর্বে হল মানুষের স্থান। মানুষ যে-পরিমাণে তার আদর্শকে মূর্ত করতে সক্ষম হয়, সেই-পরিমাণে তার নিজ পদমর্য্যাদার উৎকর্ষসাধন করে। কিন্তু এ পর্যন্ত মানুষ তার স্বভাবকে আবিষ্কার করতে পারে নি। এখনও প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারার মধ্যে সে একটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম; সে পূর্ণ আদর্শের এক অক্ষম বাহক মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "এই অপূর্ণতা কোনো পরিতাপের বিষয় নয়; এই অপূর্ণতাই মানুষের গৌরব ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিস্বরূপ। কারণ, এই অপূর্ণতার দরুণই মানুষের সম্মুখে খুলে যায় আত্মপ্রসার ও আত্মবিকাশের এক বিরাট দিগন্ত।" (মানবিক চক্র ২৯০-২৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) আত্ম-বিকাশ ও স্বাতিক্রমণের পথ কুটিল এবং বিপদসঙ্কুল। মানুষের বুদ্ধির প্রদোষালোক, অন্ধ, মূক, অবাধ্য ও স্বাতন্ত্র্যপ্রবণ জড়শক্তি ও প্রাণশক্তির মধ্যে কোনো সাড়া বা আলোড়ণ সৃষ্টি করতে পারে

না। বরঞ্চ জড়শক্তি ও প্রাণশক্তির প্রভাবে মানুষের বুদ্ধি কিছুটা জড়ধর্মী ও প্রাণধর্মী হওয়ার ফলে সেটি বিকৃত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। জড়ের সংগঠন অপেক্ষাকৃত সরল; সেইজন্য জড়শক্তিকে কাজে লাগাতে বুদ্ধির বেগ পেতে হয় অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু প্রাণের স্তরে বুদ্ধিকে বেশ কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী বাধার সম্মুখীন হতে হয়। একদিকে জড়শক্তি ও প্রাণশক্তির এবং অপরদিকে মনোময় বুদ্ধি-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ পরিণতি, প্রথম শক্তিদুটির ক্রমশ ও অবশ্যম্ভাবী পরাভব ও মনঃশক্তির জয়। এই নীরব সংগ্রাম ও তার অন্তিম পরিণতি যে সবসময়েই সচেতনরূপে সাধিত হবে এমন কোনো নিয়ম নেই, তবে কখনো কখনো সচেতনরূপে ঘটতে পারে। যতোই মানুষ তার উচ্চতর অভিপ্রায় সম্বন্ধে সচেতন হবে ততোই উপরের আলোক তার মধ্যে সাড়া সৃষ্টি করবে এবং ততো দ্রুত হবে তার চৈত্তিক উন্নতি। সত্তার প্রত্যেক ভূমিরই স্বভাব হল তার বর্তমান অবস্থাকে স্থায়ী করে রাখা। মানুষের চৈত্তিক অভিযানের পথ সেইজন্য সরলরৈখিক ও সহজ হতে পারে না। প্রকৃতির এই অসরলরৈখিক উত্থানের কারণটি বুঝতে হলে সত্তার গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়োজন হয়। যে-জিনিষটি রেশমীসুত্রের মতো সত্তার বিভিন্ন স্তরের ভেদগুলি বিলুপ্ত হওয়ার পর সেগুলিকে একটি সার্বিক লক্ষ্যের দিকে বেঁধে পরিচালিত করে সেই জিনিষটি হল অভিব্যক্তির মূল সত্যার্থটি ও তজ্জনিত সংবেগ।

মানুষের স্বরূপ, বিশেষ করে প্রকৃতির পরিকল্পনায় মানুষের স্থান বা অংশ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের ধারণাগুলির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উঠতে পারে। বস্তুত, তাঁর সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি সর্বাত্মক নিমিত্তবাদকে সমর্থন করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজে এই বিষয়ে সচেতন যে তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলির বিরুদ্ধে এই আপত্তিটিও তোলা চলে যে এ দুটির ভিত্তি যথেষ্ট

পাকা নয়, এগুলি কল্পনাপ্রসূত ও অতিমাত্রায় তাত্ত্বিক এবং সত্তার বিভিন্ন স্তরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্যাভিসারী অভিব্যক্তির তত্ত্বটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। এছাড়া এও বলা চলে যে শ্রীঅরবিন্দ-প্রচারিত মানবিক ঐক্যের আদর্শটি শ্রীঅরবিন্দ-প্রদর্শিত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করে অন্য যুক্তির দ্বারাও সমর্থন করা চলে। শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেছেন যে মনুষ্য ও মনুষ্যেতর শ্রেণীর অতীত ও বর্তমান অভিব্যক্তির ব্যাপারগুলি, লক্ষ্যাভিসারী ক্রমবিকাশের তত্ত্বটি বিনাও ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। শ্রীঅরবিন্দ এই আপত্তিগুলিকে অবান্তর মনে করেন না। কিন্তু আত্ম-সমর্থনে তাঁর প্রধান যুক্তি হল এই। তিনি মনে করেন মানুষের স্বরূপ ও তার অভিব্যক্তির ব্যাপার সম্পর্কিত তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলি সত্য ও অভ্রান্ত জ্ঞান ও বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলি কল্পনার সারহীন বিলাসমাত্র নয়। বুদ্ধির কাজ, মতের সৃষ্টি এবং যে-মতটির ভিত্তি কতগুলি অসম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত তথ্য সেই-মতটির সত্যতা সংশয় করা চলে, সেটিকে সংশোধিত করা চলে এবং স্থলবিশেষে অস্বীকার করাও চলে; কিন্তু কোনো তথ্যকে খুসিমতো বিকৃত করা চলে না; কারণ, তথ্যগুলিকে হয় মেনে নিতে হয়, নতুবা এড়িয়ে যেতে হয়। অতীত ও বর্ত্তমানের ইতিবৃত্তের লক্ষ্যাভিসারী অভিব্যক্তির তত্ত্বটি আমাদের মনে যেসব সংশয় ও দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করে সেগুলির উৎপত্তিস্থল আমাদের আপেক্ষিক অজ্ঞান এবং বোধিজ জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব।

শ্রীঅরবিন্দ এই তর্কটির সত্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত যে সৃষ্টি, চেতনার বিভিন্ন ভূমি, পুনর্জন্ম এবং ব্যক্তির চৈত্তিক অভিব্যক্তি সম্পর্কিত তাঁর মূল মতগুলি গ্রহণ করেও সৃষ্টি যে একটি লক্ষ্যাভিসারী অভিব্যক্তির ঘটনা এই সিদ্ধান্তটি বর্জন করতে বাধে না। কারণ, এরকম যুক্তি ন্যায়সঙ্গতরূপে করা চলে যে "ঈশ্বরের সৃষ্টিব্যাপার দ্বারা

লভ্য কিছুই নেই যে-হেতু সব-কিছুই তাঁর আছে।" এবং "সৃষ্টি ব্যাপার বা প্রকাশ ব্যাপার যদি সত্য হয় তাহলে এটি সৃষ্টি বা প্রকাশের অহেতুক আনন্দের জন্য, এটি কোনো প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নয়।" (দিব্যজীবন ৭৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) জড়বাদীরাও লক্ষ্যাভিসারী অভিব্যক্তির তত্ত্বটির বিরোধিতা করেছেন। জড়বাদীদের ধারণা যে সমস্ত অভিব্যক্তির ধারাটি অচেতন শক্তির যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলমাত্র এবং এই ধারাটির পশ্চাতে কোনো গূঢ় ও সচেতন অভিপ্রায় থাকা অসম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ জড়বাদীর বা বৈজ্ঞানিকের আপত্তিটির গুরুত্ব ও শক্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টতই এই মন্তব্য করেছেন যে জড়বাদী বা বৈজ্ঞানিকদের ধারনাটি অসম্পূর্ণ এবং শেষ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য।

শ্রীঅরবিন্দ ডারউইনের সঙ্গে একমত নন যে মানুষের অভিব্যক্তি কতগুলি আকস্মিক প্রকারণের (variation) ঘটনার দ্বারা যথাযথরূপে ব্যাখ্যা করা চলে। বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের ক্রমবিকাশের ঘটনার দ্বারা ক্রমবিকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয় না। কারণ, বহু প্রকারণের সমষ্টিবদ্ধ ক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের অভিব্যক্তি। ডারউইন প্রকারণগুলির হেতু কি বলতে পারেন নি। তিনি স্পষ্টত স্বীকার করেছেন যে তিনি জানেন না প্রকারণগুলির কারণ কি। বেশী পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলেন প্রকারণগুলি আকস্মিক। এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মত হল এই: "দেখলে মনে হয় এমন কি অচেতন স্তরেও অন্তত একটি অন্তর্নিহিত দুর্নিবার প্রয়োজনের তাগিদে যেন নূতন নূতন আকারে ক্রমবিকাশশীল ধারায় চৈতন্য অভিব্যক্ত হচ্ছে এবং সঙ্গতরূপেই তর্ক করা চলে যে এই তাগিদটি আসে এক গূঢ় চৈতন্যবান পুরুষের ক্রমবিকাশশীল প্রেরণা বা ইচ্ছা থেকে ও এইটিই হচ্ছে অভিব্যক্তির অন্তঃস্থ অভিপ্রায়ের প্রমাণ। এইটিই হল অভিপ্রায়-মূলক তথ্য এবং এটিকে স্বীকার করা অযৌক্তিক হবে না। কারণ,

যুক্তিটির স্বরূপ হল এই যে চেতন বা অচেতন স্তরের মধ্যে পরিদৃষ্ট আকৃতিটিকে, জড় প্রকৃতির স্বতোক্রিয় ধারার অন্তবর্ত্তী এক চেতনাশীল পুরুষের গূঢ় অভিপ্রায়সিদ্ধির প্রেরণা বা ঘটনা বলা হচ্ছে।”

লক্ষ্যাভিসারী অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক আপত্তিটির চেয়ে তাত্ত্বিক আপত্তিটি গুরুতর এবং এই তাত্ত্বিক আপত্তিটি খণ্ডন করা আরও কঠিন, এটি শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করেছেন। যে-হেতু পরমার্থসৎ তাঁর সংজ্ঞা অনুসারে পূর্ণতার প্রতীক সেই-হেতু অভিব্যক্তি দ্বারা তাঁর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধির কথা অসিদ্ধ, যুক্তির দিক থেকে এটি অনস্বীকার্য্য। এবং তাহলে অভিব্যক্তিটি ঈশ্বরের আনন্দের লীলামাত্র এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজন এই অনুসিদ্ধান্তটি অপ্রতি-রোধ্য। যুক্তিটি সারবান ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আপত্তিটি স্বীকার করে নেন নি। তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে : জড়জগৎ পরমবস্তু নয়। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে জড়জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং সেইজন্য এটি কল্পনা করতে বাধে না যে জড়জগৎ অভিব্যক্তিদ্বারা লাভবান হতে পারে। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ যখন অভিব্যক্তির সম্পর্কে অভিপ্রায় বা লক্ষ্যের কথাটি বলেন তখন এই অভিপ্রায় বা লক্ষ্য শব্দটি তিনি আমাদের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেন না। যে গূঢ় অভিপ্রায়টি অভিব্যক্তির ধারাকে পরিচালিত করে সেই অভিপ্রায়টি হচ্ছে “অন্তর্য্যামী পুরুষের সত্য সঙ্কল্প”। লীলার যুক্তিটি শ্রীঅরবিন্দ খণ্ডন করেছেন এই ভাবে যে লীলা বা খেলাও সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না, লীলারও বা খেলারও একটি লক্ষ্য থাকতে বাধ্য এবং সেটির অভাবে লীলারও কোনো অর্থ বা তাৎপর্য্য থাকে না। “জড় জগতের স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নেই; এটি বৃহত্তর একটি সত্তার এক অংশ মাত্র, সত্তার অনেক স্তরের মধ্যে একটি স্তর ; এর মধ্যে বৃহত্তর সত্তার অজড় তত্ত্বগুলির বা শক্তিগুলির নিগূহন সম্ভবপর ; এমন কি জড় জগতের যন্ত্রবৎ প্রক্রিয়াগুলিকে যান্ত্রিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে

উচ্চতর শক্তিগুলির এই জড়স্তরে অবতরণের ব্যাপারও এমন কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় না।" (দিব্য জীবন : ৭৪৩ পৃঃ দ্রঃ।)

এইরূপে লক্ষ্যাভিসারী ও সপ্রয়োজন অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে বলবত্তর তাত্ত্বিক আপত্তিটি খণ্ডন করে শ্রীঅরবিন্দ বৈজ্ঞানিক আপত্তিটি খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক আপত্তিটি জড়জগতের মধ্যে অবস্থিত জড়বস্তু প্রাণ ও মনের কেবল বাহ্য ও দৃশ্য কার্য্যপ্রণালী ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত। অভিব্যক্তির বাহ্য যন্ত্রটি বা বাহ্য বংশানুক্রমিকতা বা কালিক পরম্পরাটি যতো কেন না গুরুত্বপূর্ণ হক সেটি অভিব্যক্তির অপ্রধান অঙ্গ। অভিব্যক্তির প্রধান অঙ্গটি অভিব্যক্তির আদিম ছক বা উদ্দেশ্যটি। কারণ, এই আদিম উদ্দেশ্যের দ্বারাই অভিব্যক্তির ধারার গতিমুখ ও মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।

ডারউইন ও লামার্ক উভয়েরই মতের থেকে শ্রীঅরবিন্দের মত ভিন্ন। ডারউইন মনে করেন প্রকারণগুলি ঘটে আকস্মিকরূপে এবং উদ্দেশ্যহীনরূপে এবং যন্ত্রবৎ। লামার্ক মনে করেন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করবার জীবকর্তৃক সচেতন চেষ্টার জন্যই প্রকারণগুলি ঘটে। ডারউইনের বিচারে অভিব্যক্তির ব্যাপারে জড়জগতের অন্ধ নিয়মগুলির ক্রিয়াটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লামার্কের বিচারে জীববিশেষের সচেতন চেষ্টার সমষ্টিবদ্ধ এবং ক্রমপুঞ্জিত ফলের বংশানুক্রমিকতাই অভিব্যক্তির মৌলিক কারণ। লামার্কের মতটি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ সংশোধিত করে বলেছেন যে জীব বিশেষের সচেতন চেষ্টার ফলে প্রকারণ ততোটা ঘটে নি যতোটা ঘটেছে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন স্থাপনের উদ্দেশ্যে জীববিশেষের অচেতন সাড়াগুলির জন্য এবং পরিবেশ যে-সব নিয়মের বশে পরিবর্ত্তিত হয়েছে সেই-সব নিয়মের সক্রিয়তার জন্য।

লক্ষ্যাভিসারী অভিব্যক্তিবাদ শুধু ডারউইন ও লামার্ক কর্তৃক অস্বীকৃত হয়নি, মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরাও এই মতবাদটিকে বর্জন

করেছেন। অভিব্যক্তির স্বরূপ-নির্ণয় করতে গিয়ে মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদেরা যন্ত্ররূপী অভিব্যক্তিবাদ ও যত্নপ্রধান (জৈব) অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে একটি আপোষ করবার চেষ্টা করেছেন। যত্নপ্রধান অভিব্যক্তি-বাদীদের সঙ্গে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা একমত যে জড়গজতের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক নিয়মগুলি প্রয়োগ করে প্রাণের উৎপত্তি নিঃসংশয়রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁরা যত্নপ্রধান অভিব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে এই বিষয়েও একমত যে প্রকারণগুলি আকস্মিক কারণে ঘটে না। কিন্তু মার্ক্সীয় দার্শনিকদের যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে এক বিষয়ে মতৈক্য আছে; জীবের বা জীবদেহের মধ্যে প্রাণশক্তি, চৈত্যপুরুষ বা এন্‌টেলেকি নামক কোনও অজড় তত্ত্বের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া তাঁরাও স্বীকার করেন না। তাঁদের বিচারে অজৈব জড়পদার্থের তুলনায় জৈবপদার্থ একটি ভিন্নশ্রেণীর পদার্থ; তাঁরা অজৈব জড়জগতের গতিবিধির ও জৈব জগতের গতিবিধির মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা প্রাণের স্বরূপ সম্পর্কে এংগেলসের মতটি উদ্ধৃত করেনা। "শ্বেতসারজাতীয় পদার্থগুলির বিশেষ কার্য্যবিধির নাম প্রাণ; এই কার্য্যবিধির স্বরূপ হচ্ছে এই যে এই পদার্থগুলির রাসায়নিক উপাদানগুলি অনবরত স্বতই পুনর্গঠিত হয়।" (এণ্টিডুরিং মাস্কা ১৯৫৮, ১১৫ পৃঃ দ্রঃ।)

ডারউইনপন্থীদের সঙ্গে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা একমত যে অভিব্যক্তি কোনো অভিপ্রায়মূলক ব্যাপার নয়। কিন্তু মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা একটি বিষয়ে ডারউইনপন্থীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। ডারউইনপন্থীরা 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের' নীতি এক 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' নীতি এই দুইটি নীতিকে অভিন্ন মনে করেন; কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদেরা এই দুইটি নীতির মধ্যে ভিন্নতা করেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপে প্রাথমিক অবস্থায় যারা বলবত্তম তারাই টিকে থাকে কিন্তু তারাও শেষে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া

তাঁরা বলেন যে পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সঙ্গে অভিযুক্ত হবার অধিকতর সামর্থ্যের জন্য যে জীব সবসময়েই উন্নততর হবে এমন কোনো কথা নেই। এই অধিকতর সামর্থ্যের ফলে যে জীবগুলি টিকে থাকে সেগুলির অবনতি বা বিকৃতিও ঘটতে পারে। অনেক সময় আমরা নিজেদের অবনতি ঘটিয়ে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন সম্পাদন করে টিকে থাকি।

ডারউইনপন্থী ও মার্ক্সপন্থীদের অভিব্যক্তি সম্পর্কিত জড়বাদী ব্যাখ্যাটি শ্রীঅরবিন্দ বর্জন করেছেন। বর্জনের পক্ষে তাঁর প্রধান যুক্তি হল এই ব্যাখ্যায় বিশ্বসংস্থানে মানুষ যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সেটি স্বীকৃত হয় নি। এই সাধারণধর্ম্মী যুক্তি ব্যতীত অন্য যুক্তি হচ্ছে মার্ক্স ও ডারউইন উভয়েই অভিপ্রায় ব্যাপারের গভীর তাৎপর্য্য ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁরা এটি বুঝতে পারেন নি যে গতিশীল জড়পদার্থনামক তত্ত্বটি স্বতঃসিদ্ধ নয়, সেই তত্ত্বটিরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। "জড়পদার্থকে কেবল জড়পদার্থ-দ্বারা ব্যাখ্যা করা বৃথা ; কারণ, জড়পদার্থরূপী তথ্যটি স্বয়ংসিদ্ধ নয়।" (দিব্যজীবন ৬৬২ পৃঃ দ্রঃ)। অভিপ্রায়নামক ব্যাপারটির পরিবর্ত্তে জড়বাদীরা যদৃচ্ছা বা আকস্মিকতা নামক ব্যাপারটি আনয়ন করেছেন। যদি অভিপ্রায় বুদ্ধিসম্মত না হয় তাহলে আকস্মিকতা বা যদৃচ্ছা বুদ্ধিসম্মত কিরূপে হতে পারে ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে। অভিপ্রায়কে অভিব্যক্তির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি প্রবেগরূপে স্বীকার করলে ক্রমবিকাশব্যাপারের আভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জড়-বাদীদের ব্যাখ্যাটি অভিব্যক্তির বহিরঙ্গের ব্যাখ্যা মাত্র ; এর দ্বারা কেবল বাহ্য পরিবর্ত্তনের একটি হেতু পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ অভিব্যক্তির বাহ্য প্রক্রিয়াগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সীমিত উপযোগিতা অস্বীকার করেন না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি অভিব্যক্তির বাহ্য ও দৃশ্যমান প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ সম্পর্কিত। প্রত্যুত, বিশ্বলোকে

মানুষের আবির্ভাব সহজতর করবার জন্য জড় ও প্রাণ এই দুইটি পদার্থ, মধ্যস্থ ও অতিক্রম্য দুটি অবস্থা মাত্র। কিন্তু জড় ও প্রাণের উদ্ভব কালের হিসাবে মনের আগে এই যুক্তিতে জড় ও প্রাণ, গুণও বাস্তবতার বিচারে মনের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে না। (দিব্য-জীবন ৭৪৪-৭৪৫ পৃঃ দ্রঃ)।

শ্রীঅরবিন্দ বংশগত প্রকারণের তত্ত্বটি স্বীকার করেছেন। "যে বংশানুক্রমিকতার ব্যাপারটির উপর বিজ্ঞান প্রাণশক্তির অভিব্যক্তির ধারণাটি গড়ে তুলেছে, নিঃসন্দেহে সেই বংশানুক্রমিকতা জীবের প্রকার ও প্রজাতি সংরক্ষণের একটি বিশেষ শক্তি বা যন্ত্র।" কিন্তু এই বংশানুক্রমিকতার তত্ত্বের দ্বারা স্থির ও উত্তরোত্তর-উন্নতিশীল প্রকারণের ব্যাপার সম্যক ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। . কারণ, শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন বংশানুক্রমিকতা বা বংশগতি একটি সংরক্ষণী ও স্থিতিশীল শক্তি; এটি অভিব্যক্তির যন্ত্র নয়। (দিব্যজীবন ৭৩৮ পৃঃ দ্রঃ।) অনেক জীবনবিজ্ঞানীর মতে প্রত্যেক শ্রেণীর জীব তার প্রজাতির আদর্শরূপের মধ্যেই বদ্ধ থাকে এবং সে স্বয়ং সম্পূর্ণ; পূর্ববর্ত্তী ও পশ্চাৎবর্ত্তী অভিব্যক্তি তাকে স্পর্শ করে না। এই মত শ্রীঅরবিন্দের কাছে সমীচীন মনে হয় নি। জীববিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে এই দাবিটুকু মাত্র করতে পারেন যে প্রকারণবৃত্তিতা এবং প্রকারণের প্রকৃত ঘটনাগুলি জীববিশেষের প্রকৃতিগত প্রজাতিরূপের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু কোনো প্রকার ও প্রজাতির স্বতিক্রমণের সম্ভাবনা এই তথ্যগুলি দ্বারা অপ্রমাণিত হয় না। বিভিন্ন বংশগত প্রকারণের পুঞ্জীভূত ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও প্রকারের জীবের উদ্ভব হয়েছে এই মতকে শ্রীঅরবিন্দ সমর্থন করেন না। এই বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব হয়েছে জড়জগতে চিচ্ছক্তির বিভিন্নপ্রকার প্রভাবের ফলে। এই শক্তিটির ক্রিয়ার বাহ্য ও কার্য্যকারী রূপটি বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে

বিভিন্ন ধরণের। কিন্তু প্রক্রিয়াগুলির ভিন্নতা সত্ত্বেও সেগুলির একটি মৌলিক প্রকৃতিদত্ত একরূপতা আছে।

জড়স্তরে প্রকৃতি প্রথম কাজ সুরু করে কতগুলি প্রভূতশক্তি-সম্পন্ন পরমাণু নিয়ে; এগুলি সংখ্যার বৃদ্ধিতে এবং একটি ঋত বা পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার সমষ্টিতে আবদ্ধ হয়। শক্তি-সম্পন্ন পরমাণুগুলি প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সমষ্টিবদ্ধ হয়; এবং এই গোষ্ঠিবদ্ধ পরমাণুগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয়। জীব-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও চিচ্ছক্তির প্রথম সৃষ্টি হল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু-বিশেষ। "প্রকৃতি একটি আদিম প্লাসম্ (জীবসত্ব) সৃষ্টি করে এবং সেটি থেকে অসংখ্য প্লাসমের সৃষ্টি করে; জীবকোষকে জীব-জগতের একক উপাদানরূপে সৃষ্টি করে এবং বীজ, জনি (geres) প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জৈবিক যন্ত্র সৃষ্টি করে এবং সেগুলিকে একই প্রণালীতে সমবেত করে বিভিন্ন প্রকার জৈবিক ক্রিয়া ও জৈবিক দেহের সৃষ্টি করে।" (দিব্যজীবন ৭৩৯ পৃঃ দ্রঃ)। বিভিন্ন জাতির জীবের সৃষ্টি এবং অভিব্যক্তি একই ব্যাপার নয়। অভিব্যক্তির জন্য যেটি প্রয়োজন সেটি হল প্রকৃতির ভিতরে একটি একটি ক্রমবিকাশশীল ও সচেতন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের ক্রিয়া। শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রকারণ ব্যাপারগুলি জীববিশেষের আদর্শরূপের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং সেইজন্য বংশগতির তত্ত্বদ্বারা এক প্রজাতির অন্য প্রজাতিতে অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। বংশানুক্রমিকতা বা বংশগতি ব্যতীত অন্যান্য যে সব উপাদান অভিব্যক্তির পথ উন্মুক্ত করে সেগুলি হচ্ছে খাদ্য, আলোক-রশ্মি এবং হয়তো কতগুলি অদৃশ্য জৈবশক্তি এবং কতগুলি অস্পষ্ট মানসিক প্রতিক্রিয়া। এই অদৃশ্য জৈবশক্তি ও অস্পষ্ট মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান ধারণাগুলি খুবই প্রাথমিক পর্য্যায়ের। কতগুলি জীবপ্রজাতি অবচেতন শক্তির প্রভাবে পরিবেশের প্রয়োজন অনুসারে যথাযোগ্য

সাড়া দিতে সক্ষম হয় আবার কতগুলি ঐ একই অবস্থায় সাড়া না দিতে পেরে টিকে থাকতে পারে না এই তথ্যটি থেকেই বোঝা যায় যে "প্রকারণের হেতু নিছক জড়শক্তির ক্রিয়া ব্যতীতও অপর কত-গুলি বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন জৈবশক্তি এবং অজড় চিতিশক্তির ক্রিয়া।" (দিব্যজীবন ৭৪০ পৃঃ দ্রঃ।) প্রজাতির অন্তর্গত প্রকারণ একটি বৃহত্তর পরিবর্ত্তন ব্যাপারের একাংশমাত্র এবং এই বৃহত্তর পরিবর্ত্তনের ব্যাপার দ্বারা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির অভিব্যক্তি হয়। এই সমগ্র ব্যাপারটির জনক ও পরিচালক হচ্ছে চিচ্ছক্তি। এক কথায়, অভিব্যক্তি অন্ধ ও যন্ত্রবৎ কোনো ব্যাপার নয়।

একথা সত্য যে অভিপ্রায়কে বাদ দিয়েও মানুষের উদ্ভব ব্যাপারটির ব্যাখ্যা সম্ভবপর। শ্রীঅরবিন্দের মতে সেই ব্যাখ্যা এই-জন্য ত্রুটিপূর্ণ যে সেই ব্যাখ্যা দ্বারা মানুষের গুরুত্ব অস্বীকৃত হয়। অভিপ্রায়কে বাতিল করলে অন্য দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার সূত্রের মধ্যে একটি গ্রহণ করতে হয়। হয় জড়বাদীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয় "অভিব্যক্তির সমস্ত ব্যাপারটিই জড়শক্তির উদ্দেশ্যহীন ও যন্ত্রবৎ স্বয়ংক্রিয়ার পরিণতি মাত্র," নয় বলতে হয় যে পরমার্থসত্তের কোনো-কিছুর অভাব নেই এবং সেইজন্য তার কোনো কিছু অভিব্যক্ত বা মূর্ত্ত বা রূপায়িত করবার থাকতে পারে না। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি সাভিপ্রায়-অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে এই বৈজ্ঞানিক এবং তাত্ত্বিক যুক্তি দুটির উভয়টিকেই শ্রীঅরবিন্দ অস্বীকার করেছেন। অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি শ্রীঅরবিন্দ এই বলে খণ্ডন করেছেন যে প্রথমত এই ব্যাখ্যাতে অভিব্যক্তি ও নিগূহণ ক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ কোথায় তার কোনো ইঙ্গিত নেই এবং দ্বিতীয়ত প্রজাতির অন্তর্গত প্রকারণ-গুলি দ্বারা নিম্নতর প্রজাতির জীব উচ্চতর প্রজাতির জীবে এবং শেষ পর্য্যন্ত আদর্শস্থলীয় মনুষ্যপ্রজাতিতে কিরূপে অভিব্যক্ত হতে পারে তার কোনো হদিস নেই। প্রত্যক্ষবাদ-উপাসক বৈজ্ঞানিকগণের

প্রবৃত্তি সবসময়েই স্যাৎকে অস্তি দিয়ে এবং সম্ভাবনা বা আদর্শকে ঘটিত বা ভূত দিয়ে বুঝবার দিকে। তাঁদের মনের গড়নই এমন যে প্রত্যক্ষরূপে উপাত্ত বা উপাত্তদ্বারা পরোক্ষরূপে প্রমাণিত তত্ত্বের বহির্ভূত কোনো-কিছুর প্রতি তাঁরা সতত সংশয়শীল। সব-কিছুকে অবনত ও অবসন্ন করেই তাঁদের তৃপ্তি ও স্ফূর্তি। অতীন্দ্রিয় বস্তুতে তাঁরা অবিশ্বাসী; এমন কি যে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম অনুমিতিগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য দ্বারা পরীক্ষা করা সম্ভবপর নয় সেগুলির প্রতিও তাঁদের সন্দেহ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঈদৃশ কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যাঁদের, তাঁরা একমাত্র স্থূল অর্থপ্রাপ্তি ও প্রত্যক্ষ উপাত্তের উপাসক; তাঁদের কাছে অনুপাত্ত ও অসত্য একই জিনিষ।

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মানুষ একবৃত্তিক জীব নয়। আমাদের অতীত ও বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী গঠিত হয়েছে আমাদের ঘটিতরূপ। অনন্ত ভবিষ্যতের প্রয়োজন মিটোবার জন্য আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে রূপায়িত করবার কল্পনা করি। বস্তুত, মানুষকে একটি কল্পনা বা পরিকল্পনা বিশেষ বললে অত্যুক্তি হয় না। "আমাদের ঘটিত রূপটি এ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের স্বভাবে ও জীবনে যে ধারা, যে মূল্য ও যে প্রকাশদান করতে কৃতকার্য্য হয়েছি সেই কৃতকার্য্যতার রূপ। আমাদের এখনকার স্বভাব ও জীবনের মান বা নিয়মটির স্বরূপ হল সেটি এ-তাবৎ যে অভিব্যক্তি হয়েছে সেই অভিব্যক্তির উপযোগী একটি স্থায়ী আয়োজন বিশেষ এবং প্রণালী বিশেষ। আমাদের সম্ভাবনাগুলির দিকে দৃষ্টি-পাত করলে বুঝতে পারা যায় আমাদের স্বভাবে ও জীবনে, ভবিষ্যতে নূতনতর ধারা, নূতনতর মূল্য ও নূতনতর প্রকাশ আসবে এবং সেই নূতনতর অবস্থার উপযোগী আয়োজন ও প্রণালীগুলি হবে আমাদের তৎকালীন স্বভাব ও জীবনের মান বা নিয়ম।" (মানবিক ঐক্যের আদর্শ ১৭৬ পৃঃ দ্রঃ।) মানুষের ঘটিতরূপ ও সম্ভাব্যরূপের মধ্যে

বিশেষ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ অতিরক্ষণশীল বুদ্ধির প্রভাবে ভবিষ্যতের নিয়মকে অতীত ও বর্তমানের নিয়মের সঙ্গে একীভূত করে ফেলে এবং ভবিষ্যৎকে অতীত ও বর্তমানের একবিধ অস্পৃজনশীল পুনরাবৃত্তি বলে মনে করে। নিজ মূর্ত্ত ও ঘটিত প্রকৃতির প্রতি তার যতো বিশ্বাস নিজ সম্ভাবনা ও অমূর্ত প্রকৃতির তার ততো বিশ্বাস নেই। সেইজন্য অধিকাংশ সমাজেই বর্তমান ও ফলিত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান দৃশ্য পরিবেশ দ্বারা সে নিজেকে পরিচালিত করে এবং তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তেও সে যে-ভবিষ্যতের কল্পনা করে সে-ভবিষ্যৎ মূলত অতীত ও বর্ত্তমানের একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র। সমগ্রসত্তের পূর্ণ আদর্শে মানুষ তার জীবন পরিচালিত করতে অসমর্থ। বিশ্বলোকে সমগ্রসংকে পূর্ণতার ভঙ্গিতে প্রকাশের যে দায়িত্ব ও অধিকার মানুষের, তার সম্বন্ধে সে সচেতন নয়।

সৃজনশীল চেতনার ধর্ম্ম হল এটি একাধারে অতীত ও বর্ত্তমান ও সমগ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এটি ইতিহাসঘন এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা-ভিলাষী। সৃজনশীল মানুষের চেতনায় অতীত পুনরায় সঞ্জীব হয়ে ওঠে ও পুনরভিনীত হয়। সত্যিকারের ঐতিহাসিক চেতনার স্বরূপ এই যে এটি শুধু অতীতের পুনরাবৃত্তি বা কৃত্রিম পুনরুজ্জীবন নয়। আধুনিক মনুষ্যজাতি যদি নিজের অতীতকে বা তার নিজ পূর্বপুরুষদের ভাগ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলিকে অংশত বিস্মৃত হয়ে পূর্ব-পুরুষদের অজানা নূতনতর অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে, তাহলে তার দ্বারা আধুনিক সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব কিংবা দারিদ্র্য সূচিত হয় না। সেইরকম, অতীত ঋষিদের সমগ্রসৎ সম্পর্কে যে-জ্ঞান ছিল সেই-জ্ঞান, যে-দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেই-দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক মানুষের মধ্যে নেই এই যুক্তিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অতীত দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে হীনতর বলা চলে না। মহাকাব্যের বিশালতা ও নমস্য লেখকদের ঐশ্বর্য্যের স্থলে "পরবর্তীকালে মানুষের রাজনীতি, সমাজ জীবন,

বিজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য ও সর্ববিধ বিদ্যায় এসেছে এক ক্রম-বর্দ্ধমান সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও জ্ঞান এবং কর্ম্মের বহুমুখী প্রসার।" আধুনিক সংস্কৃতি অতীতকে পুনরভিনীত করবার ও ভবিষ্যৎকে আবিষ্কার করবার এক নূতনতম ভঙ্গি। মানুষের আধুনিক আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা, সন্ধানের গভীরতা ও ব্যাপকতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট।

অভিব্যক্তির গতি সেইজন্য দেখা যাচ্ছে সরলতা থেকে জটিলতার দিকে, নমনীয়তা থেকে অনমনীয়তার ভিতর দিয়ে পুনরায় নমনীয়তার দিকে, অচৈতন্য থেকে অজ্ঞানের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের দিকে। আমরা আগেই বলেছি এই যাত্রার পথে অনেক বাধা ও বিরুদ্ধতা আসে এবং অভিব্যক্তির ধারাটি সরল পথে কখনও চলে না। অভিব্যক্তির ধারার মাঝ পথে কখনো কখনো পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের ঘটনাও যে ঘটে এতথ্য সুবিদিত। এই পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের ঘটনাগুলি, হয় কেবল সাময়িক পতনের লক্ষণ নতুবা মন্দপক্ষে সেগুলি অগ্রগতির সর্পিল চিত্রের নিম্নগামী-অংশগুলির দ্যোতক। বস্তুত শেষপর্য্যন্ত প্রকৃতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতেই হবে। আত্ম-সচেতন মানুষ এই অগ্রগতির কর্ত্তা এবং যন্ত্র। চিচ্ছক্তির সংকল্পের দুর্নিবার প্রভাবে মানুষের অভিব্যক্তি ক্রমোন্নতিমূলক হতে বাধ্য। প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে; উত্থান-পতন-বন্ধুর পথ বেয়ে মানবকে অতি-মানবে রূপান্তরিত করে, মনকে অতিমানসে রূপান্তরিত করে মানুষের ভিতর দিয়ে ও মানুষের দ্বারা এই লক্ষ্যটি মূর্ত্ত করাই প্রকৃতির কাজ। "কারণ, মানুষের কালচক্রগুলি বৃদ্ধিশীল ও অসম্পূর্ণ সমন্বয়ের বৃত্ত্যাকার এবং মানুষ যাতে পুনরায় অগ্রগতির বৃহত্তর বৃত্তিপথে নূতনযাত্রা শুরু করে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃতি মাঝে মাঝে অনেক কিছু ধ্বংস করে মানুষকে তার আদিম এবং পূর্বাবস্থায় ঠেলে দেয়।" (মানবিক চক্র ৯৮ পৃঃ দ্রঃ)

অগ্রগতি দুইরকমের ঃ মৌলিক অগ্রগতি এবং আভিযোজনিক অগ্রগতি। অভিযোজনাত্মক অগ্রগতির লক্ষণ হল এই যে তাতে অতীত অবস্থার থেকে বর্ত্তমান অবস্থার প্রভেদ চোখ ধাঁধানো নয় এবং সনাতন প্রথা, অতীত ইতিহাস এবং আধুনিকতা সবই তার মধ্যে সুসমন্বিত ও সুসংরক্ষিত। মৌলিক অগ্রগতির নামে মানুষ, বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে অতীতকে স্তূপীকৃত জঞ্জালের মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে, একেবারে নূতন করে প্রাথমিকস্তর থেকে আরম্ভ করবার সঙ্কল্প নিয়ে সম্মুখে একখানি সাদা ও শূন্য পট ও হাতের মুঠোয় একটি নূতন প্রতিলিপি রেখে নূতনতর মানুষ ও সভ্যতা সৃষ্টি করবার অসম্ভব দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মানুষের এমন একটি কল্পনা খুবই চিত্তাকর্ষক যে-মানুষ ইতিহাস দ্বারা অক্ষত বা অস্পৃষ্ট যে-মানুষের চতুর্দিকে দুষ্টপ্রভাবে প্রভাবান্বিত করবার কোনো সমাজ বা সভ্যতা নেই, কিন্তু সে-মানুষ নিতান্তই অসার কল্পনা; সে-মানুষ আদর্শবাদীর অলীক স্বপ্নমাত্র এবং বস্তুত সে-মানুষ কোথাও নেই। আভ্যন্তরীন কারণগুলির জন্যই প্রকৃত অগ্রগতি অভিযোজনমূলক হতে বাধ্য। এবং এই প্রকার অগ্রগতি ছন্দময় এবং অন্যোন্যসম্বন্ধী। ছন্দ, অন্যোন্যসম্বন্ধ প্রভৃতি উপাদানগুলি সবই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করে যে অভিব্যক্তির ইতিহাসের অভ্যন্তরে একটি গূঢ় অভিপ্রায় সতত ক্রিয়াশীল। মানবিক কালচক্রের ছন্দটি প্রকৃতি কর্ত্তৃক রূপায়িত চিতিশক্তির একটি সত্য মাত্র। লক্ষ্যাভিসারী অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্বগত আপত্তিগুলি নিরাকৃত করার পর শ্রীঅরবিন্দ মানবিক চক্রগুলিকে তাদের আভ্যন্তরীন অভিপ্রায়জনিত প্রবেগ ও চিৎশক্তির দ্বারা বোঝাবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বাহ্য জড়শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা বোঝাবার উপর নয়।

শ্রীঅরবিন্দ সমাজতত্ত্বের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং আধিপত্য স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সামাজিক শক্তিগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব,

ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। এই শক্তিগুলির মূল উৎস হল মনস্তাত্ত্বিক শক্তি এবং সামাজিক শক্তিগুলি মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ ও সেগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। চিতিশক্তি ও অভিপ্রায়ে বিশ্বাসী শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে মনোবৃত্তিক শক্তিগুলির পৃথক অস্তিত্ব আছে এবং সমাজনাসক তত্ত্বটির একাংশে মনোবৃত্তিক শক্তিগুলি এবং অপরাংশে জড়জাগতিক শক্তিগুলি এবং এই দ্বিবিধ শক্তিগুলির মধ্যে একপ্রকার সৌষম্য আছে। জড়-জাগতিক শক্তিগুলি তাদের উৎপত্তি, ক্রিয়া ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন নয়; কিন্তু মনোবৃত্তিক শক্তিগুলি তাদের উৎপত্তি, ক্রিয়া ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন, তা যতো কেন না অস্পষ্টরূপেই হক।

শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্যাভিসারী অভিব্যক্তিদর্শন ও ইতিহাসতত্ত্ব মার্ক্সীয় অভিব্যক্তিবাদ ও ইতিহাসতত্ত্বের পরিপন্থী। মার্ক্স বলেছেন: "সমস্ত ইতিহাসশাস্ত্রের মৌলিক বিষয়-বস্তু হবে প্রাকৃতিক উপাদান-গুলি ও মানুষের ক্রিয়াদ্বারা কালক্রমে সেগুলির পরিবর্ত্তনের কাহিনী।" "প্রাকৃতিক উপাদান" বলতে মার্ক্স বোঝেন ভূতাত্ত্বিক ভৌগলিক জলবায়ুসম্বন্ধীয় ও মানুষের পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যগুলি। শ্রীঅরবিন্দের মত হল এই যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলির পরিবর্ত্তন সাধিত হয় মনুষ্য ও মনুষ্যেতর উভয়স্তরেই গূঢ় অভিপ্রায়ের অনুপ্রেরণায়। এমন কি যখন মানুষ সক্রিয় ও সচেতনভাবে প্রাকৃতিক উপাদানগুলির রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন সাধন করতে উদ্যোগী হয় তখনও সে অজ্ঞানত প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়টির আনুবর্ত্তন করে মাত্র। মার্ক্সের কাছে এই মত অগ্রাহ্য। মার্ক্সের মতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস শাস্ত্রে প্রথমে নেওয়া উচিত প্রাকৃতিক উপাদানগুলির হিসাব; অতঃপর উৎপাদনশক্তি, মূলধন, সামাজিক আদানপ্রদানের বিবিধ ব্যবস্থা, এগুলির অধ্যয়ন প্রয়োজন; এবং এই সমস্ত উপাদানগুলিকে একত্রে ইতিহাসের বাস্তব উপাদান বলা চলে। এই যুক্তিটি

প্রসারিত করে মার্ক্স আরও ঘোষণা করেছেন যে ইতিহাসশাস্ত্রের প্রকৃত কাজ হচ্ছে সম্পদ-উৎপাদন-পদ্ধতি ও তজ্জনিত ও তৎ-সম্পর্কিত সামাজিক আদান প্রদান ব্যবস্থার অধ্যয়ন ও তাৎপর্য্য-নির্ণয়। (জার্মান আইডিওলজি।) প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে বাস্তব উপাদানে পরিণত করে মানুষ তার স্বকীয় কার্য্যকলাপ দ্বারা। এবং মানুষের যাবতীয় কার্য্য-কলাপের মধ্যে সম্পদ-উৎপাদন-সম্পর্কিত কার্য্য-কলাপগুলিই মার্ক্সের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে সামাজিক তত্ত্বে পরিণত করার ব্যাপারের মধ্যে মার্ক্স ঐশ্বরিক বা গূঢ় অভিপ্রায়মূলক কোনো কিছু স্বীকার করেন না।

অভিব্যক্তি-সম্পর্কিত মার্ক্সীয়দের প্রদত্ত জড়বাদী ব্যাখ্যাটি শুধু বাহ্য উপাদান ও পারিপার্শ্বিক বাহ্য ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টি দেয় এরকম অনুমান আমার মতে ভ্রান্ত। মনুষ্যদেহকে কেবলমাত্র একটি যন্ত্রের সঙ্গে সমতুল্য করা একবিধ হঠকারিতা হবে। এবং বহু মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদেরা এইরকম উক্তি সমর্থন করেন না। মানুষ পুরোপুরি যন্ত্রও নয় এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রব্যক্তিও নয়। জৈবশক্তিবিশ্বাসী দার্শনিকগণের ধারণা হল মানুষের জীবনকে তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ ও গুণাবলীর দ্বারাই নিঃশেষে ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু ধারণাটি প্রমাণ করা সুকঠিন। বস্তুত, আমরা কোনো একটি যৌগিক বস্তুকে বিশ্বের অবিশষ্ট অংশ থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে পরীক্ষা করতে অপারগ এবং সেইজন্য সেই যৌগিক বস্তুটি পুরোপুরি যন্ত্রভাবাপন্ন কিনা এটি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা অসম্ভব। কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মগুলি দ্বারা কিংবা কেবল মাত্র বাহ্য পরিবেশ দ্বারা কোনো যৌগিক বস্তুর ব্যাখ্যায় সর্বদাই কিছু পরিমাণ সন্দেহ এবং অনিশ্চিততার অবকাশ থাকে। পরিবেশের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উভয়মুখী সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে থাকাই প্রত্যেক

প্রকার প্রাণীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রাণীমাত্রেই শুধু যে কেবল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে তাই নয়, সে পরিবেশটিকেও নিজের উপযোগী করে নিতে চায় ও পারে। জীবদেহ ও তার পরিবেশের মধ্যে একটি স্থির রেখা টানা অসম্ভব; সুতরাং কতটুকু জীবদেহের স্বয়ংক্রিয়া ও কতটুকু পরিবেশের প্রভাব, এটি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। এ কথা অনস্বীকার্য যে জৈব অভিব্যক্তির লক্ষণ হল জীবকর্ত্তৃক ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতরূপে উত্তরোত্তর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতালাভ।

কার্টেসীয় চিন্তাধারা এখনও সরে যায় নি। দেকার্ট মনে করতেন মনুষ্যদেহ একটি জটিল যন্ত্রবিশেষ। হ্যালডেনের মতো যাঁরা সর্বব্যাপারে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক তাঁরাও একথা স্বীকার করেন যে জীবদেহের আচরণ ও ব্যবহারগুলি সমগ্রভাবে বিচার করলে সেগুলি যন্ত্রভাবাপন্ন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তাঁরা বরঞ্চ বলেন যে "জীবদেহ যন্ত্রের চেয়ে উন্নততর ধরণের বস্তু; কারণ, জীবদেহে যে প্রকৃতির ঐক্য আছে যন্ত্রের সেই-প্রকৃতির ঐক্যের নিতান্ত অভাব।" (মার্ক্সীয় দর্শন এবং বিজ্ঞান; জে. বি. এস্. হ্যালডেন. লণ্ডন ১৯৩৯ পৃঃ ১০৪ দ্রঃ) যন্ত্র নিজেকে নিজে মেরামত করতে পারে না; কিন্তু জীবদেহের এই ক্ষমতা আছে যে মারাত্মকরূপে দেহটি যদি নষ্ট না হয়ে থাকে এটি স্বতই নিজেকে সারিয়ে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জীবদেহেরই মৃত্যু অবধারিত। এই ব্যাপারটি থেকে প্রমাণিত হয় যে জৈব ক্রিয়াগুলির নিয়মগুলির চেয়ে জড়জগতের নিয়মগুলি অধিকতর শক্তিশালী।

মানুষের অভিব্যক্তিব্যাপারে জড়বাদীদের সাধারণ সূত্রটির অতথ্যতা প্রমাণ করবার জন্য হয়তো ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মের দুর্বলতাটি প্রকটিত করা অসঙ্গত হবে। কারণ, আমাদের

হয়তো এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে ডারউইন তাঁর অভিব্যক্তি সম্পর্কিত মতবাদটি সমর্থন করবার জন্য শুধু প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথাই বলেন নি, তিনি জীব কর্তৃক জীবদেহ ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলগুলির বংশগতির কথাও উল্লেখ করেছেন। একথা সত্য যে পরবর্তী যুক্তিটি লামার্ক ও স্পেন্সার যতোটা দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন ডারউইন ততোটা দৃঢ়তা দেখান নি। নয়-প্রতিনয়-সমন্বয় নীতির প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ফলে স্বাভাবিকতই এংগেলস্ ডারউইনের চেয়ে লামার্কের দ্বারা বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছেন। ডারউইন প্রকারণতত্ত্বটিকে, তার চেয়ে বরং বংশগত প্রকারণতত্ত্বটিকে বিনা বিচারেই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং এই ব্যাপারগুলির কারণ অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করেন নি। বংশপতিতত্ত্বদ্বারা অতি প্রভাবিত হওয়ার ফলে তিনি বিপরিণতি (mantion) নামক ব্যাপারটির দিকে ভাল করে নজর দেন নি। কিন্তু বিপরিণতির ঘটনাগুলি অংশত বংশগতিতত্ত্বটির পরিপন্থী। বিপরিণতির ঘটনাগুলি সাধারণত জীবদেহ ও তার পরিবেশের ভিতর স্বাভাবিক সম্বন্ধের ক্ষতিসাধন করে এবং সেইজন্য অভিব্যক্তির দৃষ্টি থেকে সেগুলি অনিষ্টকারক। এই কারণেই বহু জীববিজ্ঞানী অভি-ব্যক্তির ব্যাপারে বিপরিণতির ঘটনাগুলির কারকত্ব অস্বীকার করেন। কিন্তু গুণগত অভিনবত্বের প্রশ্নটির উত্তর প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মের মধ্যে পাওয়া যায় না; কারণ, ওই নিয়মটি হল নাশাত্মক। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বদ্বারা বড় জোর অভিনবগুণের স্থিতির কারণটি বোঝা যায়। এই নূতন নূতন গুণগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা উৎপন্ন নয়। মার্ক্সপন্থীদের মধ্যে ডারউইনের প্রতি বিমুখতা এবং লামার্কের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এই কারণেই। আধুনিক মার্ক্সপন্থীদের ধারণা, অভিনব গুণগুলির জনকস্থানীয় হচ্ছে পরিবেশের যান্ত্রিক প্রভাব ও পরিবেশের সৃজনশীল প্রভাব। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় কেউ

কেউ লামার্কীয় মতবাদটিকে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবাপন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং অপর কেউ কেউ স্থলবিশেষে সেটিকে সৃজনশীলতার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এংগেল্‌স ও অন্যান্য বহু মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদেরা যান্ত্রিক ভাবাপন্ন দৃষ্টির সমর্থক ; তাঁদের মতে পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাব জাত জীবদেহের পরিবর্তনগুলি বংশগত হয়।

হ্যালডেনের অভিব্যক্তি সম্পর্কিত মতটি অন্যধরণের। তাঁর মতে নির্বাচন ও বিপরিণতি এই দুইটি ব্যাপারের দ্বন্দ্ব থেকেই অভিব্যক্তি। এবং তাঁর ধারণা এই দুইটি নিয়েই হল অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সৃজনশীল মার্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই ভঙ্গিটির বহু প্রমাণ বর্ত্তমান জীববিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ তথ্যের মধ্যে মেলে।

সুপরিচিত সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক লাইসেংকো ডারউইনের মতবাদটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন না। তাঁর মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মটি অত্যন্ত বর্ণহীন ও বৈচিত্র্যহীন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে তার বড়ো অমিল। মেণ্ডেল এবং মর্গান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের প্রচারিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বংশগতির নিয়মগুলিও লাইসেংকোর মতে অগ্রাহ্য। মেণ্ডেল ও মর্গানের মতে জীবকোষের কেন্দ্রস্থানীয় ক্রোমোসোমগুলি বা তদন্তর্গত জনিগুলি (Genes) বংশগতির বাহক। ক্রোমোসোম ও জনির সংগঠনের পরিবর্ত্তন হচ্ছে বিপরিণতি ও বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তদের মূলীভূত কারণ এবং জনির সংগঠনের পরিবর্ত্তন কৃত্রিমরূপেও করা সম্ভবপর। লাইসেংকোর ধারণা বংশগতির কোনো নির্দিষ্ট বাহক নেই। তার গোড়ার সূত্রটি হল জীবদেহ ও পরিবেশ এই দুইটি মিলে একটি দ্বন্দ্বময় অখণ্ডতা। পরিবেশের পরিবর্ত্তনের দ্বারা জীবদেহের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনা যায় এবং এই পরিবর্ত্তনগুলি বংশগত ধারায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। লাইসেংকোর মতে বংশগতি কোনো স্থির ও পৃথক তত্ত্ব নয়। পরিবেশের যে প্রভাবগুলি পূর্ববর্ত্তী বংশপর্য্যায়ের

জীবদেহগুলি কর্ত্তৃক আত্তীকৃত হয়েছে সেইগুলির একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত রূপের নাম হচ্ছে বংশগতি। সচরাচর যে জীবদেহগুলির বংশগতিশক্তি সংরক্ষণশীল সেগুলি প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবগুলি আত্তীকৃত করতে অক্ষম। কিন্তু যেসব জীবদেহের বংশগতিশক্তি উদার তারা বাছাবাছি না করে সব রকম পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং তাদের গ্রহণশক্তি অধিকতর হওয়ার জন্য তাদের বৃদ্ধিও বেশী।

ডারউইনের মত অনুসারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রণালী দ্বারা অন্তবর্ত্তী জীবগুলি বিলুপ্ত হয় এবং সেইজন্য হাজার হাজার বছরের অভিব্যক্তির ফলে বিভিন্ন প্রকারের জীব থেকে জীবপ্রজাতি ও বহুবিধ জীবপ্রজাতির থেকে জীবগণ উদ্ভূত হয়। লাইসেংকো এই মতের সমালোচক। (দ্বন্দ্বময় জড়বাদঃ সোভিয়েত য়ুনিয়নের দর্শনের ঐতিহাসিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরীক্ষা, গুস্তাফ্‌ এ হেবটার, পিটার হেল্‌থ কর্ত্তৃক অনূদিত, লণ্ডন ১৯৫৮, ৪৫৫-৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) তিনি দাবী করেন যে তিনি বৈজ্ঞানিকরূপে এক প্রজাতির জীবকে অন্য প্রজাতিতে পরিণত করবার সম্ভাবনাকে প্রতিপন্ন করেছেন। কোনো জীবদেহের প্রজাতি-অন্তর্গত সংগঠনটি পুরোপুরি না জানা থাকলে বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে কোন্ সম্বন্ধটি উৎকৃষ্ট এবং পরিবেশ ও জীবদেহের সঙ্গে কাম্যতম ঐকরূপ কি হবে তা নির্ভুলভাবে ধরা যায় না। মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদেরা মনে করেন প্রত্যেক জীবদেহের মধ্যে এমন-কিছু আছে যেটির জন্য পরিবেশের অনেকগুলি প্রভাব সে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করে এবং অনেকগুলি প্রভাবকে বর্জন করে। কিন্তু জীবদেহের এই স্বকীয়তাকে লাইসেংকো আধ্যাত্মিক বা চৈত্তিক ধর্ম্মগত কোনো-কিছু মনে করেন না। এছাড়া মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা তাঁদের দ্বন্দ্বময় দৃষ্টিভঙ্গিটিকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফারাক করে দেখতে সর্বদাই তৎপর ও আগ্রহী। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁরা

যান্ত্রিকতাবাদ এবং নিমিত্তবাদকে সমর্থন করেন তবু তাঁরা জীবদেহের সৃজনশীল সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা, আরম্ভকারিত্ব এবং স্বতোক্রিয়ার সত্যতাও প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। তাঁদের মতে বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ ও সৃজনশীল নিমিত্তবাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

মার্ক্সীয় দর্পনের উদার ব্যাখ্যা যাই কিছু হক না কেন একথা অস্বীকার করা চলে না যে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা তাঁদের তত্ত্বটির ফলিত ও রাজনৈতিক তাৎপর্যগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তথ্যত, ডারউনের প্রতি তাঁদের বিরোধিতার একটি প্রধান কারণ হল এই যে ডারউনের মতবাদ সত্য স্বীকার করলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি প্রবল যুক্তি-খাড়া হয়। ম্যালথাশ্ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে ডারউইন জীবনসংগ্রামকে ব্যষ্টিজীব ও ব্যষ্টিজীবের মধ্যে একটি বাহ্যসংগ্রামরূপে দেখেছেন, জীবসমষ্টি ও পরিবেশের মধ্যে সংগ্রামরূপে নয় এবং ডারউনের দৃষ্টিতে এই সংগ্রামটি বাহ্য অভি-যোজনের ব্যাপার, কোনো আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম নয়। এছাড়া মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদেরা অভিব্যক্তি যে একটি অবারিত ও ক্রমিকতাধর্মী ব্যাপার এই ধারণাটিও অস্বীকার করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লবে আস্থাবান; সুতরাং তাঁদের অভিব্যক্তি সম্পর্কে এমন একটি মতবাদের প্রয়োজন যে মতবাদে মাঝে মাঝে অক্রমিক ঝম্পপ্রদান বা উল্লম্ফন বা সঙ্কিক্ষণের মূল্য স্বীকৃত।

অভিব্যক্তি ও মানবিক চক্র সম্পর্কিত শ্রীঅরবিন্দের মতটিরও রাজ-নৈতিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে শ্রীঅরবিন্দ দাবি করেন যে তাঁর মতবাদটি মানবিক ইতিহাসে ঐশ্বরিক অভিপ্রায় বিকাশের একটি ন্যূণাধিক সত্য বর্ণনা, অপরদিকে মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদরা ঘোষণা করেন যে ঐশ্বরিক অভিপ্রায়নামক কোনো বস্তু নেই এবং ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষই ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ প্রত্যক্ষরূপে অর্থনৈতিক নিয়মগুলির এবং পরোক্ষরূপে প্রকৃতির

নিয়মগুলির বশবর্তী এবং স্বাধীনভাবে ইতিহাস সৃষ্টি ও পরিবর্তন করবার তার ক্ষমতা সব সময়েই সীমিত, কখনও নিরঙ্কুশ নয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা হচ্ছে ঈশ্বর মানুষকে তার নিজ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রকৃতির অধীনে থেকেও মানুষ উন্নততর আদর্শ ও প্রশস্ততর স্বাধীনতা অন্বেষণের পথে অগ্রসর হতে সমর্থ। মানুষ তার সত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হতে চায়। এই আত্ম-সচেতনতাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান। কারণ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বরূপ হচ্ছে শুদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ চেতনা। জড়জগতের ও প্রাণজগতের নিয়মগুলির বশবর্তী হওয়ার দরুণ মানুষ তার সমগ্রসত্তা সম্বন্ধে মাত্র অংশত সচেতন, পূর্ণত নয়। কার্লমার্ক্স এবং অরবিন্দ দুইজনেই ভিন্নভাবে একই কথা বলেছেন: মানুষ তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিয়তির স্রষ্টা, যদি সম্পূর্ণত নয়।

কিন্তু উভয়ের আপাতদৃশ্য ঐক্যসত্বেও উভয়ের মৌলিক পার্থক্য-টির প্রতি অন্ধ হওয়া অনুচিত। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দ কল্পিত সমাজশাস্ত্রের তাত্বিক ধারণাগুলি নিষ্প্রয়োজন এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে অগ্রাহ্য। এবং অরবিন্দ তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাটি মানুষের ইতিহাসের শুধুমাত্র বহিরঙ্গ এবং বাহ্য প্রক্রিয়াগুলি সংশ্লিষ্ট। তাঁর অভিযোগ এই যে, মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা ঐতিহাসিক ধারার গভীর কারণ-গুলি অনুসন্ধান করতে অনিচ্ছুক। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেন যে বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন দেশের সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কতকগুলি সুনিশ্চিত ছন্দ পরিলক্ষিত হয় এবং এগুলি থেকে মনে হয় ইতিহাসের কতকগুলি সর্বসাধারণ নিয়ম আছে। শ্রীঅরবিন্দও ইতিহাসের কতগুলি ছন্দ লক্ষ্য করেছেন। তাঁর বিচারে ইতিহাসের অভিব্যক্তিব্যাপারটি উচ্চতর এক বুদ্ধিশক্তির ক্রিয়ার ফল। সেই জন্য ইতিহাসের কতগুলি সাধারণ ক্রম বা ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করতে তাঁর পক্ষে তত্ত্বগত বাধা অনেক কম। তথাকথিত ইতিহাস

সম্পর্কিত মার্ক্সীয় নিয়মগুলি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়মূলক কার্যবিধির বাহ্য ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষরূপের বিবরণ মাত্র। তিনি বাহ্য ধারাগুলির সঙ্গে গভীরতর নিয়মগুলির কোনো বিরোধ দেখতে পান নি। তাঁর আত্মসমর্থনে তিনি বলেন যে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদের প্রতি আনুগত্য এতো দৃঢ় যে তাঁদের পক্ষে মানুষের ইতিহাসের গভীর ও স্থায়ী নিয়মগুলি আবিষ্কার করা অসম্ভব।

*

শতবর্ষের প্রণাম

অধ্যাপক নিমাই বিশ্বাস

প্রণাম জানাই হে ঋষি তোমাকে শতবর্ষের প্রান্তে।
সবার জীবন যুক্ত হউক তোমার জীবনস্রোতে।
পথ খুঁজে যারা পায়নিকো পথ, হয়েছে দিশাহারা।
দুহাত বাড়িয়ে ডাকিছ তাদের তুমি এক ধ্রুবতারা।
তৃষিত প্রাণ কর সিঞ্চিত শান্তির বারিধারায়।
কর নির্ভয় আন প্রত্যয় তোমার জীবনধারায়।
জীবন কি শুধু জীবন ধারণ, নেই কো উত্তরণ?
এই প্রশ্নের উত্তর যেন তোমার জীবন যাপন।
উত্তাল এই অশান্ত বিশ্ব তোমার প্রশান্ত সাগরে,
শান্ত হোক সংযত হোক তোমার অতল গভীরে।
মানুষের মাঝে মুক্তি নিহিত, স্বর্গ সুষমা জীবনে।
নিজের উপমা নিজে হয়ে আছ, সূর্য যেমন কিরণে।
কত ধারা মিশি তুমি মহর্ষি হে ঋষি অরবিন্দ।
পূত পবিত্র তুমি প্রশান্ত, তুমি যে জীবনানন্দ।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে অভিব্যক্তির স্বরূপ

শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার

বিখ্যাত চৈতন্যবাদী ইংরেজ দার্শনিক ব্রেডলি পরমার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছেন সেগুলির কয়েক স্থলের শূন্যতা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে পূরণ করেছেন। সুতরাং ব্রেডলির মূল-সিদ্ধান্তগুলি আমি প্রথমে সংক্ষেপে প্রকটিত করব। অতঃপর সেগুলির কোথায় ফাঁক আছে সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করব। এবং সর্বশেষে শ্রীঅরবিন্দ সেই ফাঁকগুলি কিরূপে ভরে দিয়েছেন তাই বলব। আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের এইটিই হবে লক্ষ্য।

ব্রেডলি তাঁর Appearance and Reality (অবভাস ও তত্ত্ব বস্তুবিচার) নামক গ্রন্থে যে চারটি মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেগুলি হল এই। প্রথমত, তিনি বলেছেন যে একমাত্র অদ্বিতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরমার্থের মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের ভেদ বিলুপ্ত। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন যে কালের প্রবাহের মধ্যে কোন জিনিসের স্বধর্ম্মের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব নয়। কোনো জিনিসের নিজ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পক্ষে কালের মধ্যে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। শাশ্বত সত্যগুলো কোনো ক্ষেত্রেই দেশ ও কালের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক সত্যকেই প্রকাশ লাভ করতে হয়; তবে প্রকাশের অর্থ এই নয় যে ইন্দ্রিয়-অনুভূতির চতুঃসীমার মধ্যে তাকে যথার্থভাবে আবির্ভূত হতে হবে। শাশ্বতসত্যগুলোর দেশ ও কালের মধ্যে প্রবেশ যেন প্রবেশের ভাণমাত্র এবং সেগুলোর প্রকাশ নানাভাবে বিকৃত। তাঁর তৃতীয় উক্তিটি হল এই যে সর্বময়ের (পরমার্থের) ঐক্য-সৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রতীয়মান সত্তার দান আছে ও থাকা প্রয়োজন। বস্তুসত্তা ব্যতীত অবভাস অসম্ভব। কারণ অবভাস

মানেই কোনো-কিছুর অবভাস। এবং অবভাস ব্যতীত বস্তুসত্তাও অসম্ভব। কারণ অবভাসের বাইরে কোনো কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়। "অবভাস ছাড়া পরমবস্তুর অন্য কোন ধন-দৌলত নেই; অথচ পরমবস্তুর যদি একমাত্র এই ধনদৌলত থাকে তাহলে পরমবস্তু দেউলিয়া হতে বাধ্য।" (মৎ অনূদিত ব্রেডলির অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) চতুর্থত তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে পরমার্থসতের নিজের ক্রমিক উন্নতি বা প্রাগ্রসরণ বলে কিছুই থাকতে পারে না। পরমার্থসতের নিজের কোন উত্থান পতনের ইতিহাস নেই। এইজন্যই ব্রেডলির সেই প্রসিদ্ধ উক্তি। "পরমার্থের কোনো ঋতু নেই; ফল, ফুল ও পল্লবের সমুদ্গম সেখানে একই সঙ্গে এবং ইচ্ছামাত্র। আমাদের ধরনীর মতো সবসময়েই সেখানে শীত ও গ্রীষ্ম এবং আমাদের ধরনীর মতোই কখনো সেখানে শীতও নেই বা গ্রীষ্মও নেই।" (মৎ-অনূদিত একই গ্রন্থের ২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এই চারটি সিদ্ধান্ত থেকে আর একটি অনুসিদ্ধান্ত ব্রেডলি বাধ্য হয়েই স্বীকার করেছেন। সেই অনুসিদ্ধান্তটি অভিব্যক্তির দার্শনিক স্বরূপ সম্বন্ধীয়। তিনি বলেছেন ক্রমবিকাশের বিভিন্নস্তরের উদ্ভব কালের মধ্যে কি করে হল এবং কি ক্রম অনুযায়ী সেগুলোর উদ্ভব হল এবং এইসব উদ্ভবের কারণ কি এই আলোচনাগুলি দর্শনের বিষয়গত নয়। দর্শনে ক্রমবিকাশের বা ক্রমোন্নতির ধারণাটি কালোপহিত হতে পারে না। দর্শনে 'উচ্চতর' ও 'নিম্নতর' শব্দদুটো এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা পরাকাষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করে দর্শনে এই শব্দগুলোর ব্যবহার সম্মত; এবং সেখানে এই শব্দগুলো শুধু সত্তার মর্য্যাদা নির্ণয় করে। সুতরাং দার্শনিক দৃষ্টিতে ক্রমোন্নতি মানে কালের ধারার মধ্যে ক্রমোন্নতি নয়।

ব্রেডলির চিন্তানুসারে সর্ববিধ প্রতীয়মান সত্তা তথাভূতরূপে

পারমার্থিক সত্য না হলেও সেগুলো অন্য কোনো একরূপে পরমার্থের অংশীভূত বা অঙ্গীভূত, এবং সেইজন্য পরমার্থত সত্য। বিভিন্ন আপাতদৃষ্টিক সত্তাগুলির লক্ষণই এই যে, সেগুলি অপূর্ণ ও অখণ্ড। সেগুলি রূপান্তরিত হয়ে সর্বসমগ্রের পূর্ণতা ও অখণ্ডব্যক্তিতার মধ্যে সুসমঞ্জসরূপে বিদ্যমান। আপাতদৃষ্টিক সত্তাগুলির অপূর্ণতা বা অসংহতির প্রমাণস্বরূপ তিনি সেগুলির যে ধর্মটির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন সেটি হচ্ছে এই যে সর্বপ্রকার ব্যবহারিক বা প্রাকৃত সত্তার গঠনে ভাব ও অস্তিত্বের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক। এই ভেদটি পরমবস্তুর মধ্যে নেই। তাঁর বিচারে, তাকেই পরমবস্তু বলি যার মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য ও পূর্ণসংযোগ আছে। সুতরাং ব্রেডলির মূল সিদ্ধান্ত হল প্রতীয়মান জীববিশিষ্ট জগৎ যেরূপে প্রতিভাত সেইরূপে সত্য ও বাস্তব নয়। তাঁর অপর বক্তব্য হল এই যে পরমার্থের অবভাসসমূহকে প্রয়োজন; সেগুলি না থাকলে পরমার্থের চলে না; অবভাস ব্যতীত বস্তুসত্তা অসম্ভব; কারণ অবভাসের বাইরে কোনো কিছু নেই। এইজন্যই তিনি বলেছেন অবভাস ছাড়া অন্য কোন ধনদৌলত পরমার্থের নেই। ব্রেডলির এই বক্তব্যগুলি কি অর্থে সত্য বোঝা কঠিন। পরমার্থের প্রয়োজনই বা কি এবং অবভাসগুলি সেই প্রয়োজন কিরূপে মেটায় বুঝতে কষ্ট হয়। শংকরের মতো অবভাসিত সত্তাগুলি তিনি পুরোপুরি মিথ্যা অথচ অনলীক এরকম বলেন না। ব্রেডলি স্বীকার করেছেন যে পরম চৈতন্যের বহুধা প্রকাশ হল এক অনির্বচনীয় ব্যাপার। সুতরাং লক্ষণীয় যে ব্রেডলির দর্শনের মধ্যে শূন্যস্থল দুটি। প্রথমটি হল: পরমার্থসৎ কেন জীবজগৎ রূপে অবভাসিত হন এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন এই অবভাস কিরূপে সম্ভবপর। তিনি বলেছেন, পরমার্থসৎ এক অর্থে অসত্য, অসুন্দর ও অশিব। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় পূর্ণসৎ অসত্য, অসুন্দর ও অশিবরূপে প্রতিভাত

হন কেন এবং কিরূপে। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ব্রেডলির উক্তিটিই এক্ষেত্রে বিচার্য্য। পরমার্থসত্তের কোনো ঋতু নেই বা ক্রমবিকাশ নেই ; অথচ তাঁর মতে শাশ্বত সত্যকে প্রকাশলাভ করতেই হয় এবং প্রকাশিত বা অবভাসিত সত্তার সত্য ও বাস্তবতা অনুযায়ী শ্রেণীভেদ আছে। এখানেও দ্রষ্টব্য যে ব্রেডলি একটি শূন্যস্থান রেখেছেন। সেটি হল এই যে অবভাসিত হওয়া যদি একটি বাস্তব প্রয়োজন হয় এবং অবভাসিত সত্তাগুলির বাস্তবতার যদি মাত্রাভেদ থাকে তাহলে ক্রমবিকাশ হল একটি মিথ্যা এবং কাল্পনিক ব্যাপার, এইরূপ কি বলা চলে ? নিশ্চয়ই চলে না। তাহলে ক্রমবিকাশের পারমার্থিক অর্থ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর ব্রেডলি দেন নি। এইটি আর একটি শূন্যস্থল। ব্রেডলি দেশ ও কালের মধ্যে প্রকাশকে প্রকাশের ভাগ বলেছেন। এবং বলেছেন যে দার্শনিক বিচারে ক্রমবিকাশের অর্থ হল পরাকাষ্ঠা স্থানীয় স্বয়ংসতের সঙ্গে তুলনা করে বিভিন্ন প্রতীয়মান সত্তাগুলির বাস্তবতার মাত্রা নির্ণয়। এই দৃষ্টি থেকে কালোপহিত ক্রমবিকাশ দার্শনিক বিচারে অগ্রাহ্য, সুতরাং অসত্য। তাই যদি হয় তাহলে প্রশ্ন থাকে কালব্যতীত ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ কি বুদ্ধি-সম্মত এবং কাল যদি পরমার্থত বাস্তব না হয় তাহলে কালাতীত বা কালহীন অবস্থায় বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশের অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি ? এটিও ব্রেডলির দর্শনে একটি অপূরিত স্থল। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে উপরি-উক্ত কয়েকটি শূন্যস্থল পূরিত হয়েছে। এবং ব্রেডলির দর্শনে যে প্রশ্নগুলি অমীমাংসিত, সেগুলির সদুত্তর আমরা শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে পাই।

ব্রেডলির মতো শ্রীঅরবিন্দের মত হল এই যে পরমার্থসৎ চৈতন্যস্বরূপ ; ব্রেডলির সিদ্ধান্ত হল যে পরমার্থে দুঃখের চাইতে সুখের অংশ অধিকতর, অর্থাৎ পরমার্থসৎ সমগ্রত আনন্দময় কিংবা আনন্দস্বরূপ। ব্রেডলির মতে সত্তার বস্তুতা নির্ণয়ের দুটি মান।

প্রথমটি হল ব্যাপকতা এবং দ্বিতীয়টি আত্মসংগতি বা গভীরতা। যে-সত্তা বৃহত্তর ক্ষেত্র অধিকার করে থাকে তার অন্তরে অসংগতির ক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর। আপূরণ ও রূপান্তর ব্যাপার ব্যাপকতা ও গভীরতা এই দুটি তত্ত্বেরই বিভিন্ন বিভাব। যে-সত্তাটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার তত্ত্বে সংশোধিত করতে অধিকতর রূপান্তর দরকার যে সত্তাটি অধিকতর অসংগতিতে দূষিত; যে-সত্তাটির স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনতে অধিকতর আপূরণ দরকার যে সত্তাটির ব্যাপকতা ক্ষুদ্রতর। শ্রীঅরবিন্দের মতে তুঙ্গতর বস্তুসত্তার লক্ষণ হল তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা বা আত্ম-সংহতি; উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের ফলস্বরূপ হল সূক্ষ্মতর ও জটিলতর সংগতি এবং বৃহত্তর প্রসার বা ব্যাপ্তি। বৈদান্তিক দর্শনের বিক্ষেপক্রিয়ার বিপরীত হল রূপান্তর এবং আবরণক্রিয়ার বিপরীত হল আপূরণ। এখন ব্রেডলির শূন্যস্থলগুলিতে আসা যাক। প্রথম ফাঁক হচ্ছে পরমার্থসৎ জীবজগৎরূপে অবভাসিত হন কেন এবং এই অবভাস অর্থাৎ সৃষ্টিব্যাপার কি করে সম্ভবপর? দ্বিতীয় উত্তরহীন প্রশ্ন হলো অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের কোনো পারমার্থিক অর্থ আছে কি না? তৃতীয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হল: লোক-সংস্থানের মধ্যে অভি-ব্যক্তি অর্থাৎ দেশ ও কালের মধ্যে ক্রমোন্নতি বা উত্তরায়ণ ব্যতীত ক্রমোন্নতির অপর কোনো দার্শনিক অর্থ হতে পারে কি?

শ্রীঅরবিন্দের পরমার্থ নির্বিশেষ ও সবিশেষ, অনির্দেশ্য ও নির্দেশ্য, নির্গুণ ও সগুণ একাধারে ও যুগপৎ দুইই। ব্রহ্ম বিশ্বরূপে বিচ্ছুরিত হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ; প্রপঞ্চের উল্লাসে মাতোয়ারা হয়েও একাধারে ব্রহ্ম প্রপঞ্চশূন্য। এক কথায় ব্রহ্ম প্রপঞ্চক কিন্তু প্রবঞ্চক নন। এবং প্রপঞ্চের কারণ ব্রহ্মের মধ্যেই নিহিত আছে। লীলার আনন্দ সৃষ্টির নিহিতার্থ; এবং ব্রহ্মের মহামায়াশক্তি সৃষ্টির আদি ও মূলীভূত কারণ। এই শক্তি ব্রহ্মের বা পরমার্থসতের স্বরূপশক্তি। সৃষ্টি ব্যাপারটির দুইটি দিক। একটি হল নিগূহনের দিক অপরটি উন্মোচন

বা অভিব্যক্তির দিক। যে-হেতু ব্রহ্ম পরমার্থসৎ, সেই-হেতু তাঁর শক্তির কোনও সীমা নেই। এই মহামায়া শক্তির বলেই ব্রহ্ম জড় প্রাণ ও মনের স্তরে নিগূহিত হয়েছেন। পরম চৈতন্য অচেতন জড়ে কিরূপে পরিণত বা নিগূহিত এই প্রশ্নের উত্তর এখানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের শক্তি নির্বাধ ও অঘটনঘটনপটীয়সী। এই শক্তির দ্বারাই চৈতন্য ধর্মী ব্রহ্ম আপাতত-অচেতন জড়ে ও কিঞ্চিৎ-চেতন প্রাণে নিগূহিত হতে পারেন। এই মীমাংসাতে বুদ্ধি তৃপ্ত হয়, কারণ এই মীমাংসাতে বুদ্ধির কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। একদৃষ্টিতে সেইজন্য বলা চলে ব্রহ্মেরই একাংশ (এখানে মনে রাখা প্রয়োজন ব্রহ্মের বেলায় অংশ শব্দটি ঠিক প্রযোজ্য নয়) হল এই জীবজগৎ বিশিষ্ট দৃশ্যমান সত্তাটি। অর্থাৎ পরমার্থসৎ একাধারে জড় ও অজড়। সৃষ্টির লক্ষ্য হল নিগূহিতরূপী ব্রহ্মের লোক-সংস্থানের ও কাল-সংস্থানের মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্মরূপে অভিব্যক্তি। কিন্তু ব্রহ্মের অপর অংশ (আগেই বলেছি অংশ শব্দ ব্রহ্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও আমরা এটি এখানে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।) পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত এবং কালাতীত ও শাশ্বত। এবং ব্রহ্মের এই তুই অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ অবিরোধ ও অভিন্নতা। সৃষ্টির ব্যাপারে লোক-সংস্থানের ও কাল-সংস্থানের মধ্যে অভিব্যক্তির সেইজন্য পারমার্থিক মর্য্যাদা আছে। এই অভিব্যক্তিটিও ব্রহ্মের ক্রিয়া, তাঁর স্বসংকল্পে ও স্বেচ্ছায় আনন্দের তাড়নায়। অভিব্যক্তি ব্যাপারটিকে এইদিক থেকে পরমার্থত সত্য বলতে হয়। যদিও ব্রহ্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত এবং ব্রহ্মে কোনও ঋতু নেই, এই শাশ্বত কালাতীত ব্রহ্মতত্ত্বটিরই বহু এবং বিবিধ সত্তার মধ্যে একটি ঋত অনুযায়ী ক্রমশ প্রকাশিত হওয়ার সংকল্প থেকে দেশ ও কাল উপহিত বিরাট সৃষ্টি ব্যাপারটি সংঘটিত হয়। এই অভিব্যক্তির লক্ষ্য হল দেশ ও কাল সংস্থানের অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যমান সত্তাগুলির পরিপূর্ণ রূপান্তর। কোনও

অদ্বিতীয় কালাতীত শাশ্বত বস্তু যদি অসংখ্য বস্তুর মধ্যে পৌনঃপুনিক প্রকাশের দ্বারা বিভিন্নস্তরের একটি ক্রমিক সোপান অনুযায়ী নিজ পরিপূর্ণতার মধ্যে ফিরে যেতে চায় তাহলে দেশ-সংস্থানের প্রসার ও কাল সংস্থানের পরম্পরা ও প্রকাশের তারতম্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এবং এই সংস্থানদুটি আদিহীন ও অন্তহীন এবং সেইজন্য এদুটি সংস্থানের আকৃতি বা আকার শম্বুরেখার মতো প্রায় বর্তুল হতে হয়। সৃষ্টির আকৃতি শ্রীঅরবিন্দের মতে এইরূপ। শ্রীঅরবিন্দ অভিব্যক্তির স্তরভেদের নির্ণয়ণের যে মান বা সূত্র গ্রহণ করেছেন সেটিও ব্রেডলির এই বিষয়ক মানের সমতুল্য ও অভিন্ন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ব্রেডলির সঙ্গে একমত নন যে পরমার্থসতের নিজের উত্থানপতনের কোনও ইতিহাস নেই। শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধান্ত হল পরমার্থসৎ অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত, নিষ্ক্রিয় ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই একাংশে পতন-উত্থানশীল জীবজগৎবিশিষ্ট সৃষ্টি ব্যাপারটির আধার, অধিষ্ঠান, প্রযোজক, প্রবর্ত্তক ও আস্বাদক বা ভোক্তা এবং সেইজন্য সক্রিয়।

সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে সৃষ্টির ব্যাপারটি নিছক বুদ্ধিবিভ্রম-জাত হেঁয়ালি নয়। আত্ম-সঙ্কোচনবৃত্তি ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি এবং ধাপে ধাপে সর্পিল গতিতে নীচতর স্তর থেকে উচ্চতরস্তরে বিচ্ছুরণ বৃত্তিটিও তাঁর স্বরূপশক্তি। মহামায়াশক্তির এই দুইটি বিভাব বা ভঙ্গি। সৃষ্টি ব্যাপারটির অন্তর্গত অভিব্যক্তির ধারাটি সেইজন্য অলীক ত নয়ই তত্ত্বত অসত্যও নয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে পরমার্থ অসুন্দর, অসত্য এবং অশিবও কেন তার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য খুঁজে পাওয়া যায়। এবং ইতিহাসের ধারার অন্তর্গত ক্রমবিকাশের লক্ষ্যটি ধরা পড়ে। মনুষ্যজীবনের দিব্যজীবনে, এবং জড়প্রকৃতির দিব্যপ্রকৃতিতে রূপান্তরের দার্শনিক ভিত্তি ও যুক্তি এতে পাওয়া যায়; মর্ত্ত্যভূমি ও স্বর্গভূমির ব্যাবধান ঘুচে যায়; দৃশ্যমান জগতের প্রতিটি

কর্ম, প্রতিটি বেদনা, প্রতিটি ভাবনা, প্রতিটি প্রবৃত্তি, প্রতিটি কল্পনা ও প্রতিটি ঘটনা পারমার্থিক তাৎপর্য্যে গৌরবান্বিত হয়। বিশ্বের থেকে দুঃসহ বিচ্ছিন্নতাবোধের (alienation) স্থলে আসে বিশ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য নিবিড় সংযোগ বা আত্মীয়তাবোধ (reconciliation)। বর্ত্তমানে যুগের প্রধান ব্যাধি হল বিশ্বের সংগে অনাত্মীয়তার পীড়া ও নিঃসঙ্গতার গভীর দুঃখ। এই পীড়া ও দুঃখ যে আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিষময় ফল সেটি শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি ব্যাপার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি অনুধাবন করলে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়। এইটিই তাঁর প্রধান কীর্ত্তিত্ব। রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, মানুষের উন্মত্ততা, জীবে জীবে কামড়াকামড়ি ও এই রোরুদ্যমান শোনিতাশ্রুসার সংসার কিছুতেই বিচলিত হওয়ার সঙ্গত কারণ নেই। যে সত্যটি বুঝেছে যে স্থির ও অবিচলিত। চেতনার উত্তরায়ণ অর্থাৎ ব্যাপ্তি ও গভীরতা, সৃষ্টির গূঢ় ও একমাত্র লক্ষ্য এবং এটির কর্ত্তা ও প্রজোজক স্বয়ং ঈশ্বররূপী ব্রহ্ম। তবে মনুষ্যশ্রেণীর জীব উচ্চতর দিব্যজীবনের অধিকারী হবে, না অন্যপ্রকার মনুষ্যেতর কোনো নূতন জীব বৃহত্তর ও পূর্ণতর জীবন আনবে সেটি মহামায়াশক্তির সংকল্পের ব্যাপার। শ্রীঅরবিন্দের কথা অন্তত এই বিষয়ে অতি স্পষ্ট। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম কথাটি হল মানুষই মহামানবে অভিব্যক্ত হবে; এইটিই সৃষ্টি-ব্যাপারের একটি মূল ও প্রধান লক্ষ্য। এই ভাবের কথা ফরাসী মনীষী টিলহার্ড দ্য সার্দাও (Tielherd de Chardin) বলেছেন এবং আরও অন্যান্য পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রচ্ছন্নরূপে ও বিকৃতরূপে বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হল এই তত্ত্বটি। অভিব্যক্তি তত্ত্বের অপর প্রাণবস্ত কথা হল এই যে এই বিশ্বে কোথায়ও নিব্যূঢ় ও ঐকান্তিক নাস্তিত্ব থাকতে পারে না, অভাব ভাবেরই তির্য্যক প্রকাশ। এক কথায় গরীব কেউ বা কিছুই নয় এবং গরীবী হটবেই।

বর্তমান সঙ্কট ও শ্রীঅরবিন্দ

ডক্টর নীরদ বরণ চক্রবর্তী

সঙ্কট বিশ্বব্যাপী। শান্তি, স্বস্তি ও তৃপ্তি নেই কোথায়ও। আমরা দরিদ্র দেশের লোক। দারিদ্র্য আমাদের মুখ্য সমস্যা। দারিদ্র্যের জন্যই আমাদের যুবকেরা বিদ্রোহী। তারা এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থার জন্য ব্যাকুল যেখানে সমস্ত মানুষই দারিদ্র্য-মুক্ত।

কিন্তু, দারিদ্র্য-মুক্তিই কি সমস্ত সঙ্কট-মুক্তি? যদি তা-ই হ'ত তবে সম্পন্ন ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু, সমস্যার রকমফের থাকলেও এরা ত সমস্যা-মুক্ত নয়! এই সবদেশের যুবকেরাও ত বিদ্রোহী। প্রাচুর্য এদের তৃপ্তি দেয়নি, জীবনে শান্তি বা স্বস্তি আনেনি। ব্রিটেনের অনেক যুবক যুবতী সমাজদ্রোহী হয়ে বিটল সেজেছে, আমেরিকার অনেকে হিপি। অস্বাভাবিক, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মধ্যে তারা মুক্তি চাইছে। কিছুদিন আগেও ফ্রান্সের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা লঙ্কাকাণ্ডের নায়ক হয়ে মহা অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং সমস্যা শুধু দারিদ্র্যের নয়, সমস্যা প্রাচুর্য্যেরও।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরেও নানাবিধ সমস্যা। কম্যুনিষ্ট অকম্যুনিষ্ট দ্বন্দ্ব বাদ দিলেও কম্যুনিষ্ট—কম্যুনিষ্ট দ্বন্দ্ব, মুসলমান—অমুসলমান যুদ্ধ এবং আরও কতকি! বিশ্বজুড়ে নানা মত ও পথের দ্বন্দ্ব। আমরা মুখে যা বলি, কাজে তা করি না। অন্যের বেলায় যা কর্তব্য বলে উপদেশ দেই, নিজের বেলায় তা করণীয় বলে ভাবি না। চালাকি করে বাজার মাৎ করার একটা প্রবণতা বিশ্বজুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য এই যে, আমরা বুদ্ধিকে জীবনের নিয়ামক রূপে গ্রহণ করেছি বলেই এত অশান্তি। আমরা ভাবছি, চালাকি করে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলবো। কিন্তু, তাতে সমস্যা দূর ত হচ্ছেই না, বরং তা আরও জটিল হয়ে উঠছে। বুদ্ধির একটা সীমা আছে। বুদ্ধি কোন কিছুর গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। খণ্ড বা অংশ নিয়ে বুদ্ধির কারবার। সমগ্রকে গ্রহণ বা মূল স্পর্শ করার ক্ষমতা বুদ্ধির নেই। সেজন্যই বুদ্ধির সমাধান সামগ্রিক বা মূল সমাধান কখনই হতে পারে না। বুদ্ধি দিয়ে যে কোন জিনিষই সমর্থনও করা যায়, আবার অসমর্থনও করা যায়। কিন্তু, তাতে সত্য প্রকাশিত হয় না, সত্য-নির্ণয়ও করা যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেন, অভিব্যক্তির যে স্তরে আমরা এসে পৌঁছেছি তা হ'ল মন বা বুদ্ধির স্তর। এই স্তরে এই সঙ্কট ও সমস্যা স্বাভাবিক। এই সঙ্কট বা যুগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ মানবপ্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপান্তর-সাধন।[১]

এখানে প্রশ্ন উঠবে—শ্রীঅরবিন্দ মানবপ্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপান্তর-সাধন বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে শ্রীঅরবিন্দ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা জানা দরকার। তিনি বলেন, জড় থেকে প্রাণ এসেছে, প্রাণ থেকে মন এসেছে, এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে—জড় থেকে প্রাণ বা প্রাণ থেকে মন এলো কেন? যদি এর কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে হয় তা হ'লে বলতে হ'বে, জড়ের মধ্যে প্রাণের সম্ভাবনা ছিল এবং প্রাণের মধ্যে ছিল মনের সম্ভাবনা। যার মধ্যে যার সম্ভাবনা নেই তার থেকে তার উৎপত্তি হ'তে পারে না। ভারতীয়

1. 'If humanity is to survive, a radical transformation of human nature is indispensible' —Life Divine, 11, 23.

দর্শনে এই মতবাদকে সৎকার্যবাদ বলা হয়। এই কথা যদি গ্রহণ করি তা হ'লে বলতে হ'বে, মনের সম্ভাবনা প্রাণেও ছিল, জড়েও ছিল। অর্থাৎ, প্রাণে ও জড়ে মন প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। মন চেতন। কিন্তু, চৈতন্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ মনের মধ্যেও নেই। মনের বা বুদ্ধির স্তরে খণ্ড চৈতন্য খণ্ডিত ভাবে প্রকাশিত। চৈতন্যের অখণ্ড ও অবারিত প্রকাশ অতিমানস স্তরেই সম্ভব। আসলে এক অখণ্ড চৈতন্য জড়, প্রাণ, মন প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত করেছেন। মানুষের মধ্যে যেমন আছে জড়দেহ, প্রাণ ও মন, তেমনি আছে অতিমানস আত্মা। মানুষ এই অতিমানসলোকে উত্তীর্ণ হ'লে উপলব্ধি করে যে, তার আসল সত্তা এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা এবং এই উপলব্ধি তার দেহ, প্রাণ ও মন যে শুধু দেহ, প্রাণ ও মন নয়, চৈতন্য সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ তার ও অবগতি। এই উপলব্ধির ফলে মানব প্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। কারণ, এই উপলব্ধি হ'লে মানুষ আর নিজেকে শুধু দেহ-প্রাণ-মন-বিশিষ্ট জীব বলে মনে করে না, সে এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা রূপে অধিষ্ঠিত হয়। এরই নাম দিব্য বা ভাগবত জীবন, পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও আত্মিক জীবন। এই আত্মিক জীবন লাভের ফলে শুধু মানবপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হয়না, বহির্বিশ্বেরও সমূল পরিবর্তন হয়। এই বিশ্ব তখন শুধু জড় বস্তু, সাধারণ প্রাণী ও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের সমষ্টি বলে মনে হয়না, অখণ্ড চৈতন্যের বিচিত্র প্রকাশ বলে উপলব্ধি হয়। এর ফলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধের ও পরিবর্তন ঘটে। ব্যক্তি আত্মিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মার আলোয় অন্যকে দেখে। অন্যের সঙ্গে তখন আর তার দ্বন্দ্বের বা বিরোধের অবকাশ থাকেনা। এক অখণ্ড চৈতন্যের ভিত্তিতে সমস্ত খণ্ডতা, দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসান ঘটে। তখন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি, স্বস্তি ও তৃপ্তি।

শ্রীঅরবিন্দ এইজন্যই দিব্য জীবনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই জীবনলাভের জন্য উপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি বা বোধির কথা বলেছেন। খণ্ড খণ্ড করে দেখাই বুদ্ধির স্বভাব। অখণ্ড উপলব্ধিই বোধি শ্রীঅরবিন্দের মতে অভিব্যক্তির ধারাই এমন যে, মনের স্তরের মধ্য দিয়েই অতিমানস লোকে উত্তীর্ণ হ'তে হয়, বুদ্ধির স্তরের মধ্য দিয়েই বোধিতে উন্নীত হওয়া সম্ভব ; স্বর্গের পথ চলে নরকের মধ্য দিয়ে।[১] সুতরাং আজকের সঙ্কট বা যুগ যন্ত্রণাকে স্বাভাবিক বলেই মানতে হ'বে। এই সঙ্কটের মধ্য দিয়েই, যন্ত্রণার নিশাশেষে সুপ্রভাত আসৃবে। আমাদের কাজ হবে আন্তরিক চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা এই সুপ্রভাতের আগমন ত্বরান্বিত করা।

শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য একটু স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, খণ্ডিত দৃষ্টি এবং খণ্ডিত জীবনবোধের জন্যই বর্তমান সঙ্কট। অখণ্ড দৃষ্টি গ্রহণ এবং অখণ্ড জীবনচর্য্যায় এই সমস্যার সমাধান। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোতে মানুষের দেহ এবং বাহ্যজগতের ওপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষের আত্মা এবং আন্তর জীবনের ওপর তত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আবার আমাদের দেশে আমরা আত্মার জয়গান করতে গিয়ে দেহকে অবহেলা করেছি, জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবিনি। দুইই খণ্ডিত দৃষ্টির ফল। মানুষ দেহ এবং আত্মা দুই নিয়েই। পাশ্চাত্ত্য জগৎ দৈহিক সমস্যা বা জাগতিক সমস্যা-সমাধানের জন্য প্রচুর ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করেছে, তাতে ঐ সমস্যা মিটলেও আত্মিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোন মহৎ জীবন চেতনা সেখানকার মানুষদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি বলে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য সেখানে বিটল ও হিপিশ্রেণীর লোকের আবির্ভাব। আর আমাদের দেশে আমরা

---

১. ...'For daring Hell's Kingdoms winds the heavenly route'...
—Sri Aurobindo.

আত্মিক জীবনের কথা যত জোরে প্রচার করেছি, জাগতিক জীবনের সমস্যার দিকে তত বেশী উপেক্ষা প্রদর্শন করেছি। কিন্তু, জাগতিক জীবনকে বাদ দিয়ে আত্মিক জীবন যে সম্ভব নয়, দেহকে বাদ দিয়ে আত্মার কথা যে প্রায় অর্থহীন, একথা মনে রাখিনি। ফলে আমাদের দেশে চরম দারিদ্র্য প্রলয়ঙ্কর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সমস্যার যদি সমাধান করতে হয় তবে খণ্ডদৃষ্টি পরিত্যাগ করে অখণ্ড দৃষ্টি গ্রহণ করতে হ'বে। এই দৃষ্টি গ্রহণ করলে আমরা যেমন জাগতিক জীবনের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাববো তেমনি আবার আত্মিক জীবনের জন্য অর্থোৎপাদন ব্যবস্থাকে মানবাত্মার অধীনস্থ করে এই আত্মার সম্যক উপলব্ধির কথা ভাববো। দেহ এবং আত্মা, জাগতিক জীবন ও আত্মিক জীবনের সমন্বয় সাধন করতে পারলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'বে। মনে রাখতে হ'বে দেহ এবং আত্মা দুই মিলেই পরিপূর্ণ মানুষ, জাগতিক জীবন এবং আত্মিক জীবন দুই মিলেই পরিপূর্ণ জীবন এবং ভূমি ও ভূমা এই দুই মিলেই পরিপূর্ণ সত্য।

অখণ্ড দৃষ্টির অধিকারী হলে ব্যক্তি আর বুদ্ধির পথে অগ্রসর হয় না। সে তখন চালাকির চেয়ে আন্তরিকতার ওপর গুরুত্ব বেশী দেয়। চালাকি বুদ্ধির খণ্ডদৃষ্টির ফল। সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার জন্ম। আমরা যদি সামগ্রিক দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধি করে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করি তবেই সঙ্কটোত্তীর্ণ হ'তে পারবো। জাগতিক জীবনে উন্নতিও হ'বে আবার আত্মিক জীবনের আস্বাদন ও মিলবে। খণ্ড দৃষ্টির দ্বারা যেমন সমস্যার সমাধান হ'বে না, চালাকির দ্বারা ও তেমনি সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যার সমাধানের জন্য চাই অখণ্ড দৃষ্টি, আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠা।

শ্রীঅরবিন্দের পুরূরবা-উর্বশী-কথা

বাণী বসু

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় আমরা দাঁড়িয়ে আছি অজন্তার গুহাচিত্রমালা অথবা ইলোরার ভাস্কর্যের সামনে, যেখানে এই চিত্র এবং ভাস্কর্য কোন্ মন্ত্রবলে হয়েছে সচল, এবং সৃষ্টি করেছে সুরসুন্দর-সুন্দরীদের এক চলিষ্ণু জগৎ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনায় যে রাগিণীতে সিদ্ধ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় তার সুর তার তাল "রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে।" আক্ষরিক অর্থেই তিনি এক রূপদক্ষ কবি। শব্দের তুলিতে তিনি প্রতিমা গড়েন, চিন্তা করেন মূর্তির ভাষায়। "Songs To Myrtilla" থেকে "সাবিত্রী" পর্যন্ত বয়ে গেছে এক বিচিত্রস্রোতা কাব্যধারা—কখনও তাতে বর্ষার গৈরিক প্লাবন, কখনও বসন্তের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ববিলাস, কখনও শীতের অনুপচার মহিমা, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রতিফলিত হয়েছে নৃত্যপর জ্যোতিষ্কের মত গ্রীক-ইতালীয়-ভারতীয় পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মোহন প্রতিমা, তাদের ভংগীতে পৌরাণিক মাধুর্যের লাবণ্য বিকীর্ণ করে। কখনও তিনি ইউরোপীয় পুরাণের রতিদেবী ভেনাসের প্রতি জানাচ্ছেন তাঁর কিশোর-কণ্ঠের আহ্বান :

O Lady venus shine on me,
O rose-crowned Goddess from thy seas
Radiant among the cyclades !

কখনও ভারতের প্রিয় দেবদেবীদের রূপবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে উচ্চারণ করছেন :

We have love for a boy who is dark and resplendent
A woman is lord of us, naked and fierce,
We have seen him a-muse on the snow of the
mountains,
We have watched him at work in the heart of
the spheres.

সাগরিকা ভেনাস, নীলোজ্জ্বল কৃষ্ণ, ভয়ংকরী কালী, পদ্মাসনা সরস্বতী, ধ্যানগম্ভীর মহেশ্বর—তাঁর কবিতায় ছড়ানো মূর্তির পর মূর্তি, প্রতিমার পর প্রতিমা।

মূর্তিপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ স্বভাবতঃই পুরাণপ্রেমীও বটে। তাঁর এক একটি মূর্তির পেছনে নিহিত থাকে গূঢ় দুর্লক্ষ্য তাৎপর্য, আধ্যাত্মিক অর্থের তেজস্ক্রিয় পরমাণু, যাকে ঘিরে ঘিরে গড়ে ওঠে এক একটি সম্পূর্ণ কথা বা কাহিনী ; বেশীর ভাগ সময়েই তারা পুরাণাশ্রিত, কিন্তু তাঁর নিজস্ব কল্পনার যাদুস্পর্শে ধরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অবয়ব। ভারতের পৌরাণিক কিম্বদন্তীর মধ্যে তিনটি তাঁর বিশেষ প্রিয়। প্রথম—বেদ-ব্রাহ্মণ-পুরাণের পুরূরবা ও উর্বশী (উর্বশী কাব্য), দ্বিতীয়—মহাভারতের রুরু ও প্রমদ্বরা (Love and Death—কাব্য), তৃতীয়—মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবান্ (সাবিত্রী কাব্য)। এর মধ্যে উর্বশী-কাহিনী আবার লাভ করেছে তাঁর বিশেষ পক্ষপাত। উর্বশী-কাহিনী নিয়ে তিনি রচনা করেছেন চার সর্গে সম্পূর্ণ একটি এপিক লক্ষণাক্রান্ত narrative, অসম্ভব যত্নে ও ভালোবাসায় অনুবাদ করেছেন কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশীয়ম", এবং প্রবৃত্ত হয়েছেন বিক্রমোর্ব্বশীয়ের একটি স্বচ্ছ সুন্দর আলোচনায়। এ ছাড়াও, তাঁর কবিতাগুচ্ছের মধ্যে দেখি অমিত্রাক্ষরের একটি কাব্যাংশ, তারও নাম "উর্ব্বশী"। যে উপাখ্যান বারবার তাঁর কবিমনকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করেছে, নিশ্চয় তাঁর কাছে সেই উপাখ্যানের ছিল বিশেষ কোনও

ব্যাখ্যা, বিশেষ কোনও অর্থ। কারণ, শ্রীঅরবিন্দ কখনই ছিলেন না সেই কবিদের একজন যাঁদের কাছে "Poetry is a spontaneous Overflow of powerful feelings." তাঁর শব্দ, ছন্দ ও বিষয় নির্বাচনে দেখা যায় আশ্চর্য সংযম, নৈপুণ্য এবং ব্যঞ্জনাময়তা। সমস্ত রচনার মধ্যে এক ধরণের অতন্দ্র একমনস্কতা তাঁর শিল্পী-সত্তার একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য।

লক্ষ্যের বিষয়, "উর্বশী", Love and Death" এবং "সাবিত্রী" তিনটি কাব্যেরই উপজীব্য হল প্রেম। এই প্রেম খণ্ডিত হয়েছে তিনটি কাব্যেই। প্রথম কাব্যে দ্বিতীয় মিলন ঘটেছে স্বর্গে (বা গন্ধর্বলোকে)। দ্বিতীয় কাব্যে নিজের আয়ুর অর্ধেক দিয়ে প্রিয়াকে মর্ত্যে ফিরিয়ে এনেছেন রুরু। তৃতীয় কাব্যে—স্বয়ং কালান্তকের সংগে এক দুর্ধর্ষ আত্মিক যুদ্ধে জয়লাভ করে অমৃত-আশিষ লাভ করেছেন সাবিত্রী। এ আশীর্বাদ শুধু সত্যবানের নয়, শুধু সাবিত্রীর নয়, সমগ্র পৃথিবীর।

প্রথম কাব্যে স্বার্থপরের মত পৃথিবীকে ত্যাগ করেছেন নায়ক পুরূরবা। দ্বিতীয় কাব্যে প্রেমের সার্থকতা লাভ হয়েছে সুকঠিন আত্মত্যাগে। তৃতীয় কাব্যে আর নেই আত্মসুখস্পৃহার প্রবল আবেগ, কিম্বা আত্মত্যাগের মহান কিন্তু সকরুণ ভূমিকা। এখানে তেজে, বীর্যে, আত্মশক্তিতে, ঐশী সহযোগিতার প্রতি তীব্র বিশ্বাসে জয়ী হয়েছেন সাবিত্রী। এবং ভোলেন নি আত্মীয়, প্রিয়, পরিজন, সন্তপ্ত পৃথিবীর মূঢ় ম্লান মূক মুখের বিষণ্ণ জনতাকে। যতক্ষণ না লাভ হয়েছে সবার জন্য অমৃতপাত্র ততক্ষণ প্রত্যাখ্যান করেছেন কালান্তকের সমস্ত মহার্ঘ উপহার।

সুতরাং, খুব বেশী দূরকল্পনায় বিভ্রান্ত হবার ঝুঁকি না নিয়েই বলা চলে 'উর্বশী', Love and Death ও 'সাবিত্রী' এক সূত্রেই গ্রথিত। মানুষী অভীপ্সার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এবং তার

নিরন্তর উর্ধ্ব তৃষ্ণার এক trilogy হল এই কাব্যত্রয়, এবং শ্রীঅরবিন্দ-অভীষ্ট দেবযানের প্রথম সোপান হল "উর্বশী।" উর্বশী-কামী পুরূরবা কি বিশ্বেতিহাসের সেই অসংখ্য ব্রহ্মস্বাদপিপাসু মুমুক্ষু মহামানবের প্রতীক যাঁরা তীব্র বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন সুখ-দুঃখরোগশোকজর্জর মাটির পৃথিবীর থেকে! ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এই উপলব্ধির অনুপাখ্য নির্বেদে যাঁরা ব্যক্তিগত প্রাপ্তির উদাসান স্বর্গে করেছেন মহাপ্রস্থান! যাঁদের মহানিবৃত্তির ফলস্বরূপ অনাথা পৃথিবী আজ ঘোরতর তমসায় আচ্ছন্ন, ভীষণতর দুর্দশায় নিমজ্জিত!

"Love and Death"-এর তরুণ প্রেমিক রুরুর মধ্যে কি তাহলে রয়েছে অস্পষ্ট আভাস সেই যুগযুগসম্ভব লোকগুরুদের, যাঁরা আধ্যাত্মিক পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি নিয়েও দিনের পর দিন সহ্য করেছেন অসহনীয় কষ্ট! আপন পুণ্যফলের সিংহভাগ দিয়ে যাঁরা পৃথিবীকে বারবার করেছেন সঞ্জীবিত! অন্যমনা ধরণীর কানে যাঁরা এনে দিয়েছেন বাক্যের অতীত কোন অমর্ত্য লোকের সত্য বাণী! আর, করুণাময়ী সাবিত্রী কি সেই ঐশী মাতৃশক্তির মানুষী মূর্তি যিনি শ্রীঅরবিন্দের অমরত্ব ও দেবমানবত্বের আদর্শকে জড় পৃথিবীতে করবেন রূপায়িত!—"সাবিত্রী" কাব্যের প্রতীকী তাৎপর্যের কথা মোটামুটি অভ্রান্তভাবেই জানা আছে। কিন্তু 'উর্বশী' বা "Love and Death" সম্পর্কে কবির কোনও নিজস্ব স্বাক্ষ্য আছে বলে জানি না। সুতরাং ভ্রান্তির সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। তবুও দেখা যাক্ এই ধারণার স্বপক্ষে কোনও বাহ্য অথবা আভ্যন্তর প্রমাণ মেলে কি না।

পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনী প্রথম পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সংবাদ-সূক্তে, সেখানে পলাতকা উর্বশীকে দেখতে পেয়ে পুরূরবা তাঁকে অনুনয় করছেন ফিরে আসবার জন্য, এবং উর্বশী তার উত্তর দিচ্ছেন রহস্যচ্ছলে। এরপর এ কাহিনীর একটি সরল

এবং বর্দ্ধিত সংস্করণ পাই শতপথ ব্রাহ্মণে, তারপর বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদিতে ছড়ানো আছে এর নানান্ পাঠ। বেদের কাহিনীগুলি লক্ষ্যণীয়ভাবে অলংকারহীন, বাহুল্যবর্জিত। পুরাণের কাহিণীগুলি লক্ষ্যণীয়ভাবে বর্ণাঢ্য। কালিদাস তাঁর স্বভাব-সুলভ লিরিক ভংগীতে পৌরাণিক কাহিনীটিরই নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর নাটক একটি বিশুদ্ধ রোম্যান্স। সেখানে পুরূরবার নশ্বরত্ব ও উর্বশীর অমরত্ব, পুরূরবার মনুষ্যত্ব ও উর্বশীর দেবত্বের বিশেষ কোনও তাৎপর্য নেই। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয়ে কিন্তু নায়কের একটি সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা দেখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। পুরূরবার মত রাজা তাঁর চোখে ইতিহাসবিশ্রুত আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি কবিস্বভাব নৃপতিদের স্বগোত্র। এঁদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"The temperaments of Alexander and Napoleon were both marked by megalomania, gigantic imaginations, impossible ideals. Alexander, we know, strove consciously to mould his life into an "Iliad". Napoleon regarded his as a Titanic epic ·····All men of this type,···show a strange, visionary impracticabilitiy in the midst of their practical energy and success ···and are usually dominated by an unconquerable egoism or self-absorption which is not necessarily base or selfish."

অর্থাৎ, এই রাজাদের মধ্যে দেখা যায় বিপুল এক আত্মগরিমা, বিরাট কল্পনা শক্তি, অসম্ভব আদর্শের প্রতি আকর্ষণ। আলেকজাণ্ডারের সচেতন চেষ্টা ছিল নিজের জীবনকে একটি 'ইলিয়াডে' পরিণত করা। নেপোলিয়ন নিজের জীবনকে মনে করতেন এক বিশাল মহাকাব্য। এই প্রকৃতির মানুষদের মধ্যে, তাঁদের সমস্ত

শক্তি ও সাফল্যের মাঝে থাকে এক ধরণের ভাবুক অকর্মণ্যতা। এবং তাঁরা বেশীরভাগ সময়েই চালিত হন দুর্বার এক আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা, যাকে নীচতা অথবা স্বার্থপরতা বলা চলে না।

পুরূরবা চরিত্রের এই সম্ভাবনার সমস্তটাই যে কালিদাস তাঁর নাটকে রূপায়িত করতে পারেন নি (বা চান নি, কারণ এ চরিত্র ট্রাজেডির, যা ভারতীয় নাট্যাদর্শের বিরোধী) তা শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ "Hero and the Nymph" পড়লেও বোঝা যায়। যদিও শ্রীঅরবিন্দ কালিদাসের পদলালিত্যের স্থলে এনেছেন এক অ-কালিদাসীয় ওজস্ ও মহিমবোধ যা তাঁর গ্রীকমনস্কতার ফলশ্রুতি। শ্রীঅরবিন্দের 'উর্বশী' কথায় বেদের কাহিনীর ভিত্তির ওপর পুরাণের রঙ্ লেগেছে, তার সংগে রয়েছে নিজস্ব কল্পনার মিশ্রিত চারিত্র্য। এবং সর্বোপরি, নায়ক-চরিত্রের কালিদাস-উপ্ত সম্ভাবনাকে শ্রীঅরবিন্দ একটি বাস্তব সত্যে পরিণত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ-ব্যবহৃত "উর্বশী" কাহিনীর চুম্বকটি নিম্নরূপঃ

প্রতিষ্ঠানরাজ, চন্দ্রবংশাবতংস, ইলাতনয় পুরূরবা মানবশ্রেষ্ঠ, এমন মানব যাঁর সাহায্য ও সৌহার্দ্য দেবতাদেরও প্রয়োজন হয়। দেবাসুর-সংগ্রামে বহুদিন দেবপক্ষে যুদ্ধ করবার পর বিজয়-অন্তে তিনি মর্ত্যে ফিরছেন। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, রথচক্রের অবিরল ঘর্ঘর, রণদামামার প্রবল নির্ঘোষ পেছনে ফেলে আসছেন বলে তিনি উৎফুল্ল। এমন সময়ে, পূর্ব দিগন্তে ঊষার অভ্যুদয়ের আরক্তিম পটভূমিতে তিনি দেখলেন অপ্সরাদের

Girls of heaven whose beauties ease
The labour of the battle-weary Gods.

দেখলেন তাদের মধ্যমণি অপরূপা উর্বশীকে। সংগে সংগে তিনি আচ্ছন্ন হলেন এক অস্পষ্ট সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষায়।

O thou strong God,
Who art thou graspest me with hands of fire
Making my soul all colour ?

পরক্ষণেই কেশী দানব মূর্তিমান কুজ্ঝটিকার মত এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল উর্বশীকে। কেশীর পেছন পেছন ধাওয়া করলেন পুরূরবা। উর্বশীকে ফেলে পালিয়ে গেল কেশী। সখীদের হাতে তাঁকে সমর্পণ করে মর্ত্যে ফিরে এলেন পুরূরবা। কিন্তু যিনি ফিরলেন, তিনি আর নন্ সেই রাজর্ষি, প্রজাহিত আর শৌর্যের অনুশীলনই যাঁর জীবনের মূল আদর্শ। তিনি এখন এক অদ্ভুত অমর্ত্য প্রেমের স্বাদে তন্ময়, কাজেই হিমালয়ের উপত্যকার বিপুল মৌনে তিনি ঘটালেন আত্মবিলোপ।

এদিকে স্বর্গাঙ্গনা উর্বশীও মর্তপ্রেমিকের জন্য ব্যাকুল। স্বর্গের নিষ্করুণ, নিঃশোক, চির আনন্দের নন্দন-কাননে তিনি নিয়ে এসেছেন মর্ত্যের প্রেমবিহ্বলতা, মর্ত্যের অভীপ্সা, এবং এই প্রেমের বৈচিত্র্য ও বিধুরতায় মুগ্ধ করেছেন উর্বশীকে। উর্বশীর স্বর্গে স্থবিরত্ব নেই বটে, কিন্তু এ স্বর্গ নিতান্তই স্থাবর। সেই স্থাবর, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-হীন উদাসীনতার যবনিকা মর্তমানুষের ব্যাকুল প্রেমের আঘাতে কম্পমান। সেই কাঁপন এনেছে নূতনত্ব। চিরযৌবনের রাজ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব এক ক্ষণমধুরতা, যার আবেশে বিভোর উর্বশী "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" নাটকের নায়িকার ভূমিকায় ভুলে গেলেন আপন পাঠ। বারুণীরূপী মেনকার প্রশ্ন—"কাকে তুমি ভালোবাসো ?"—এর উত্তরে আত্মবিস্মৃতের মত বললেন—'রাজা পুরূরবাকে।' পুরুষোত্তমের জায়গায়—পুরূরবা।

নাট্যকার ভরতমুনির শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হলেন উর্বশী। তিলোত্তমা হাত ধরে তাঁকে পৌঁছে দিলেন পর্বতচারী পুরূরবার কাছে। সেখানে তিনবছর নিরবচ্ছিন্ন মধুযামিনী যাপনের পর তাঁরা ফিরে এলেন

প্রতিষ্ঠানে। কর্তব্যপরায়ণ রাজা-রাণীর ভূমিকায় যাপন করলেন আরও চার বছর। জন্ম হল সন্ততিদের। কিন্তু দেবকন্যা উর্বশীকে আর বেশীদিন মর্ত্যে ধরে রাখা সম্ভব হল না। গন্ধর্ব-আয়োজিত এক মায়াবিদ্যুতের আলোয় পুরূরবাকে নগ্ন দেখলেন উর্বশী। পূর্ব-সর্ত-অনুযায়ী স্বর্গে ফিরে গেলেন।

কাহিনী এইখানেই থেমে থাকে নি। প্রেমিক পুরূরবা বিমূঢ় হয়ে থেকেছেন বহুদিন। বিস্বাদ হয়ে গেছে রাজচক্রবর্তীর বিলাসবহুল মহার্ঘ জীবন। কিন্তু তারপর প্রতিষ্ঠান পেছনে ফেলে, আয়ুর হাতে রাজ্য শাসনভার দিয়ে তিনি ফিরে গেছেন নদ-নদী-পথ-প্রান্তর পার হয়ে হিমালয়ের সেই প্রাগৈতিহাসিক মৌনে, যেখানে প্রথম রচনা হয়েছিল স্বর্গ-মর্তের বিবাহবাসর। প্রেম দিয়ে জয় করেও হারানোর ভয় তবু যায় নি। তাই এবার পুরূবরার প্রেম ধরেছে তপস্যার রূপ।

Long he, in meditation deep immersed
Strove to dessolve his soul among the hills
Into the thought of Urvasie. The snow
Stole down from heaven and touched his cheeek and hair
The storm-blast from the peaks leaped down and smote
But woke him not, and the white drops in vain
Froze in his locks or crusted all his garb.
But he lived only with his passionate heart.

উর্বশী-ধ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি আপন আত্মাকে সেই পাহাড়ের শিলায় শিলায় বিছিয়ে দিলেন। গলিত তুষার, তুষার বাত্যা, কিছুই তাঁকে জাগাতে পারল না। তাঁর সমস্ত সত্তা কেন্দ্রীভূত রইল হৃদয়ের এক প্রবল সংবেগে।

এই তপস্যায় প্রথমে জাগলেন আর্যস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তারপর তাঁর নিজের জননী ইলা, তারপর জগন্মাতা স্বয়ং। তাঁদের প্রত্যেকে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা। কিন্তু পুরূরবা অটল। অবশেষে তিনি মাতৃকার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে তিনি প্রবেশ করেছেন গন্ধর্বলোকে স্বয়ং গন্ধর্ব হয়ে।

Then with a sweet immortal smile the mother
Gave to him in the hollow of her hand
Wonderful water of the lake. He drank,
And understood infinity, and saw
Time like a snake coiling among the stars,
The earth he saw, and mortal nights and days
Grew to him moments···

সেই দিব্য-সরোবরের জল পান করে অমর হলেন পুরূরবা। তাঁর কাছে প্রতিভাত হল অনন্তের তত্ত্ব। দেখলেন, নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে মহাসর্পের মত কুণ্ডলীকৃত রয়েছে কাল। চেয়ে দেখলেন পৃথিবীর দিকে। নশ্বর দিন রাত্রি তাঁর কাছে পল-অনুপলে পরিণত হল।

পুরূরবা মিলিত হলেন উর্বশীর সংগে। কিন্তু এবারের মিলনের প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে নেই হিমাচলের স্তব্ধ, শুভ্র, সমুচ্চ শিখর, নেই প্রকৃতির বর্ণাঢ্য রহস্যসান্দ্রতা, নেই মানব সমাজের আশা-নৈরাশ, কর্তব্য-ভালোবাসার প্রবল পীড়ন। এ সেই স্বর্গলোক, আনন্দ ও মিলন যেখানে নির্ভার, এক স্বচ্ছ ও চিরন্তন সত্য। সুতরাং পুরূরবা সেই স্বর্গলোকে রইলেন তাঁর অনবচ্ছিন্ন আনন্দের সুখশয্যায় বিভোর, কিন্তু অশান্ত পৃথিবী তার আশাহীন বেদনা-বিকীর্ণ চক্রপথে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘুরে মরতে লাগ্‌ল।

কেশী দানবের উর্ব্বশী-অপহরণ, এবং 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' নাটকে উর্বশীর প্রমাদ—কাহিনীর এই দুটি অনুপুঙ্খ পুরাণাশ্রিত। অবশিষ্টাংশ

বৈদিক কাহিনীর অনুরূপ। কিন্তু উর্বশীকে হারাবার পর, দ্বিতীয়বার উর্বশী লাভ পর্যন্ত অংশটি, অর্থাৎ হিমালয় মৈনাক কৈলাস প্রভৃতি নগাধিরাজের শিখরে শিখরে পুরূরবার তীর্থযাত্রা, তিনমাতৃকার সাক্ষাৎ লাভ এবং তাঁদের মুখ-নিঃসৃত বিষণ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী—এ সমস্তই শ্রীঅরবিন্দর নিজস্ব সংযোজন। এবং এখানেই নিহিত আছে বেদ-পুরাণ-কালিদাসীয় এই উপন্যাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণের গূঢ়ার্থ। সেই প্রসংগে যাবার আগে আর একবার দৃষ্টিপাত করা থাক শ্রীঅরবিন্দ-সৃষ্ট পুরূরবার প্রতি।

পুরূরবা ইলার তনয়। ভারতীয় পুরাণের এই ইলা এক অদ্ভুত কল্পনা। তিনি এককালে ছিলেন পুরুষ, পরে নারী হয়ে জন্ম দিয়েছিলেন পুরূরবার। পুরাণে যদিও বুধের উল্লেখ আছে পুরূরবার জনক বলে, শ্রীঅরবিন্দের "উর্বশীতে" এই জনকের কোনও ভূমিকা নেই। এখানে এ জন্মও খ্রীষ্টজন্মের অনুরূপ এক immaculate conception। ইলা স্বয়ং এর বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে—

> ....as I suffered rapture
> Invaded by the sea of images
> Breaking upon me from all winds and saw
> Indus and Ganges with prophetic mind
> A virginal impulse gleamed from my brows
> And on the earth took beauty and form.

দশদিক থেকে কল্পচিত্রের এক বিপুল জলধি যেন আছড়ে পড়ল। জাগাল হৃদয়ে মহোল্লাস। সেই উল্লাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চেয়ে দেখলেন দ্রষ্টার চোখ দিয়ে সিন্ধু-গংগার দিকে। আর্ষে হৃদয়ে জাগল এক কুমারী কল্পনার আবেগ। পৃথিবীতে অবয়ব নিল পুরূরবা হয়ে।

প্রতিষ্ঠানে মন্দির আছে ইলার। এবং সেই ইলাকে আমরা জীবন্ত দেখি কাব্যের শেষভাগে, যেখানে তিনি পুরূরবাকে তাঁর অভীষ্ট

থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছেন। এই ইলা তাহলে এক অর্ধনারীশ্বর—অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক প্রকৃতি (যদিও এককালে নয়)। নয় কোনও সামান্যা মানবী, বা সামান্যা দেবী। তিনি খুব সম্ভব অমর, এবং পুরূরবা মাতার এই দেবত্ব এক স্বীকৃত সত্য। প্রতিষ্ঠানের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এবং সম্ভবতঃ সমগ্র প্রতিষ্ঠান এবং পুরূরবা স্বয়ং ইলার প্রতিষ্ঠিত কোনও আদর্শের অনুবর্তী। সুতরাং এই ইলার তনয় পুরূরবাও নয় কোনও সামান্য মানব, সামান্য নৃপতি। স্পষ্টই তাঁর জীবনের কোনও মহৎ উদ্দেশ্য আছে, আছে গ্রীকদেবতা প্রমিথিয়ুসের মত কোনও mission। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ দুর্দশার বিরাট দায়ে তাঁকেই দায়ী করেছেন আর্যস্থানের মহাদেবী।

কালিদাসের নায়কের মধ্যে যে ট্রাজিক কবিত্বের সম্ভাবনা দেখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, তাকেই পূর্ণ করেছেন তাঁর পুরূরবায়,—"marked by gigantic imaginations, impossible ideals". পুরূরবা দেখলেন উর্বশীকে, সংগে সংগে অসম্ভব প্রাপ্তির আশায় হলেন উন্মন। তাঁর আকুলতায় ধরা দিলেন উর্বশী। এ উর্বশী কিন্তু শাপভ্রষ্টা, তাঁর আপন আবহের জ্যোতির্লেখা নিশ্চয়ই নন্। যাই হোক, তিনি কিন্তু বেশীদিন মর্তে রইলেন না, যে মুহূর্তে সামান্যতম চ্যুতি ঘটল, সে মুহূর্তেই উধাও হলেন। স্বপ্নচারী কবির কাছে তিনি নন্দনের এক ক্ষণিকা মূর্তী। বিদ্যুতের মত অচিরস্থায়ী সে দিব্য আলোর ক্ষণ-উদ্ভাস। পুরূরবার জীবন এখন Cynthia-মুগ্ধ Endimion এর মত উর্বশীময়। সুতরাং তিনি পৃথিবী ত্যাগ করলেন। এই বিদায়ের বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ গভীর বিষাদের সংগে—

He in that light turned and saw under him
The mighty city, luminous and vast,
Temple and street and palace, and the sea
of sorrowing faces and sad grieving eyes,

A moment saw and disappeared from light
Into forest. Then a loud wail arose
From Pratistuana, as if barbarous hordes
Were in the streets and all its temples huge
Rising towards heaven in disarstrous fire.

—একবার ফিরে দেখলেন। উজ্জ্বল, বিরাট সেই নগর, মন্দির পথ, প্রাসাদ—সবই পূর্ণ বিষণ্ণ মুখ, ব্যথাবিদ্ধ দৃষ্টির করুণ শোভাযাত্রায়। তারপর প্রবেশ করলেন অরণ্যের মধ্যে। সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানের আকাশে বাতাসে উঠ্‌ল এক নিদারুণ আর্তনাদ, যেন বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল সব।

যে উর্বশীর জন্য এত ত্যাগ, এই বিপুল বিস্মৃতি, সেই উর্বশী কে? যদিও প্রথম তাঁকে দেখে পুরূরবা বলছেন:

All beauty of earthliness is in thee, all
Luxurious experience of the soul.

তবুও এঁকে শুধু সুন্দরী, রূপসী, নন্দনবাসিনী এক দেবনটী বলে মনে করা বোধ হয় ভুল হবে। স্বর্গ-মর্তের সারবস্তু যে অনির্বচন সৌন্দর্যের স্বাদ পেলে দিব্যোন্মাদ হয় মানুষ, ইনি বোধ হয় সেই অলৌকিক আনন্দের কোনও সংকেত।

বৈদিক পুরূরবা-উর্বশী সংবাদের ভাষ্য করতে গিয়ে নলিনীকান্ত বলেছেন—"উর্বশী হইতেছে বৃহতের ভোগ, অতিমানসের সিদ্ধি (উরু অশ); আর পুরূরবা, মনোময় পুরুষ, বহুল প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যাহার। মনোময় জীব বা মানুষ চাহিতেছে অতিমানসের বৃহৎ, জ্যোতির্ময় আনন্দ কিন্তু মানুষীভাবে, তাই সে দিব্য জ্যোতি স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছে; মানুষে যতটুকু সত্য আকাঙ্ক্ষা ছিল ততটুকুর জন্য উর্বশী নামিয়া আসিয়াছিল—আধারের পূর্ণ রূপান্তর না হইলে···বৃহতের অবতরণ ও প্রতিষ্ঠা এই আধারে হয় না।"

সুতরাং উর্বশী-অভিলাষী পুরূরবা তপস্যার দ্বারা দেবত্ব অর্জন করে উর্বশীর স্বগৃহে 'ভূমার' সংগে মিলিত হলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটল।

"উর্বশী" কাব্য শেষ হয়েছিল কবির পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে। অর্থাৎ, খুব সম্ভব বরোদা থাকাকালীন এই কাব্য তার চরম রূপ পেয়েছিল। দক্ষিণ দেশে, অর্থাৎ পণ্ডিচেরীতে বেদ উদ্ভাসিত হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দর কাছে। কিন্তু, বেদের কিছু কিছু অনুবাদ (Sacred Books of the East—Max Muller) তিনি তার আগেই পড়েছিলেন। বরোদায় থাকার সময়ে চলেছিল তাঁর অবিরাম সংস্কৃত-চর্চা। পুরূরবা উর্বশীর কাহিনীটির মূল আধ্যাত্মিক অর্থটিই যে তাঁর কাব্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা নয় তা কে বলতে পারে? আর বেদ ব্যতিরেকেও, বোধদৃষ্টিসম্পন্ন মহাকবি যে এই ভাবগর্ভ কাহিনীটিতে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনের ব্যঞ্জনা ভরে দেবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে! বরোদা, এবং কলকাতায় তাঁর ভেতরে এক নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলছিল প্রবল কর্মৈষণা এবং লোকোত্তরের এষণার মধ্যে, এবং তিনি তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে দুটিকে মেলাতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর আদর্শও ছিল এক অধ্যাত্মভিত্তিক জাতীয়তা। দেশমাতৃকা তাঁর কাছে ছিলেন বিশ্বজননীরই নামান্তর। ব্যক্তিগত সিদ্ধিকে এক বিশ্বগত সিদ্ধিতে রূপান্তরিত করাই যে তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য—এ কথা শ্রীঅরবিন্দ তখনই অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন।

ব্যক্তিগত সিদ্ধির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছবার আগে তাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পুরূরবাকে তিনবার দাঁড় করিয়েছেন কঠিন জিজ্ঞাসার সম্মুখে। তাঁর তপস্যায় প্রথম জেগেছেন আর্যস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁকে এক জায়গায় শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ্মী বলেছেন (ভারতলক্ষ্মী?)। এই দেবী, অর্থাৎ দেশমাতৃকা, পুরূরবার আকাঙ্ক্ষার কথা জেনে গভীর

দুঃখে বলেছে—

Yet hast thou mained the future and discrowned
The Aryan people···for though Ila's sons
In Hustina···
And Indraprastha, future towns, shall rule
Their power by excess of beauty falls,—

··· ··· ···

And this the land divine to impure grasp
Yields of barbarians from the outer shores.

অর্থাৎ ত্রেতা-দ্বাপরের সমৃদ্ধির যুগ পেরিয়ে দেশলক্ষ্মী চলে এলেন কলিযুগের পরাজয়ের শোচনীয় ইতিহাসে, যখন শক-হূণদল পাঠান মোগল এবং ফরাসী-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ ইংরেজের বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত হবে ভারতবর্ষ। এই সমস্ত ভবিষ্যৎ-দুর্গতির দায়িত্ব পুরূরবার। "Thy sin Pururavus of beauty and love." পুরূরবা যে সৌন্দর্য ও প্রেমের সন্ধানে দেশত্যাগী হয়েছেন, সেই পাপেরই ভাগী হবে তাঁর উত্তরপুরুষ। সৌন্দর্য ও প্রেম, beauty and love, দুটিই মহৎ আদর্শ, কিন্তু যখন তারা হয় নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বজনীন—তখনই। এই মহৎ আদর্শেরই পতন হয় আতিশয্যে, দারিদ্র্য ঘটে সংকীর্ণতায়। সত্ত্ব এবং তম-র মধ্যে আসল পার্থক্য হল মনোভংগীর। অন্তরের ঐশ্বর্যে পূর্ণ বলে সাত্বিক বাইরের সমৃদ্ধির প্রতি উদাসীন থাকেন, তাঁর বেশবাস, গৃহসজ্জা সবই হয় যেমন তেমন। তামসিক ও উদাসীন। কিন্তু কোনও আন্তর সমৃদ্ধির ফলে নয়, আলস্যের জন্য। ঐশী প্রেম ও ঐশী সৌন্দর্যের জন্য আকাঙ্খাই যুগের পর যুগ পার হতে হতে, সংকীর্ণ হতে হতে কেমন করে শুধু মাত্র অসার নান্দনিকতা ও সম্ভোগের বাসনায় রূপান্তরিত হয় তা ভারতীয় সমাজের অধোগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। আধ্যাত্মিক প্রতীকধর্মিতা কেমন

করে প্রথমে আদর্শবাদ তারপর অন্তঃসার শূন্য আচার নিষ্ঠায় পরিণত হয় তা শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং তাঁর "Human Cycle"-এ আলোচনা করেছেন। "উর্বশীর" দেশলক্ষ্মী কি পুরূরবাকে এই বিকৃতির কথাই বলতে চেয়েছিলেন?

কৈলাস-মৈনাকের স্বর্ণশিখর পার হয়ে এবার পুরূরবা এলেন তাঁর আপন জননী ইলার সমীপে। পুরূরবার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে ইলা স্বীকার করছেন—পুরূরবার এই রূপতৃষ্ণা তাঁর জননীরই উত্তরাধিকার।

...from me
Oh son, thou hadst the impulse beautiful.

তিনি পুরূরবা ও সমস্ত আর্যজাতির জননী, একটি আদর্শের তিনি প্রতীক।

...for I strive
Towards the insufferable heights and flash
With haloes of that sacred light intense.

ঊর্ধ্বলোকের এক জ্যোতির্বিভাসের প্রতি তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পিত। কিন্তু এই মহৎ আদর্শ যার রূপ দিতে পুরূরবা ও তাঁর বংশের জন্ম, সেই আদর্শ রূপ নিতে পারল না। তাই ইলা বলছেন—

O mine own son, Pururavus, I fall
By thy vast failure.

—তোমার পতনই ডেকে আনল আমার পতনকে। পুরূরবার অসহায় উত্তর:

fates colossal over rule.
I wander like a wave, nor find
Limit to the desire that wastes my soul.

নিয়তিরই জয় হল। আমি দুলছি ঢেউয়ের মত। যে তৃষ্ণা আমার

আত্মাকে ক্ষয় করছে, তার কোনও সীমা আমি দেখতে পাচ্ছি না।

এরপর, পার্থিব মানুষের অনধিগম্য এক তুঙ্গে বিশ্বজননীর সাক্ষাৎ পেলেন পুরূরবা, ইলা যাঁকে বলছেন 'The mighty mother,' জগন্মাতা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন ঃ

In thy line the Spirit Supreme
Shall bound existence with one form,
In Mathura and Ocean Dwarca man
Earthly perfectability of soul
Example : Son of thy line and eulogist,
The vast clear poet of the golden verse,
Whose song shall be as wide as is the world.
But all by huge self-will or violence marred,
Of passionate uncontrol.

অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ আর্যসভ্যতার ধারা শৌর্যবীর্য সংস্কৃতির উচ্চতম শিখর-চুম্বী হলেও, কৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম দিলেও, নিদারুণ এক অহমিকা, এক প্রবল অসংযমের ফলে হবে সবই ব্যর্থ।

এই সমস্ত নিষেধ, তিরস্কার. ভবিষ্যদ্বাণী পেছনে ফেলে, গন্ধর্বলোকে উর্বশী সন্নিধানে প্রস্থান করলেন পুরূরবা। নিষেধ স্বয়ং দেশমাতৃকার, তিরস্কার তাঁর নিজের আদর্শের, নিজের বিবেকের, আর, ভবিষ্যদ্বাণী সেই ঈশ্বরীর যিনি তাঁর ঔদাস্যের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে নিরুত্তপ্ত দেখছেন, সভ্যতার জন্ম, সভ্যতার লয়, আদর্শের জন্ম, আদর্শের ধ্বংস। পাপ-পুণ্য অপরাধ-অনপরাধ, শাস্তি-পুরস্কার সব কিছুর উর্ধ্বে যাঁর বিশ্বব্যাপী ব্রাহ্মী স্থিতি।

Thou then hast failed Pururavus,

এই তাঁর সবেদন মন্তব্য। বিচার নয়, সমালোচনা নয়। শুধু, এই ঘটেছে তারই বিবৃতি। সেই বিবৃতির মধ্যে শুধু প্রচ্ছন্ন রয়েছে

ভাগবত আক্ষেপের মৃদু আভাস—Thou then hast failed, Pururavus.

তাই সমগ্র "উর্বশী" কাব্যের অন্তর্নিহিত সুরটি বেদনার। ট্রাজিক এর রস। অথচ, এখানে বিচ্ছেদের কাল ছাড়িয়ে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত বিছিয়ে রয়েছে নায়ক-নায়িকার অতিমর্ত্য মিলনের বিশাল ছবি। এ ট্রাজেডি নয় আপ্তকাম পুরূরবার। নয় উর্বশীরও। কারণ, তিনি বিয়োগের অতীত। তবে কার?—এ ট্রাজেডি পৃথিবীর। পৃথিবী তথা ভারতবর্ষের, শ্রীঅরবিন্দ যাকে এ কাব্যের বিশেষ পরিভাষায় বলেছেন—আর্যস্থান।

পৃথিবী তার বিশাল মাতৃজঠরের যুগযুগব্যাপী যন্ত্রণায় সৃষ্টি করেছে পুরূরবাকে, নরশ্রেষ্ঠ জননায়ক, দেববান্ধব পুরূরবাকে। এই সন্তানের কাছে তার বিপুল আশা—পুরূরবা তাকে তার দিব্য পরিণতির উচ্চতম শীর্ষে পৌঁছে দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতিরই ঘনবিগ্রহ পুরূরবা। কিন্তু, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল না। স্বার্থপরের মত পুরূরবা প্রস্থান করলেন তাঁর ব্যক্তিগত আনন্দের অক্ষয়লোকে—"An egoism mate or self absorption, which is not necessarily base or selfish."

অসহায়, অবজ্ঞাত পৃথিবী তার দুর্ভাগ্যের চক্রপথে যুগ যুগ ধরে অন্ধের মত ঘুরতে লাগল।

But far below through silent mighty space
The Green and strenuous earth abandoned rolled.

এই দুর্বার আত্মকেন্দ্রিকতা জননী ধরিত্রীর প্রতি মুক্তিকাম মানুষের উদাসীনতা—যার ছায়া, তাঁর জীবনের প্রথম যুগে নিজের মধ্যেও কল্পনা করেছিলেন জ্ঞানযোগী শ্রীঅরবিন্দ মানবেতিহাসের সেই বিরাট ব্যর্থতারই ট্রাজেডি "উর্বশী।"

*

শ্রীঅরবিন্দ-মানস

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ-মানস বলতে আমি বুঝি এমন এক সর্বগ্রাসী পরিপূর্ণতা যা তথ্য, তত্ত্ব, বিচার, বিশ্লেষণ, গম্ভীরতায় ডুবে যাওয়া দার্শনিক সৃষ্টি দৃষ্টি যোগ সংযুক্ত পরা ও অপরা বোধ, অথচ সব ছাড়িয়ে এক বিচিত্র জগতের অভিজ্ঞতা একটা সমগ্রতার আন্তর উপলব্ধি যা শুধু বুদ্ধিজাত নয়, ধ্যানপূত ও তপস্যার বিচিত্রতায় স্বয়ং প্রতিভাত। তাই মনে পড়ে কবিগুরুর কথা—

আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—
যার লাগি নরদেব চির শক্তি দিন
তপোমগ্ন; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকট যাত্রায়; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়; সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান—আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরব দীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে;

তাঁর বিখ্যাত 'নমস্কার' কবিতায় শ্রীঅরবিন্দকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে এই কথাই বলেছিলেন তাঁকে, দেবতার দীপ হাতে যে রুদ্রদূত আসে—কিন্তু তিনি কি শুধু রুদ্রের দূত—যে রুদ্র রোদন

করেন, গর্জন করেন, ধ্বংসের দেবতা, তিনি যে ভদ্রও বটে—ভয়ংকর যে শংকর, অসিখর্পরের উল্টোদিকেই আছে বরাভয়

যিনি নানাকণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে

তাই বন্ধনপীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে, হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান। শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলেন কবি, তাকে নমস্কার জানিয়ে বলেছিলেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার

বহু বৎসর পরে তাঁকে দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগলভ স্তব্ধতায় দেখে পুনরায় তাঁকে তাঁর নমস্কার জানিয়ে এসেছিলেন কবি পণ্ডিচারীতে অসুস্থ শরীরে জাহাজ থেকে নেমে। তিনি চেয়েছিলেন সেই মানুষকে, যে মানুষ বাণীর দূত, সত্যসাধনায় সুদীর্ঘকালেও যার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনা, সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সত্যেরই অমৃত পাথেয় যাঁকে আনন্দিত রাখে। সেই মানুষকেই দেখতে পেয়েছিলেন কবি, শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে, যে মানুষ কোথাও থামতে পারে না, যে মানুষের পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি। জীবনে উপকরণ বিরল হওয়াটাই সব নয়, সমস্তকে নিয়ে সমঞ্জস করাই তার কাজ, ঐশ্বর্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরববোধকে জাগ্রত করে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে তোমার দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই। ঠিক সেই কথাই বলা যায় শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে। বেশীভাগ লোকের কাছেই তিনি মহাযোগী, আধ্যাত্মিক শক্তিধর পুরুষ, যাঁর কাছে বা তারই প্রতিভূ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে তত্ত্ব, তথ্য, ছাপিয়ে বরাভয় প্রার্থনা করলেই হলো, তিনি নিমেষে কাঙ্খিত বর দিয়ে বাধিত করবেন তাঁর শক্তির প্রসাদ আমাকে পাইয়ে দেবেন, miracles ঘটাবেন। অবশ্য সত্যিকার আধার হলে

বা আস্পৃহা থাকলে হয়তো নিমেষেই জন্মান্তর ঘটে যায় রূপান্তর আসে, সিদ্ধি করতলগত হয়। আবার আর একদলের কাছে তিনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক পরমপণ্ডিত, যিনি এই জীবনের রহস্যকে জানতে চেয়েছিলেন, বুঝতে চেয়েছিলেন, জেনেছিলেন, নমস্য তিনি, প্রণম্য তিনি। আবার আর এক গোষ্ঠী তাঁকে শুধু স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি বলে তার তপস্যাপূত নিষ্ঠাঘন সেই বিপ্লবী 'ন্যাশানালিষ্ট' অরবিন্দকেই তুলে ধরেন—তাঁরা বলেন না, না, ঐ সব যোগের ধোঁয়ার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবো না—Mind-ই কি জানিনা, বুঝিনা, তা Over-mind, Supermind. আবার কেউ কেউ তার সাহিত্যিক ও সমালোচক মূর্ত্তিকেই প্রাধান্য দেন, যে ব্যাস বাল্মিকী, কালিদাস, সেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, ব্লেক, ম্যালার্মে হুইটম্যানকে বোঝে, বোঝায়, বিতুলা, বাজীপ্রভু প্রভৃতি কাব্যগুলির স্বদেশপ্রীতি ও সংগ্রাম নিষ্ঠার প্রতি আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়—গীতার ভাষ্যের প্রতি তস্মাৎত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব, ভুঙ্ক্ষ্বরাজ্যং সমৃদ্ধং—হৃতরাজ্য পুনরায় অধিকার করতে হবে, শত্রু বধ কর, বীর হও, দেশমাতৃকাকে উদ্ধার কর—জীবন দাও, তবে মহাজীবনের আবির্ভাব হবে। আমরা পড়ি—

We die indeed

But let us die with the high voiced assent of Heaven to our country's claim enforced to freedom

মরতে একদিন হবেই, আমরা মরবো, মৃত্যু আমাদের পণ, কিন্তু আমরা জানিয়ে যাব যে স্বাধীনতা—বিধিদত্ত অধিকার, স্বর্গের অর্থাৎ উর্দ্ধের রাজ্যের সমর্থন তাতে আছে—বাজীপ্রভু বা বিতুলা (কর্মযোগিনে প্রকাশিত The Mother to her son (১৯১০), সমালোচকের ভাষায়—a scream of passion, radiant, full-throated and inspiring. কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকাব্য এ সবই, আরো

কিছু—তাই তিনি নীতির স্তর, বুদ্ধির স্তর, ঐহিক ঐশ্বর্যের স্তর পেরিয়ে (যার প্রতীক বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস) আর এক অতিচেতনার স্তরে পৌঁছলেন যাকে শুধু mystic poetry বলবো না, poetry of the soul বলা যায়, আত্মদীপ্তিই যার উদ্দেশ্য—Their aim was illumination, not logical conviction, their ideal the inspired seer not the accurate reasoner. কবি অনুপ্রাণিত যোদ্ধা, কূটতার্কিক নন, (আমরা ভুলে যাই যে মানুষের সীমার দিক যেমন আছে, তেমনই আছে অসীমের প্রতি টান, কারণ সে ভূমি পুত্র হলেও আকাশের দিকে তার দৃষ্টি, তার আছে অন্তঃগূঢ় সংকল্পের ধারা, সে চায় চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি, সত্যের অমৃতরূপ, সে জানতে চায় কোন মহার্ণব গর্ভ হতে সে উঠেছে—কোথায় সে যাবে—অশ্বপতি যে সে, চিরকালের মানুষের তাই চিরন্তন প্রশ্ন হচ্চে—কস্মৈ দেবায়, কে সে দেবতা যাঁর কাছে আমার মাথা নত হবে, মন স্তব্ধ হবে, কে সে হিরণ্যগর্ভ অমৃত যাঁহার ছায়া, যাহার ছায়া মহান মরণ। দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের মনে জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায় এই প্রশ্ন নানারূপে জেগেছে, চরম আকুতি নিয়ে, পরম প্রার্থনা রূপে। হয়তো মেলেনি উত্তর, হয়তো মনগড়া উত্তর মিলেছে, হয়তো সত্যানৃতেমিথুনীকৃত এক প্রতিভাস বিম্বিত হয়েছে মনের দর্পণে। দিনের তপ্ত আলোয়, রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে, সংসারের মোহের মধ্যে। ঘরছাড়ার শশ্মানে, সে জানতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে, বলতে চেয়েছে, তার সীমিত জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে কর্মদীপ্তি দিয়ে, ভক্তিযোগ দিয়ে। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইতিহাসের পাতায় পাতায়, দুঃখ বেদনা অভাব অভিযোগের মধ্যে; পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মাঝ দিয়ে এই জগন্নাথের রথ চলেছে—কোথায়, কেন, কোন সীমাবিহীনে, কোন অতলের তলে, কোন দুরাশার দিক্‌পানে—তার মৌলিক সমস্যার সমাধান কোথায়,

কোন সূত্রে, কোন তত্ত্বে, কোন তন্ত্রে, কোন মন্ত্রে, কে সে মনীষি ঋষি, তপস্বী, সাধক, বৈজ্ঞানিক, মহাযোগী যে তাকে উত্তর দেবে— তার অনন্ত পিপাসার রস জোগাবে, তার অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর— দেখা দাও, দেখা দাও, জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতুমে—আমার নয়ন ন তিরপিত ভেল। সে জীবিকার উত্তেজনায় খাদ্য অন্বেষণে হিংস্র হয়ে সে ঘুরেছে বনে অরণ্যে পথে প্রান্তরে, আদিম প্রবৃত্তির কাছে, অচেতনার কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে, সন্ধানে সে মেতেছে, প্রকাশের লীলায় উন্মোচনের খেলায়। অরণি কাষ্ঠ থেকে সে অগ্নিকে পেয়েছে কল্পনা করেছে যে তিনিই অগ্রণী—তিনিই পুরোহিত, এগিয়ে চলেন—হাত ধরে মোরে নিয়ে চল সখা, আমি তো পথ জানিনে। সে বুঝতে চেয়েছে যা তার সীমার মধ্যে আর যা তার সীমার বাইরে। তার মৃন্ময়ী মনের এই চিন্ময়ী গতি। সে ছুটেছে জ্ঞানীর কাছে, সে জুটেছে গুরুর দুয়ারে, সে গেছে বিদ্বজ্জনসভায়, শিক্ষার মন্দিরে, বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরীতে, বিপুল কর্মের ক্ষেত্রে, আবার ভক্তিগদগদ চিত্তে সে নামিয়ে দিয়েছে নিজেকে এক রহস্যঘন প্রাণারামের পায়ের তলায়—শরণ লইলাম।

'অংগণহীন ব্যাকুলভঙ্গ' মুখে মুখে পিয় পিয় বাণীহে সে সাড়া দিয়েছে রূপে অরূপে, প্রতীক রূপকে, ব্যক্তে অব্যক্তে, ভোগে ত্যাগে, আশায় আকাঙ্ক্ষায়, কামে কামনায়, তিক্ততায়, লুব্ধতায়, ভয়ে ভালবাসায়, আবার আনন্দে বিধৃত চেতনায়, অমেয় প্রেমে, শ্রদ্ধায় সেবায় নিষ্ঠায়— এই দ্বৈতের লীলার মধ্য দিয়ে মানুষ খোঁজে সেই অদ্বৈতকে—শ্রীঅরবিন্দ বললেন এই তো বৃহত্তর মহত্তর জীবনের জন্য কান্না। বৈদান্তিকের প্রার্থনায় তাই ধ্বনিত রণিত হলো—হে আত্মা মহীয়ান—তুমিই যদি তুমি, তবে কেন এই অন্ধকার, কোথায় গেল আমার সূর্যকরোজ্জ্বল অতীত (Sunlit past), কেন আমি কামনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, কেন দাবদগ্ধ, শোকে মুহ্যমান, নিরাশায় হতাশ, দেহতৃপ্তির জন্য

বিভ্রান্ত

Why am I thus disfigured by desire
Distracted, paled
Scorched by the fire of fitful passion
Betrayed to grief overtaken with dismay
Surprised by lust.

না, না আমার শতশতাব্দীর পুঞ্জীভূত জঞ্জাল দূর করে দাও ফিরিয়ে দাও আমার পবিত্রতাকে, জ্ঞানের গুপ্তদ্বার পুনরায় দীপ্যমান প্রজ্বলন্ত হোক্, শক্তি হোক বিকশিত, প্রেমের ঝরঝর ধারা ঝরে পড়ুক (Love outpour)।

কিন্তু কেন এই প্রার্থনা, কেন এই দ্বন্দ্ব—আর একটি কবিতায় শ্রীঅরবিন্দ তার উত্তর দিলেন

দেবতার বজ্র'ঙ্কুশ দেখেছি আমরা
নূতন সৃষ্টির মুষল পেষণে
মাটিতে রক্তের বীজ পুঁতেছি
মায়াবী আকাশে তারি প্রতিচ্ছায়া
ম্লান অম্বরের মেঘ ডম্বর কায়ায়
যেন একটি রক্তমুখী ফুল
আমরা চলেছি বীরদর্পে
গর্বে বুক ফুলিয়ে।
ধরিত্রীকে বানিয়ে তুলেছি নরক
বলছি—স্বর্গ গড়ছি ;
ভগবানের অস্তিত্বে বিদ্রূপ করি আমরা,
দেবতার পাদপীঠে পুরোহিতের মন্ত্রকে
থামিয়ে দিই এক কথায়
মনকে করেছি শূন্য

চিন্তার পুণ্যকে গলায় দড়ি দিয়ে মেরেছি।
মানবতার সান্ধ্য লগনে গোধূলি বেলায় জন্মেছে যারা
রাত্রির অভিসারে,
তামসীর গহনেই তো তাদের যাত্রা

(The Descent into Night)

নরকের দ্বার দিয়েই স্বর্গযাত্রার পথ। সাবিত্রীর দ্বিতীয় পর্বের সপ্তম সর্গে সেই সত্যই উদ্ঘাটিত হলো নূতন জ্ঞান অভিজ্ঞান দিয়ে নয়, প্রমাণ প্রমেয় দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্য যেখানে 'drastic economy of words' নেই শুধু রূপক, প্রতীক বা প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল কাব্য কথাই নয়, উপলব্ধিতে ভাস্বর—সব শেষের অশেষের কথা বললে কারণ

Nothing ends, all but begun

চাকা ঘুরবে, বসে আছি সেই নবতর প্রভাতের জন্য "a greater dawn" কবিতার সুরু হয়েছিল রাত্রির তামসী অতিনিশায়—যখন দেবতারাও জাগেন নি আলোর রাজ্যে। সাবিত্রী মহাকাব্য তাই শুধু কথা ও কাহিনী নয়, একটি অন্তর্রাজ্যের বিপ্লবেরও প্রতীক—কবির শাশ্বতী উপলব্ধির সঙ্গে এটি অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, বারে বারে তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে, কাব্যের রূপ সীমা ও সীমানাও। সাবিত্রী কাহিনীর রূপকার ব্যাস। মহাভারতে পড়ি (২৪৮ অধ্যায়) যে নিঃসন্তান অশ্বপতি (যিনি মানবাত্মার প্রাণ প্রতীক) তিনি আঠারো বছর ধরে তপস্যা করছেন সন্তান লাভের জন্য—মহাশক্তি তাঁকে বর দিলেন যে তাঁরই অংশ সম্ভূতা বীর্যবতী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে। বছরের পর বছর গেলো, সাবিত্রী রূপযৌবনশালিনী বিবাহযোগ্যা হলেন। কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য কোন রাজপুত্র যখন এলো না তখন পিতা বললেন—যাও, খুঁজে নাও তোমার মনোমত পতি—দাও তার গলায় মালা দুলিয়ে। মহাভারতে পড়ি

যে সাবিত্রী চলেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে, কন্যাকুমারীর মত প্রতীক্ষমানা—নাগর সভ্যতা ছেড়ে, ঐশ্বর্যসাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে, মহাপ্রকৃতির পরিবেশে, বনের স্পন্দন মর্মরের গান শুনতে—ঐখানেই ছিলেন দ্যুমৎসেন গতগৌরব হৃত সাম্রাজ্য নৃপতি—অন্ধ দৃষ্টিহীন, তাঁরই পুত্র সত্যবান। নামটি লক্ষ্য করবার বিষয়—সত্যে যিনি অধিষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠিত, বিধৃত। ফিরে এসে তিনি বললেন—আমি সত্যবানকেই পতিরূপ গ্রহণ করবো। সেখানে এসেছিলেন দেবর্ষি নারদ, বীণা হাতে হরিগুণগান করতে করতে ত্রিভুবন পরিক্রমাই তাঁর কাজ। তিনি বাধা দিয়েছিলেন—না, না, সে কী এর মৃত্যুযোগ আছে এক বছর পরে। মায়ের মন উঠলো কাতর হয়ে, পিতা করলেন অনুনয়—সাবিত্রী অচলা, অটলা—না, সত্যবানকেই তাঁর চাই। বিবাহ হলো, তারপর এলো সেইদিন যেদিন সত্যবানের মৃত্যু হলো—বিধিনির্দিষ্ট দিন—

That was the day when Satyaban must die.

তারপর চললো আধ্যাত্মিক রাজ্যের অতিসূক্ষ্মস্তরে, যাকে আমরা সাধারণ কথায় বলি—যমে মানুষে টানাটানি, কে হারে, কে জেতে। যমরাজকে হটতে হয়েছিল আংশিক ভাবে নচীকেতার অভীপ্সার কাছে, রুরুর প্রেমের কাছে যে প্রেমদ্বরাকে সর্পদংশন থেকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল আর আজ তার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটলো সাবিত্রীর কাছে, যে বলেছিল—My God is Love, Swiftly suffers all…

Love is the man's lien on the Absolute

প্রেমই সেই এক ও অনাদির ছাড়পত্র। সাবিত্রী প্রেমের সেই ঊর্ধতম স্তর থেকে যমরাজকে বললেন

I am a deputy of the aspiring world.

My spirit's liberty, lark for all.

ঊর্ধাশী যে মানুষের মন, এই যে পৃথিবী তপ্ত, ক্লান্ত আতুর পৃথিবী, যা

ঊর্ধের দিকে চেয়ে আছে, তারই আমি প্রতিনিধি আমি ফিরিয়ে চাই আমার স্বাধীনতা সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য

Release the soul of the world called Satyaban

ফিরিয়ে দাও সত্যবানকে, মরতার সীমা থেকে, বন্ধন থেকে, মৃত্যুপাশ থেকে একে চাই আমি—উদ্ধার করবো আমি—এ বাণী অমোঘ বাণী, এ বাণী প্রেমের পূর্ণ বাণী, উপনিষদের বাণী, মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে যার একটু সুর ধ্বনিত হয়েছিল, একটু খানি আকুতি

যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম

কি করবো আমি উপকরণ পীড়িত সংসারের জঞ্জাল বয়ে যদি না অমৃত হতে পারি। এ অমৃতত্ত্ব শুধু দেহের কোষে অণুতে পরমাণুতে নয়, সকল ডাইমেনশনে (কথাটি ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর Religion of Manএ)। কিন্তু এইখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত। শ্রীঅরবিন্দ প্রেম বলতে কি বোঝেন তার কাব্যিক ভাষ্য যেমন "সাবিত্রী" তেমনি তার দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে Synthesis of Yoga এ এবং অন্যত্রও যেমন আমরা পড়ি—An attempt to sublimate the vital impulses through love by turning human love towards the Divine—সেটা যতক্ষণ psychic divine love with a strong sublimated vital manifestation থাকে ততক্ষণই ঊর্ধের প্রতীক কিন্তু ঐ স্তর থেকে স্খলন পতনের আশংকাও আছে। আবার এ কথাও শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন (Sri Aurobindo on Himself and the Mother p 203) "Of course it does not mean that in the estimation of values a brothel is as good as an Ashrama but it does mean that all are part of one manifestation and that in the inner heart of the harlot as in the inner heart of the sage there is the divine."

শ্রীঅরবিন্দের এই কথাগুলি মনে করিয়ে দেয় স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতায় খেতরীরাজের রাজসভায় নৃত্যগীতের আসরে সেই নর্তকীর গান যা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো স্বামীজীকে এক অপূর্ব সত্যের তত্ত্ব—

প্রভু মেরা অবগুণে চিত না ধরো
সমদরশী হৈঁ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো।
এক লোহা পূজামে রাখত,
এক রহত ব্যাধ ঘরপর,
পরশকে মন দ্বিধা নহীঁ হৈ,
দুহুঁ, এক কাঞ্চন করো
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলী নীর ভরো
জব মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো, সুরমুরি নাম পরো
ইক্ মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগেরো
অজ্ঞান সে ভেদ হবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

—জ্ঞানী কাহে ভেদ করো—বিবেকানন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শ্রীঅরবিন্দও (Life Divine Vol II Part II p 144) বললেন —The attempt of human thought to force an ethical meaning into the whole of nature is one of those pathetic attempts of the human being to read himself into all things and judge them from the standpoint he has personally evolved. একথা শুধু বহুদর্শী জ্ঞানীর নয় আত্ম উপলব্ধি হয়েছে যে মনীষির যিনি সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায় দ্বৈত অদ্বৈতের উর্ধ পরমানন্দের সাম্যঅবস্থার তুঙ্গীশীর্ষে উঠেছেন, তিনিই বলতে পারেন—The motive force of evolution is not any ethical principle but the urge of the spirit towards self-expression (আবিবি মত্রধি)। This

urge is at first non-ethical, then infra-ethical, partly also anti-ethical, then supra-ethical.

সেই জন্য শ্রীঅরবিন্দের কাছে চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধে হচ্চে হওয়া "To become." "The ultimate value of a man is not to be measured by what he says or does, but by what he becomes."

শ্রীঅরবিন্দের নিজের জীবনই (যেটুকু বাইরে থেকে দেখা যায় বা বোঝা যায়) একটি মহাকাব্য। জন্ম হয়েছিল তাঁর শ্রীমতাং গেহে। বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যময় উজ্জ্বল মোহে, যৌবন কাটলো বরোদায় বাণীর সাধনায়, অন্তরের ধ্যানের নির্দেশে। যৌবনোত্তর দিনে সেই ধ্যানের ভাষা নিবিড় হয়ে নামলো মনে, হলেন তিনি কর্মযোগী, এলো তাঁর তিনটে পাগলামী, ব্রহ্মবান্ধবের মানসসরোবরের প্রফুল্ল কমল তিনি অথচ বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ—দেবী চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ড দোর্দণ্ড লীলা যার, যিনি অনয়াবাধিত রাধা যিনি মাহেশ্বরী মহাকালী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী অর্থাৎ সব মিলিয়ে মহাশক্তি ভবানী তাঁরই মন্দির গড়তে ডাক পড়লো তাঁর। তাঁকে একতারা ফেলে দিয়ে ভেরী নিতে হয়েছিল তূর্যনাদে। সেদিনের বহ্নিমান যৌবনের অরবিন্দকে প্রৌঢ় প্রহরের রবীন্দ্রনাথ লহ নমস্কার বলে অর্ঘ দিয়েছিলেন, চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—এই সেই মানুষ যাঁর কথা লোকে বলবে যুগযুগ পরেও। তারপর নামলো আরো গভীরতর ছায়া, কারাগারে দর্শন দিলেন যাঁর আবির্ভাব আর এক কারাগারে। বৃহত্তর পরিণতির জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন, গভীরতম অনুভূতির জন্য এবং সেই পর্ব তার জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস, আত্মবান হবার আকাঙ্খা, আলোর ইতিহাস, আরো আলোর

Higher audience brings
The footsteps of invisible things.

পত্রাবলীর শ্রীঅরবিন্দ

অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র

শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনার আদিতেই মনে পড়ে যে, তাঁর যোগসাধনার এবং অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির মূল বা উৎসের আলোচনায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে যে, তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ এবং জড় জগৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবে এই উভয় মতই অদ্বৈতবাদের শৈব ও শাক্ত প্রস্থানের মধ্যে খুঁজে পান। তন্ত্রের মতে মায়া মিথ্যা নয়,—শিবেরই শক্তি। এই শক্তির সাহায্যেই জগতের আবির্ভাব ঘটে।

তাঁর মতে যোগের উদ্দেশ্য হোলো সচ্চিদানন্দের অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি আহরণ করে তা জগতে প্রয়োগ করা। জড় থেকেই প্রাণ ও মনের আবির্ভাব ঘটে, আবার শক্তির মধ্যেই জড় সুপ্ত থাকে। সাধারণ জীব-মনের ওপরে তিনরকম উচ্চস্তরের মন বিদ্যমান—উচ্চমন বা over mind ; মহা-মন বা Super-mind এবং—"সর্বোচ্চ উপলব্ধ আদর্শ সচ্চিদানন্দ"। এই উপলব্ধি মানুষের সাধ্য।

"দিব্য-জীবন-প্রসঙ্গ" বইখানির দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনির্বাণের একটি উক্তি হোলো—"তাঁকে জানতে হবে—এ তাগিদ প্রাণের গোড়ায়। কিন্তু কী করে জানব, সেই হল সমস্যা। বাইরের জগৎকে জানি ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে।"—"জানতে হবে মন দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে নয়—বোধ (intuition) দিয়ে।" —"মনকে করতে হবে 'অন্তর্লক্ষ বহির্দৃষ্টি' যোগীর মন।"

Super-mind-এর বাংলা প্রতিশব্দ হোলো 'অতিমানস'।

সাধারণ যে প্রাকৃত জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের জীব-মনে ঘটছে তার প্রকৃতি—"শুধু জানার সাধন, হওয়ার সাধন নয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে এলোমেলো করে উপরভাসাভাবে জানি; তাকেই একটু গুছিয়ে আর তলিয়ে জানি মন দিয়ে। মন তাই অন্তরিন্দ্রিয়; স্বভাবতই সে চেতনার সবখানি নয়। চেতনার মধ্যে শুধু জানার ব্যাপার, চলছে না; জানার পিছনে অলক্ষ্যে চলছে একটা হওয়ার লীলা। এই হওয়াটা মনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়; তার ন্যূনতাকে পূরণ করে হৃদয়। হৃদয় হয়ে জানে; তাই সে জানে অখণ্ডভাবে, মনের মতো টুকরো টুকরো করে নয়।" এই 'হৃদয়' শব্দটির ইঙ্গিত বোঝাতে গিয়ে অনির্বাণ লিখেছেন—"বেদের ঋষি তাই বলেছিলেন, তাঁকে পেতে হবে শুধু মন দিয়ে নয় মনীষা দিয়েও নয়—পেতে হবে হৃদয় দিয়ে।" ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি বিশেষ বিশেস বিষয়ে; মনের দৃষ্টি কতকটা অস্পষ্ট-ভাবে হলেও সামান্য দর্শন বা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক; হৃদয়ের উপলব্ধি জগৎ সম্বন্ধে আত্মিক ঐক্যের চেতনা।

শুধু বিভিন্ন শব্দ বা পরিভাষা আয়ত্ত করেই শ্রীঅরবিন্দ প্রদর্শিত যোগ-সাধনার লক্ষ্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে মোটামুটি আমাদের প্রাকৃত মনের যেসব অভিজ্ঞতা, দুঃখবোধ, আকূতি ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলির প্রসঙ্গমূল্য কম নয়। মন জানে 'বিদ্যা' আর 'অবিদ্যা' পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। আমরা অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছি—তারই ফলে জগতে দুঃখ বোধ করাই আমাদের নিয়তি। দিব্য জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকের মনে এসব চিন্তা দেখা দেবেই। 'অবিদ্যা' মনের এলাকাতেই বিদ্যমানা বটে, কিন্তু মনই মূল নয়। অনির্বানের আলোচনা উল্লেখ করে বলা যায়—"আমাদের মধ্যে অবিদ্যা দেখা দিয়েছে মনের মায়া হয়ে, আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব হয়ে। কিন্তু এই মায়া বা দ্বন্দ্ববোধই বিশ্বের একমাত্র সত্য নয়। আলোই সত্য।" তিনি অরবিন্দ-

দর্শনের কথা স্মরণ করে বলেছেন—"আসলে মন নিজেই রয়েছে অবিদ্যার এলাকায়।" আবার—"অবিদ্যার মূলে আছে বিদ্যার বেগ। তাইতে তার মধ্যে ফুটছে ক্রমবিকাশের একটা ছন্দ, অবিদ্যা ধীরে ধীরে বিদ্যা হয়ে উঠছে।"

১৯২০, ৭ই এপ্রিল তারিখের চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন ['সেজদা' স্বাক্ষরে] যে, তাঁর নিজের মনও প্রথমে পথ খুঁজে দেখেছে-তারপর পণ্ডিচেরীতে গিয়ে চঞ্চল অবস্থা কেটে যায়—তিনি পূর্ণ যোগের পথ খুঁজে পান—"পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ কর্ম ও পূর্ণ ভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ত্ব।" বিজ্ঞানভূমি হোলো Supramental স্তর। এই চিঠিতে তিনি লেখেন—"যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তারপর বড় ছোট এ সবেতে কিছু আসে যায় না।··· আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল? সময় কি লাগে নি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন? দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্ত দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানিনা; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি—ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। সকলেরই তাই।"

শ্রীঅরবিন্দের (১৮৭২-১৯৫০) আয়ুষ্কালের বিভিন্ন কর্মপর্বগুলি সংক্ষেপে সূচিত ক'রে 'ভারতকোষ' এর প্রথম খণ্ডে অনিলবরণ রায় দেখিয়েছেন যে, তাঁর যখন সাত বছর বয়স ছিল তখন তাঁকে আর দুই ভাইয়ের সঙ্গে পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ইংলণ্ডে এক ইংরেজ-পরিবারে রেখে আসেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করে অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পাশ করেন, কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় তিনি চাকুরির জন্য মনোনীত হননি। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস্' পাশ

করে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি দেশে ফিরে বরোদা কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং সেখানকার অধ্যক্ষ হন। মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের নেতা পুনার ঠাকুর সাহেবের কাছে তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে তিনি বাংলায় বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্যে পাঠিয়ে দেন। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলকের জাতীয় অন্দোলনে অরবিন্দের ছাত্ররাই ছিলেন প্রধান কর্মী। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের যখন সূচনা হয়, তখন তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯০৬ সালে বাংলায় চলে এসে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সদ্যস্থাপিত কলেজে অধ্যক্ষ হন। স্বরাজই প্রধান লক্ষ্য, এই আদর্শ মেনে নিয়ে কংগ্রেসের মডারেট দলের বিরুদ্ধে ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পরিচালনা শুরু হয় ১৯০৬ থেকে এবং ১৯০৭ ৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হয়ে বন্দী হওয়া পর্যন্ত এই পত্রিকা পরিচালনা করে যান। ১৯০৮-৯ সাল পর্যন্ত তাঁর এবং তাঁর সহযোগী বিপ্লবীদের বিচার হয়। আলিপুর বোমার মামলা থেকে মুক্তি লাভ ক'রে তিনি সনাতন ধর্মপ্রচার ও জাতীয় দল পুনর্গঠনের দিকে মন দেন। ঐ উদ্দেশ্যেই তিনি ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন, তারপর রাজনীতির সম্পর্ক পরিত্যাগ করে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে যোগসাধনায় মন দেন। ১৯১৪ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত দর্শন বিষয়ে ইংরেজি পত্রিকা 'আর্য'-তে দিব্যজীবনের কথা তিনি নানাভাবে আলোচনা করেন।

তাঁর বাংলা রচনার পরিমাণ খুব বেশি নয়। এই বাংলা লেখা-গুলির মধ্যে 'পত্রাবলী' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁর পত্নী মৃণালিনীদেবীর কাছে লেখা চিঠিগুলি,—তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে লেখা চিঠি,—তাছাড়া আরো কিছু চিঠির নিদর্শন তাঁর পাঠক সমাজে পরিচিত। পত্নীকে তিনি লিখেছিলেন—"তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ,

যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে।" এই চিঠিতে তিনি নিজেকে 'মহাপুরুষ' বলে চিহ্নিত করেননি,—লিখে-ছিলেন—"আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে।" এবং মৃণালিনীকে পাগলেরই সহধর্মিণী হবার বিধিলিপি মেনে নিতে পরামর্শ দেন।

নিচের তিনটি পাগলামীর প্রসঙ্গ এই চিঠিতে তিনি বর্ণনা করেন। সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গগুলি হোলো—(১) "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর।" (২) দ্বিতীয় পাগলামি—"যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সেই পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্মে বলে, নিজের শরীরের মধ্যে, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সকল পালন আরম্ভ করিয়াছি, একমাসের মধ্যে অনুভব করিলাম, হিন্দুধর্মের

কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে, সেইসব উপলব্ধি করিতেছি।" (৩) "তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্যলোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলী মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে ও স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না জ্ঞানের বল।"

মনকে দৃঢ় করবার পরামর্শ ছিল এই পত্রে। স্ত্রীকে তিনি লেখেন—"তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্রা সরল্। যে যাহা বলে তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হইবে, এক জনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য করিয়া অবিচলিত চিত্তে কার্য সাধন করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে।"

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখের চিঠিতে ২৩ নম্বর স্কটস লেন, কলকাতা থেকে মৃণালিনীকে তিনি "অতিশয় গোপনীয়" এই কথাটি জানান—"এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন, সেই-খানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।…তুমি যদি আমার সহধর্মিনী হইতে চাও তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে যাহাতে তিনি তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুণা-পথ দেখাইবেন।"

অন্যান্যদের কাছে লেখা তাঁর বিভিন্ন পত্রে তিনি যোগের প্রসঙ্গ,—ভারতবাসীর তথা বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তির হ্রাস,—অন্তরের যথার্থ সমর্পণ চর্চার প্রয়োজনীয়তা,—অহংকারের বা বহিঃপ্রকৃতির বশ্যতা ত্যাগের অনুশীলন,—জীবনে বিচিত্র বাধা-বিঘ্নের আবির্ভাব,—সত্তার সর্বাংশের রূপান্তরণের প্রয়াস ইত্যাদি নানা কথা লিখে গেছেন। এইসব চিঠির সাহিত্য মূল্যের জন্যে নয়, এগুলির মধ্যে নিহিত তাঁর উপলব্ধি ও নির্দেশের মূল সূত্রগুলি এক নজরে লক্ষ্য করবার সুবিধার জন্যেই এগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'যোগের ভিত্তি'—পর্যায়ের চিঠিগুলিতে দেখা যায় তিনি লিখেছেন—"নিজেকে সংযত করে রাখা—কারো দিকে আকর্ষণ হতে না দেওয়, কারও vital টানকে প্রশ্রয় না দেওয়া, নিজেও তার উপর কিছু ফেলবে না vital মোহ বা আকর্ষণ—ইহাকেই বলে নিজের মধ্যে ঠিক থাকা।" আবার জানিয়েছেন—প্রাণকে ধ্বংস করতে নেই, প্রাণকে ভগবানের যন্ত্র করতে হয়। 'পাপ' শুধু মানুষের দুর্বলতা ; দৃঢ়তা ও ধৈর্যের জোরে পাপ জয় করা সম্ভব ; শান্ত হওয়াটাই সাধনার মূল কথা ; "শরীরের স্নায়বিক ভাগে (nervous system-এ) শান্তি ও শক্তি নামান, এই ছাড়া উপায় নেই nerves কে সবল করবার।" পত্রাবলীর নানা অংশে তিনি মায়ের সান্নিধ্য উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন—"মা ত আছেন তোমার ভিতরে। যে পর্দা পড়েছে physical প্রকৃতির, তারই উপর শক্তির কাজ করা হচ্ছে, সে মায়ের আলোকে শেষে transparent হয়ে যাবে।" আবার—"physical consciousness-এর অজ্ঞান তামসিকতা ভুল-বোঝা ইত্যাদি নিজের বলে গ্রহণ করতে নেই, যেন বাহিরের যন্ত্র ; সেই যন্ত্রের যত দোষ অসম্পূর্ণতা সব মায়ের শক্তি সারিয়ে দেবে এই জ্ঞানই রেখে ভিতর থেকে সাক্ষীর মত অবিচলিত হয়ে দেখতে হয়—মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে।" সাধনার পথে নৈরাশ্য, বিষাদ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

কিন্তু সে শুধু পথের অংশ মাত্র। "আমি পারি না, আমি মরব, আমি চলে যাব ইত্যাদি করলে বাধা আরও ঘনিয়ে এসে তামসিক অহংকারকে বাড়িয়ে দেয়।"

একটি চিঠির অংশ—"মানুষের মনই অবিশ্বাস কল্পনা ভুল চিন্তায় অশ্রদ্ধায় ভরা, অজ্ঞানে ও দুঃখেও ভরা। সে অজ্ঞানই, সে অশ্রদ্ধার কারণ, সে দুঃখের উৎস। মানুষের বুদ্ধি অজ্ঞানের যন্ত্র; প্রায়ই ভুল চিন্তা ভুল ধারণা আসে, অথচ সে মনে করে আমারই চিন্তা সত্য। তার চিন্তায় ভুল আছে কি নাই, আর ভুল কোথায় তা দেখে বিবেচনা করবার ইচ্ছাই তার নাই। এমন কি ভুল দেখালে অহংকারে লাগে, ক্রোধ হয় বা দুঃখ হয়, স্বীকার করতে চায় না।... যদি শুনতে হয় আসল কথা, নিজের ভিতরে গিয়ে psychic being কে জানাতে হয়, তার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে সত্যবুদ্ধি মনে বেড়ে যায়, সত্য ভাব ও feeling হৃদয়ে আসে, সত্য প্রেরণা প্রাণে উঠে, psychic-এর আলোতে মানুষ বস্তু ঘটনা জগতের উপর নূতন দৃষ্টি পড়ে, মনের অজ্ঞান, ভুল দেখা, ভুল চিন্তা অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা আর আসে না।"

'অবচেতনা', 'দেহচেতনা'—আবার 'ঊর্ধ্বচেতনা' ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ আছে এইসব চিঠিপত্রের বিভিন্ন অংশে। এইরকম এক অংশে লিখেছেন—"সাধারণ মনের তিনটি স্তর আছে। চিন্তার স্তর বা বুদ্ধির, ইচ্ছাশক্তির স্তর (বুদ্ধিপ্রেরিত will) আর বহির্গামী বুদ্ধি। উপরের মনেরও তিনটি স্তর আছে—higher mind, illumined mind, intuition।"—আবার—"Psychic being ভগবানের অংশ, সত্যের দিকে ভগবানের দিকে তার টান আর সে টান বাসনাশূন্য, দাবী নাই, নীচ কামনা নাই। Psychic emotion পবিত্র নির্মল। Emotional vital-এর অংশ—বাসনা, দাবী, অহংকার অভিমান ইত্যাদি যথেষ্ট আছে, ভগবানকে চায় নিজের

অহংকার বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে—তবে Psychic-এর স্পর্শে শুদ্ধ পবিত্র হতে পারে।

এই Psychic-এর স্পর্শ কী কৃপার ব্যাপার? মনে মনে এই প্রশ্ন জাগে। মনের সঙ্গে লড়াই করেই কি তাঁকে পাওয়া যায়? শ্রীঅরবিন্দ পদে পদে সাধনার কথা বলেছেন।—"শান্ত অচঞ্চল হয়ে মায়ের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে আস্তে আস্তে এগুতে হয়—এক মুহূর্তে হয় না। আজই সব চাই এইরূপ দাবি করলে আরও বাধা হয়। ধীর স্থির হয়ে থাকতে হয়।" আবার—"ধৈর্য চাই, মায়ের উপর বিশ্বাস চাই, দীর্ঘকালব্যাপী সহিষ্ণুতা চাই। যে ভগবানকে চায় তাকে ভগবানের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যে সাধনা চায় তাকে সাধনার পথের কষ্ট বাধা বিপরীত-অবস্থাকে সহ্য করতে হয়।"

তাঁর বাংলা পত্রাবলীতে এই আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতগুলিই হোলো সর্বাধিক আবেদনের বিষয়।

*

বর্ত্তমান সঙ্কটে যুবশক্তির ভূমিকা

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক

সমাজনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের বর্ত্তমান চিন্তাধারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ভারতের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন তাৎপর্য্যপূর্ণ চিন্তা বা দর্শন আছে কিনা সেটা কেবলমাত্র অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় হিসাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেতনায় আছে, তাও আসলে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ। ব্যবহারিক জীবনে তার কোন প্রযুক্তি নেই। আমরা স্বত্ব, সমতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র এই প্রত্যয়গুলি যে-অর্থে পাশ্চাত্ত্য জগতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেই অর্থে বুঝে থাকি এবং তারই ভিত্তিতে ভারতে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করছি। সাফল্য ও সুফল কতটা যে পাচ্ছি তা বিচার্য্য। পরিণামে এই ব্যবস্থা আমাদের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে কিনা সে কথা সুসম্বদ্ধভাবে চিন্তা করছি না।

পাশ্চাত্য জগৎ ব্যক্তির ও সমষ্টির কল্যাণসাধনে বা জীবনাদর্শ লাভের জন্য অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ প্রজননে কতটা কৃতকার্য্য হয়েছে তা বিচার করা প্রয়োজন। গত পাঁচশতকের যুগান্তকারী বা যুগ প্রবর্ত্তনকারী কয়েকটী সংঘটন, যথা ইতালীয় রেনেশাঁস, প্রটেস্টাণ্ট রিফরমেশান, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও তাদের পরবর্ত্তী ইতিহাসের পরিণতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রসারণের ফলে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাতে একশ্রেণী কেন্দ্র থেকে অন্য এক শ্রেণীকেন্দ্রে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে কিন্তু আসলে

শাসক শাসিতের সম্পর্ক অপরিবর্ত্তিত থেকে গ্যাছে এবং দেশের একাংশ লোকের কিছুটা সুবিধে হলেও অধিকাংশ লোক যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গ্যাছে। একটি ক্ষুদ্র শাসক গোষ্ঠি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে এবং সমাজও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বলবৎ রাখতে বল-প্রয়োগ করতে হয়েছে। আবার মাথা তুলেছে প্রতিবাদ, দেখা দিয়েছে নূতন চিন্তাধারা, নূতন সমাজতত্ত্ব, অসন্তোষ ঘনীভূত হয়েছে এবং সাময়িকভাবে দ্রবীভূত হয়েছে আর একটা বিপ্লবের পর। একটী বিপ্লব পরের বিপ্লবের বীজবহন করে নিয়ে গ্যাছে। তথাকথিত বিপ্লব থেকে বিপ্লবান্তর হয়েছে কিন্তু এমন কোন মূলগত সামাজিক ব্যবস্থার বা পরিবেশের পরিবর্ত্তন হয়নি যাতে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে ও স্বাধীনতার মধ্যে আত্মবিকাশ করতে ও স্বচ্ছন্দজীবন গঠন করতে সমর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার বীজ পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে বর্ত্তমান রয়েছে।

পাশ্চাত্য জগৎ মানুষের প্রাণ শক্তিকে কেন্দ্র করে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতের, সভ্যতা মানুষের আত্মাকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে। প্রাণশক্তিকে অনুসরণ করে ইউরোপ তার সভ্যতা সৌধ গড়ে তুলেছে যুক্তিবাদ ও জড়বাদের ভিত্তির উপর। বস্তুগত সুখ-সম্ভোগ, বস্তুগত প্রগতি, ও বস্তুগত জীবনের কর্ম্মকুশলতাকে করেছে তার উপাস্য দেবতা এবং মানুষকে দেখেছে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক জীব হিসাবে। 'মানব প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয়' এই মূল নীতি-স্বীকার্য্য নির্ণীত করেছে তার দৃষ্টিভঙ্গী। এই বস্তুগত ভোগসুখান্বেষী অর্থ-নৈতিক ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ও সমাজসমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে এসে নিগৃহীত ও বিধ্বস্ত হচ্ছে। ব্যক্তিসত্তা ও সমষ্টিসত্তার সামঞ্জস্য ব্যতীত প্রকৃত অবস্থার সৃষ্টি সম্ভব নয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিব্যক্তির সাম্প্রতিক পরিণতিতে ব্যক্তিকে

সমাজদেহের পরমাণু বা কোষ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই চরম পরিণতির সংঘাতে ব্যক্তিচেতনা জাগ্রত হয়েছে এবং মানুষ আজ উপলব্ধি করেছে যে সে নিছক সমাজদেহের একটি কোষ বিশেষ নয়। তার সত্তা, তার জীবিত থাকার ও আত্মবিকাশের দাবী কেবলমাত্র তার সমাজ বৃত্তির বা কর্ম্মের উপর নির্ভর করে না, তার স্বাতন্ত্র্য আছে, আত্মা আছে, সে একটি সত্তা যাকে তার সমষ্টিগত সত্তার ধর্ম্ম, সত্য ও কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে যুগপৎ ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রতিযোগীতা ও উপযোগিতা মুলক ও প্রবলভাবে অর্থনীতি প্রভাবাধীন পাশ্চাত্য সভ্যতা অতি প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে অসমর্থ, যেহেতু মানব প্রকৃতি আসলে জড়বাদী অর্থনীতির দাস নয় এবং প্রবৃত্তির সন্তোষ সাধন করা তার জীবনের উদ্দেশ্য নয় এবং যেহেতু জড়বাদভিত্তিক ব্যবস্থায় সামঞ্জস্যের পথ রুদ্ধ। পরিণামে এই সভ্যতাকে আশ্রয় করে মানুষের ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থা চক্রগতির আবর্ত্তে ঘুরছে, মানুষের প্রগতি উত্থান পতনের বৃত্তে আবর্ত্তিত হচ্ছে, সরলরেখায় অগ্রসর হচ্ছে না। অতএব প্রাণকেন্দ্রিক যুক্তিবাদী ও জড়বাদী সভ্যতা মানুষকে এক নিষ্ক্রান্তিহীন রাস্তায় উপস্থিত করেছে।

বিশ্বজীবনের অভিব্যক্তি ক্রমোর্দ্ধ পারম্পর্য্যের ধারা অনুসরণ করে জড়জীবন থেকে মনোময় মানুষের স্তরে উন্নীত হয়ে ভবিষ্যত প্রগতির বাহকরূপে মানুষকে অবলম্বন করেছে। আধুনিক মানুষ প্রকৃত সুখলাভের সন্ধানে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা গঠন করে চলেছে প্রাণ-শক্তির তাড়নায়। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আজ সে উপনীত হয়েছে এক চরম সঙ্কটে। আধুনিক জীবনের ভাবধারা পরিহার করে উর্দ্ধতন-স্তরে জীবনকে উন্নীত করা পরিত্রাণের একমাত্র পথ। মানব প্রকৃতি পরিবর্ত্তনীয়। অন্তরের নিগূঢ় অন্তঃস্থলে প্রতীচিরও এই বোধের উন্মেষ হচ্ছে। ভারত, যার মানস সভ্যতা সংস্কৃতি ও জীবন দর্শন

আধ্যাত্মিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবজাতিকে ভবিষ্যত প্রগতির পথ প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু তার আগে নিজের জাতীয় জীবনকে মোহমুক্ত করে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হবে। ভারতের মনীষা ও প্রতিভার সঙ্গে ইউরোপের মানস সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির বৈষম্য এত মূলগত ও গভীর যে আধুনিক জীবনের ভাবধারা ভারতীয় জীবন প্রবাহের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে তাকে রূপান্তরিত করে নিতে পারলে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,—"ভারত আধুনিক কালের জীবন ও ভাবনার প্রবল বন্যার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা তাহার বিপরীত অথবা অন্ততঃপক্ষে যাহা ভিন্নজাতীয় প্রকৃতিদ্বারা অনুপ্রাণিত তেমন এক শক্তিশালী সভ্যতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এরূপক্ষেত্রে ভারতের পুনরুজ্জীবনের একমাত্র উপায় তাহার নিজস্ব প্রকৃতির উপযোগী নূতন দিব্যতর সৃষ্টিসমূহ সঙ্গে লইয়া এই অর্ব্বাচীন নবীন আক্রমণশীল ও শক্তিশালী জগতের সম্মুখীন হওয়া।"

ভারতীয় সভ্যতার প্রবল প্রাণশক্তির সাক্ষ্য তার সুদীর্ঘ উদবর্ত্তন। বহিরাগত কোন সভ্যতা সংস্কৃতি বা ভাবধারা তার বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন তো করতেই পারেনি উপরন্তু "বিপদের আশঙ্কাশূন্য এক বৃহৎ সহিষ্ণুতা ও পরিপাক করিয়া অঙ্গীভূত করিবার" আশ্চর্য্য শক্তি তাকে নব সম্পদবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যাও তার মূল শিকড়গুলিকে দুর্ব্বল করতে পারেনি এবং তার পক্ষে আজ আধুনিক সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিধানকে রূপান্তরিত করে স্বীয় ভাবধারার সামিল করা সহজ সাধ্য। উপরন্তু ভারতীয় সভ্যতার রাষ্ট্রনৈতিক সামর্থ্যের কোন অভাব নেই বরং সমাজের জীবন্ত মানসিক ও দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের তার অপূর্ব্ব প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে। আধুনিক ব্যবস্থাকে ভারতের "উচ্চ ও মহৎ আদর্শের অগ্রগতির ছন্দে চালিত" করতে হলে প্রয়োজন নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীর, মানসিক সজীবতার, নির্ভীকতার ও আত্মনিবেদনের। যারা

বর্ত্তমান নীতি ও মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত, যারা প্রতিষ্ঠিত বিধানের অঙ্গ তাদের নিকট সংশোধনের চেয়ে গুরুতর কোন প্রয়াস প্রত্যাশা করা বৃথা। নবজীবন ও নবজগত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হোল মুক্ত দৃষ্টির, স্বাধীন চিন্তার, সংস্কারমুক্তমনের ও প্রাণাবেগের। আধুনিক সভ্যতার শোচনীয় পরিণামের ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ যে অসন্তোষ ও মোহমুক্তির প্লাবন এসেছে তার পূর্ণতম প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরুদ্ধে তরুণের বিদ্রোহ। প্রচলিত মূল্যবোধের প্রত্যাখ্যানে যে সজীব মননের ব্যঞ্জনা ও প্রাণশক্তির ইঙ্গিত রয়েছে তারই মধ্যে আছে নূতন জগতের সম্ভাবনা। একদিকে আছে ব্যক্তি সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অপ্রতিরোধ্য বেগবান দাবি ও অন্যদিকে আছে জনসমূহের দূরবস্থায় সংবেদন তথা সমষ্টিসত্তা সম্বন্ধে চেতনা। নবজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য তাই শ্রীঅরবিন্দ যুবশক্তিকে আহ্বান করেছেন এবং কর্ম্মসূচির নির্দ্দেশ দিয়েছেন, বলেছেন, —"একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, তাকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে হবে প্রেম, মানব কল্যাণে, আত্মনিবেদন ও বীর্য্যবান কর্ম্মের দ্বারা। দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা ও জনকল্যাণে অবিচল কর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, জাতির নৈতিক শুদ্ধতা পুনরুদ্ধারে ব্রতী হতে হবে। এ কাজ তরুণদের।"

*

প্রণতি-নিবেদন

শ্রীভোলানাথ শীল

বিনা সৌরভ শব্দের পুষ্পে, লেখনী মর্মপীড়ক জানি। হে শব্দের সৃষ্টিকর্তা, যথার্থের নিরূপণের জন্যই প্রথমে শব্দের সৌম্যমূর্তিকে আহ্বান করি আমার লেখনীর অন্তরালে যেন শব্দের ঘাতক দর্প না করে। কাহারো কাছে যেন দুঃখের হেতু না হই। এ ছাপ, আমার পাণ্ডুলিপি—সুনামের জন্য রচিত নয়, কল্যাণার্থী হয়ে। শ্রীঅরবিন্দের ওঁকারে বিশ্বব্যাপী দিব্যচক্ষু—"শিশুর কাছে, মায়ের বক্ষোজ যেমন প্রিয়" :

তোমার লেখনীর দর্শন, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ এ, তোমার-লিখিত বই—পুঁথি যেন—যেন কেন? নিশ্চিত পাদপ্রক্ষালিত জল অর্থাৎ সেই চরণামৃত জল প্রতি মানুষের চরিত্রে এক দৃষ্ট দারিদ্র্যকে দোষ-ক্ষেত্র থেকে করে উদ্ধার। হে ব্রহ্মপ্রাপ্ত শ্রীঅরবিন্দ—তোমার শব্দের শিল্পকারী কে? কঠিন এ প্রশ্নের উত্তর তুমিই জানো শুধু। এই মুহূর্তে আমার উপস্থিত প্রশ্নর জন্য তোমার লিখিত "পাণ্ডুলিপির ছাপ" নিয়ে আমি তোমার পূজারী। শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অনর্থক, কারণ আমার হাতে নেভা প্রদীপ —যদিও তোমার আলোকে আমার "নেভা প্রদীপ শব্দের" নিবেদিত পুষ্পাদিতে শুধু এই কথাই বলতে পারি—সর্ববিধায়ক পবিত্র ঈশ্বর তুমি, হে মঙ্গলদায়ক শিব, তোমার নামেই "শান্তি মিলিত যেন"—স্থিরীকৃত। নিশ্চিত তোমার দিব্যচক্ষু—ইহার সুরে সব কিছু মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব। প্রত্যক্ষ-দৃষ্টান্তে বলতে পারি আমি : শেষ কথায় মানুষ কখনো আসতে পারবে না ; শব্দের শব্দে বা শব্দের

আঘাতে অনেক শব্দ বিনির্গত হয়, বিকৃতও হয়—ইহাই নয় যে শব্দের আসল অর্থ বোঝা যায় না শব্দমাত্র স্বরূপ-বিকীরণ হয়ে গেলে ; বরং অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-শব্দটি হল ঈশ্বর আনন্দ ও অস্তি প্রতি মানুষের। এ কথা প্রত্যক্ষ করা ভিন্ন নাস্তিকই একমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসী অতিসুক উৎসুক সে। শ্রীঅরবিন্দর পুঁথি কীর্তি বর্ণনায় দীপ্তি-শোভায় প্রভাতের সুরে এই দাঁড়িপাল্লার মতো শব্দের দুইদিক সমান করে নেওয়া নয়—সেই শক্তি বোঝাই-করা পাল্লা থেকে আর এক পাত্রের ওজন বাদ দেওয়ার বিশ্বভূ বিকিরণ :

One grew the Spirit's secret unity,
All nature felt again the single bliss ;
There was no clearage between soul and soul,
There was no barrier between world and God.

(Savitri pp 319)

শিশুকে সযত্নে লালন-পালনের ন্যায় তোমার কোল-আঁচলের আশ্রমে আজ সহস্র সহস্র শিশু তোমার ছায়ার সম্মুখে, তোমার শুভকর্মের হস্তে পরিচারী আশ্রম আজ প্রতি মানুষের 'চিরজীবিতের' উন্মেষ জননী-সাক্ষাতে। শব্দের বাণিজ্যধারী তুমি নও, নও বক্তৃতা কর্তা, সত্যবাস্তবের (কৃত্রিম) লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্ত তুমি, তোমার কর্মের সংকেতেই আগামী দিন নাম সহ সৃষ্টিই প্রতিনিধির গুণগায়ক ॥

*

শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলাদেশ, একটি সমীক্ষা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

এই ভূখণ্ডে আমরা যাঁরা একটি প্রচণ্ড অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে রইলাম, একদিকে মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা অন্যদিকে মানুষের জ্বলন্ত আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার আলোতে মানুষের মধ্যেই সেই মহাশক্তির স্ফুরণকে লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম অথবা নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে ছুঁড়ে ফেলার শক্তি পেলাম তাঁরা কিন্তু আসলে ইতিহাসেরই কয়েকটি পাতা উল্টে গেছি। ইতিহাস কোন মানুষকেই ক্ষমা করে না। ইতিহাসের বিচারে দুর্ধর্ষ জেনারেল অথবা কোন রাষ্ট্রনায়কের ক্যারিকেচার কিম্বা কোন সুবিধাবাদী শয়তান সবাই সমান। মানুষের ঐক্যবদ্ধ শুভপ্রচেষ্টার সামনে, মানুষের প্রত্যক্ষ জাগরণের সামনে সমস্ত পৃথিবীর অস্ত্রশালার সর্বাধুনিক সমরসম্ভার যে নিতান্তই তুচ্ছ তা আর একবার প্রমাণিত হল। মানুষের মনের বারুদের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রসায়নশালার অতি শক্তিশালী গানপাউডার ও হার মেনেছে।

এই রণাঙ্গন এখন পবিত্র, এ যেন আর এক কুরুক্ষেত্র। এখানে যে সংগ্রাম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাহল মানুষের অপরিসীম লোভের বিরুদ্ধে, দীর্ঘ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সমরাঙ্গণে আমরা মুখোমুখি দুদল মানুষকে নয় মানুষের দুটি প্রবৃত্তিকে দেখেছি, দেখেছি হিংসা আর লালসার জঘন্য চেহারা, দেখেছি ত্যাগ আর নিষ্ঠা আর আদর্শ মানুষের আত্মিক শক্তিকে। বন্দুকের নল এখন ঠাণ্ডা, আধুনিক রণসম্ভারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বহু সংগ্রামী মানুষের শরীর মাটিতে মিশেছে, উচ্ছ্বাস আর আবেগ আর প্রতীক্ষার অবসান।

দীর্ঘ অন্ধকার রাতের শেষে এখন সূর্যোদয় হয়েছে। এ সূর্য এখন আরো জ্বলন্ত, এ সূর্য এখন নবীন ঘাসের মত স্নিগ্ধ পবিত্র। এ যেন সেই সত্যের শুভ্র চন্দ্রালোক যার জন্যে গুরু নানক একদিন গভীর বেদনায় বলেছিলেন :

এ যুগ যেন এক উন্মুক্ত কৃপাণ
নৃপতিরা সব ঘাতক জল্লাদ
যা কিছু শুভ সব ডানা মেলে
উড়ে পালিয়েছে
অসত্যের এই অন্ধ তামসী নিশায়
কোন জায়গায় সত্যের শুভ চন্দ্রালোক
খুঁজে পাচ্ছি না...

এখান থেকে অনেক দূরে ইসলামাবাদের মসনদে বসে যাঁরা সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা কি জানতেন ১৯৪৭ সালের রক্তাক্ত জন্মলগ্নে জন্মপত্রিকায় কি অমোঘ পরিণতির কথা লেখা হয়েছিল ? মহাভারতে দুর্যোধনের জন্মের সময় শোনা যায় সারা পৃথিবী জুড়ে এক ভীষণ হাহাকার উঠেছিল, আকাশে বাতাসে অশরীরী প্রেতের কান্না মানুষকে বিচলিত করেছিল। পাকিস্তানের জন্ম-লগ্নের ভারতব্যাপী সেই হানাহানিতেই লেখা ছিল এই শিশু রাষ্ট্রের মেজাজ ও পরিণতির কথা। আজ অকস্মাৎ তাঁদের আগ্রাসী নীতির রসাতলে তলিয়ে যেতে যেতে তাঁরা আর এক মহাপুরুষের দিব্যদৃষ্টির অভ্রান্ততার প্রমাণ রেখে গেলেন। ঋষি অরবিন্দ একই শরীর থেকে দুটি দেশের জন্মক্ষণেই আজকের এই বিক্ষিপ্ততা, এই হানাহানি অথবা পাকিস্তানের চরম ব্যর্থতা কিম্বা এই দ্বিধা বিভক্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভবিষ্যৎ যেন তাঁর দূরদৃষ্টির সামনে ছায়াছবির মত ফুটে উঠেছিল। তিনি দেখেছিলেন এই এশিয়-ভূখণ্ডের সর্বত্র নিষ্পেষিত, শোষিত মানুষের মুক্তি এবং প্রতিটি মুক্তি সংগ্রামে ভারতের ভূমিকা : 'free India

may well play a large part and take a leading position'.

এই মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষিকীর বছরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম যেন তাঁর জন্মানুষ্ঠান পালনেরই একটি শ্রেষ্ঠ আয়োজন। সত্যের শুভ্র চন্দ্রালোক যেন হারিয়ে যেতে যেতে আবার একটি দেশকে স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত করেছে। ১৯৭০ সালের শুরুতে শ্রীমা নববর্ষের বাণীতে বলেছিলেন—The world is preparing for a big change will you help. পরিবর্তন এসেছে। অনেক মানুষের রক্তে ঘামে আত্মত্যাগে একটি পবিত্র ফুল ফুটেছে: ধন্য তারা যারা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়ে ঝাঁপ দিয়েছে।

[কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত]

*

শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্র-দর্শন

সরল চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় নবজাগরণ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, নবজাগরণের প্রথম পর্বে ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সংযোগে পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত শিক্ষিত ভারতীয়রা ইঙ্গভাবাপন্ন হ'য়ে ভারতীয় সংস্কৃতির চিরায়ত ভাবধারাকে উদ্ধতভাবে অগ্রাহ্য করেছিল। উগ্র পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্বে পাশ্চাত্য প্রভাব, অবদানের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার ক'রে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতির পুর্ণজাগরণ প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। নবজাগরণের তৃতীয় পর্বে এক অভিনব সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ সুরু হয়। আধ্যাত্মিক, আত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় মানস সত্যান্বেষী হ'য়ে প্রাচ্য, প্রতীচ্যের ফলবতী ভাবধারাকে সৃজনশীল-ভাবে গ্রহণ, স্বীকরণ ক'রে স্নিগ্ধ ও সুসম ভারতীয় সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ দিয়েছে।

'কর্মযোগীর আদর্শ' প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ইউরোপীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ উনিশ শতকের ভারতবর্ষ রাজনৈতিক মুক্তি, সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু সেগুলি সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কারণ, ইউরোপীয় শিক্ষা, রাজনৈতিক পদ্ধতি, সংগঠন দিয়ে উনিশ শতকের ইঙ্গভাবাপন্ন নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষে ইউরোপীয় শক্তি, সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। একটি দেশের প্রাণ-প্রাচুর্য আর একটি দেশে কখনো হুবহু আনা যায় না। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, উনিশ শতকের ঈঙ্গভাবাপন্ন আদর্শ, লক্ষ্য, পদ্ধতি বিশ

শতক গ্রহণ করতে পারে নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ শতকের নতুন জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা ভবিষ্যত ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছিল।

ভারতে নতুন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশের মূলে অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল পাশ্চাত্য রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। এই নতুন জাতীয়তাবোধ ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে সংহতি স্থাপন করতে খুবই সহায়ক হয়েছিল। ইউরোপের রাজনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য চেতনাযুক্ত হ'য়ে নতুন জাতীয়তাবোধ দেশের সংস্কৃতি সচেতন জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিদেশী শাসকের কাছে ভিক্ষার ঝুলি হাতে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন নেতৃবৃন্দের বাক্‌সর্বস্ব আবেদন-নিবেদন-প্রার্থনার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হ'তে নতুন জাতীয়তাবোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই যুগে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদকে ভূগোলের চৌহদ্দী-বন্দী বিষয়িক উন্নতি সর্বস্ব রাষ্ট্রিক আকাংখা চরিতার্থ করার মন্ত্র হিসাবে দেখেন নি। আত্মিক বলের অভাবে প্রবল পরাক্রম, প্রাচুর্যময় রোমসাম্রাজ্য বিদেশীশক্তির আঘাতে পদানত হয়েছিল। শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নতি শ্রীঅরবিন্দ চান নি। তিনি চেয়েছিলেন, সুখী সংযত-স্বাধীন জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামগ্রিক রাজনিতিক প্রয়াস সৃষ্টি করতে।

শ্রীঅরবিন্দ পরাধীন জাতির আইনানুগত্যের ভিত্তি সম্পর্কে রাষ্ট্র দর্শন রচনা করেছেন। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের চেতনায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করলেন পরাধীন ভারতবাসী বৃটিশজাতি হ'তে নিকৃষ্ট নয়। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আইনের প্রতি পরাধীন জাতির কোন নৈতিক আনুগত্য নেই। উৎপীড়ন মুলক অন্যায় আইন অমান্য ক'রে শাস্তিভোগ করা পরাধীন জাতির পক্ষে নীতিসম্মত। শ্রীঅরবিন্দ

নতুন জাতীয়তাবোধের পুরোহিতরূপে পরাধীন দেশে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন গতিবেগ, সংগঠন, প্রতিরোধী মনোভাব। হতাশা, পরনির্ভরশীলতা, অসহায় মনোভাব অবসানের জন্য প্রয়োজন সমাজে গতিবেগ ; জাতীয় চেতনা সংহতির জন্য প্রয়োজন সংগঠন ; প্রতিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নিরস্ত্র প্রতিরোধ। নিরস্ত্র প্রতিরোধের নেতিবাচক বক্তব্য হ'ল অ-কল্যাণকর অন্যায় আইন অমান্য, অন্যায় সরকারী আদেশ অমান্য এবং দেশদ্রোহীদের সামাজিক বয়কট। নেতিবাচক বক্তব্যে নিরস্ত্র প্রতিরোধ সম্পূর্ণ হয় না। নিরস্ত্র প্রতিরোধ ইতিবাচকভাবে বিদেশী শিল্প বর্জন ক'রে স্বদেশী শিল্পের বনিয়াদ রচনার আহ্বান জানায়, ব্রিটিশ প্রবর্ত্তিত আদালত বর্জন ক'রে দেশী সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা বলে, এবং বিদেশী শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন ক'রে স্বদেশী ভাবধারায় শিক্ষা ও জাতীয় নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আহ্বান জানায়।

শ্রীঅরবিন্দ সর্বপ্রথম পরাধীন ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজ চেয়েছিলেন। স্বরাজের জন্য স্বরাজ অথবা রাজনিতিক স্বাধীকার প্রমত্ততার জন্য তিনি পূর্ণ স্বরাজ চান নি। তাঁর মতে ঔপনিবেশিক ধরণের স্বায়ত্ত শাসিত সরকার ভারতবাসীর আত্মিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক প্রকাশের প্রতিকূল ; ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃত ঐক্য স্থাপনের জন্য বিদেশীর রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান একান্তভাবে স্বরাজ প্রয়োজন ; পূর্ণ স্বরাজ ব্যতিরেকে অন্য যে কোন ধরনের স্বাধীনতা ভারতের জাতীয় মর্যাদা হানিকর ; ঔপনিবেশিক ধরণের সরকারের অর্থই হ'ল ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির উপর নিম্নশ্রেণীর হস্তক্ষেপ। অতএব শ্রীঅরবিন্দ চাইলেন পূর্ণ স্বরাজ। সংক্ষেপে, ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষার জন্য, জনগোষ্ঠীর যথার্থ ঐক্যের জন্য, জাতীয় মর্যাদার জন্য, ভারতবাসীর আত্মিক বিকাশের জন্য শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক দৃষ্টি শুধুমাত্র জাতি, জাতীয়তা বোধে আবদ্ধ ছিল না। নবজাগরণের তৃতীয় পর্বের স্বীকরণ ও সমন্বয় শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। জাতি, জাতীয়তাবোধ থেকে মানবতা, মানবতা থেকে বিশ্বমানবতায় তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা পরিব্যপ্ত। সাম্রাজ্যবাদ, অন্ধজাতীয়তাবাদ, জাতীয় অহংকার মানব ঐক্য ও বিশ্বমানবতার প্রধান অন্তরায়। সেইজন্য শ্রীঅরবিন্দ বললেন, দেশপ্রেমের প্রকৃত লক্ষ্য জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়ে মানব-জাতির ঐক্য সাধন করা। 'আইডিয়েল অফ হিউম্যান ইউনিটি' বা 'মানব ঐক্যের আদর্শ গডনে' শ্রীঅরবিন্দ বললেন, ঐক্য ও স্বাধীনতার সুসম সমন্বয়ে প্রকৃত মানব ঐক্য রচিত হয়। স্বাধীনতাবিহীন ঐক্য মৃত্যের ঐক্য, স্বাধীন অস্তিত্ব সৃষ্টি করে যথার্থ ঐক্য। বিশ্বের ছোট-বড় স্বাধীনজাতিগুলির সৃজনশীল অবদানে বিশ্বসংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয় এবং তার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে ওঠে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐক্য, মহত্তর ভাবগত ঐক্য, ব্যাপকতর মানব ঐক্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শ্রীঅরবিন্দের জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা জার্মাণ দার্শনিক হেগেলের জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। হেগেলের মতে জাতীয়রাষ্ট্রই যুক্তিশীলতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, জাতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের সত্ত্বাকে একীভূত করার মধ্য দিয়েই আসে ব্যক্তির নৈতিক মুক্তি। শ্রীঅরবিন্দ হেগেলের জাতীয়রাষ্ট্র সর্বস্ব তত্ত্বের বিরোধী। তাঁর মতে জাতি ও রাষ্ট্র এক নয় জাতির মধ্য দিয়ে জাতীয় আত্মার সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে, অপরদিকে রাষ্ট্র একান্তভাবে যান্ত্রিক। সুতরাং, জাতি ও রাষ্ট্র সমার্থবোধক নয়। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন ব্যক্তির আত্মিক বিকাশের মধ্য দিয়ে জাতীয় আত্মার প্রকাশ এবং মানবজাতির ঐক্য।

'মানব ঐক্যের আদর্শ গড়নে' শ্রীঅরবিন্দ মানবজাতির ঐক্য ও বিশ্বমিলনের চারটি সর্ত্তের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, রাজ-

নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে যুদ্ধের অবসান; দ্বিতীয়ত, আত্ম-নিয়ন্ত্র-নীতির স্বীকৃতি ও প্রয়োগ; তৃতীয়ত, জাতিগুলির পছন্দমত সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ; চতুর্থত, 'রিলিজিয়ন অফ হিউম্যানিটী' বা মানবতার ধর্ম হবে জাতীয় আবহাওয়া সৃষ্টি এবং বিশ্বমিলনের আবহাওয়া সৃষ্টির ভিত্তি। অন্ধ জাতীয়তাবাদের আদর্শ দেশই পূজ্য, দেশই ধর্ম; মানব ঐক্যের আদর্শ মানবতাই ধর্ম, মানবতাই পূজ্য। আঠার শতকের ইউরোপীয় যুক্তিবাদ, ফরাসী দার্শনিক কঁৎ-এর ধ্রুববাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের নীতিগুলি মানবতার আদর্শ, মানবতা ধর্মের আদর্শ প্রচার করেছে। এগুলি মানবতা ধর্মের বাহ্যিক দিককে ব্যক্ত করেছে। মানবতারধর্ম তত্ত্বে শ্রীঅরবিন্দ মানবতার আত্মিক, আধ্যাত্মিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্মে' লৌকিক মানবতার কথা বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে আত্মিক, আধ্যাত্মিক দিক বাদ দিয়ে মানুষ প্রধান দৃষ্টি মানবতা ধর্মের বিপরীত। অতএব চেতনা-বিবর্ত্তনের উন্নত স্তরে জাতীয়তাবোধের মধ্য দিয়ে মানবতার ধর্ম ও মানব ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

*

স্বরাজ ও আধ্যাত্মিকতা

অমিয় কুমার মজুমদার

শ্রীঅরবিন্দের মতে, স্বরাজ ভারতবাসীর কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ (revelation)। স্বরাজ নানা স্তরে, নানা ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির স্বরাজ, সমাজের স্বরাজ, জাতির স্বরাজ, সামাজিক স্বরাজ, রাজনৈতিক স্বরাজ ও আধ্যাত্মিক স্বরাজ—প্রত্যেকের মধ্যেই ভাগবত শক্তির আত্মবিকাশ ঘটেছে। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা আধ্যাত্মিক স্বরাজের কথা বলেছেন। মানুষ অমৃতের পুত্র, সে ভাগবত শক্তির বিকাশ। সামাজিক স্বরাজের জয়গান গেয়েছেন বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবির প্রভৃতি তাপসেরা। একথা সত্য যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের কোন প্রকার মুক্তি সম্ভব নয়, যে পরাধীন তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সম্ভবপর নয়। কাজেই সকল প্রকার স্বাধীনতার মূল হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। অবশ্য একথা সত্যি যে জাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন অনন্যসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব হয় যাঁরা সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্দ্ধে উঠে, স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য নানাপ্রকার বন্ধনের ফলে তার ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হয়ে ওঠে, সে আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বদ্ধ মানুষ স্বভাবতই ক্ষুদ্র, স্বার্থপর ও সীমিত দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকে। সে অপরের স্বাধীনতাকে ঈর্ষার চোখে দেখে। অনেকের ধারণা, সামাজিক স্বাধীনতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এ মত পোষণ করেন না। আসলে, মানুষের

বুদ্ধির অপ্রতিহত গতি এবং মানুষের আত্মার মহিমময় প্রকাশের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। পরাধীন মানুষের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, যদি জাতি বা ধনকৌলিন্যে সে তার প্রতিবেশীর চাইতে নিজেকে বড় মনে করে তাহলে সে এই শ্রেষ্ঠত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তার সমাজের কথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষের উপর অত্যাচার করে থাকে, তাদের নানাভাবে শোষণ করে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবে সে কুপমণ্ডুকের মত বাস করে, তার দৃষ্টি হয় মোহাচ্ছন্ন, তার কর্ম হয় নানা ভাবে সীমিত। ইতিহাসে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, সে তার ক্ষুদ্র স্বার্থ কিছু কিছু ত্যাগ করতে শেখে। যতদিন সে গোলাম থাকে ততদিন মহত্ত্ব ও উদারতা কি জিনিষ তা সে বোঝে না ; ত্যাগ ও সেবা তার কাছে অর্থহীন শব্দে পর্যবসিত হয়ে থাকে। মানুষের এই পরাধীন অবস্থা যতদিন থাকে ততদিন সামাজিক অভ্যুদয়ের কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য। একথা মনে করলে অবশ্য ভুল হবে যে কয়েকজন যোগীপুরুষ নিজের সাধনার ফলে যদি মোক্ষলাভ করেন তাহলেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার সূচনা হোল। আমাদের চারি পাশে যে অগণিত বুভুক্ষু, দীন অতি মানুষ পশুর চাইতেও অধম জীবন যাপন করছে তাদের অবস্থার কোন প্রকার উন্নতি না করে যদি আমি নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হই, তাহলেও আমি এক হিসাবে গোলামের মতনই ব্যবহার করছি বলতে হবে। ঈশ্বর কখনও বৈষম্যের পথ বেছে নেন না। একদিকে কয়েকজন সাধক মুক্তির প্রশস্ত রাজপথে এগিয়ে চললেন অপর দিকে সহস্র সহস্র মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করল—এ

বিধির বিধান হতে পারে না। তাই শ্রীঅরবিন্দ এমন একটি স্বাধীনতার কথা বললেন যেখানে সমষ্টিগতভাবে সকল মানুষ তাঁদের আত্মিক উজ্জীবনের পথে এগিয়ে চলবেন। সামগ্রিক স্বাধীন জীবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য, ঘৃণা, হিংসা ও কপটতা দূর হবে। এর জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, সেটা হল আত্মিক প্রস্তুতি। আজকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যদি শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার এই দিকটা উপলব্ধি করেন তাহলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করা যেতে পারে।

*

বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য

পশ্চিম-ভারতের সুবিখ্যাত বরোদা রাজ্য। গুজরাতের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এর অনতিদূরে বোম্বাই ও আহমেদাবাদ নগর, তার কোলাহল থেকে দূরে শান্ত সমাহিত এই সহর, জনবহুল ছায়াশীতল রাজপথ, সহরের চারিপাশে বিস্তৃত প্রান্তর। সহরের মধ্যে রাজকীয় গরিমায় মহারাজের কয়েকটি রাজপ্রাসাদ। প্রাণচাঞ্চল্য আছে কিন্তু কোলাহল নেই—এক স্বপ্নময় শান্ত পরিবেশ।

চৌদ্দ বৎসরের ইংলণ্ড প্রবাসের পর ১৮৯৩ সালের প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দ এলেন এই বরোদাতে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডঃ কে. ডি. ঘোষ ভগ্নহৃদয়ে দেহত্যাগ করেন। তিনি মেসার্স গ্রিণ্ড্‌লে এণ্ড কোং কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন, যে স্টিমারে শ্রীঅরবিন্দের ইংলণ্ড ত্যাগ করার কথা সেই স্টিমারখানি, পর্ত্তুগালের উপকূলে লিস্‌বনের কাছে সমুদ্রে ডুবে যায়। এই দুঃসংবাদ পেয়ে স্নেহবিহ্বল পিতৃহৃদয় শোকে দীর্ণ হয়ে যায়। তিনি শ্রীঅরবিন্দের নাম করতে করতে শয্যা গ্রহণ করেন এবং অল্প দু'-একদিনের মধ্যেই শোকাভিভূত হয়ে দেহত্যাগ করেন।

আসলে যে স্টিমারে শ্রীঅরবিন্দের আসার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে ভগবানের অদৃশ্য বিধানে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়, শ্রীঅরবিন্দ স্টিমার পরিবর্তন করে "কার্থেজ" নামে একটি স্টিমারে করে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। স্টিমারখানি সমুদ্রপথে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়লেও কোন দুর্ঘটনা হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ নির্বিঘ্নে বোম্বাইয়ের এ্যাপোলো বন্দরে পদার্পণ করেন। জাহাজ থেকে নেমে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের

মাটিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র সত্তায় অনুভব করেন এক অসীম বিপুল স্তব্ধ শান্তি ও নীরবতা। অধ্যাত্ম-ভারত তার যুগ যুগ সঞ্চিত তপস্যার বৈভব দিয়ে যেন বরণ করে নিল তার পুরুষোত্তমকে। যেন পরোক্ষে স্মরণ করিয়ে দিল, কি মহান দিব্যকর্ম সাধনের জন্য এতকাল ধরে ভারতবর্ষ তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা করে ছিল।

ইংলণ্ডে প্রবাসকালে সাত বৎসর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ একবার অনুভব করেছিলেন, জগতে এক বিরাট পরিবর্তন হতে চলেছে, আর সেই পরিবর্তনে তাঁর রয়েছে এক বিশিষ্ট ভূমিকা। ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করে আর একবার হয়তো তাঁর অন্তরাত্মা স্মরণ করিয়ে দিল সেই কথা।...

১৮৯৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় সার্ভে সেট্‌ল্‌মেন্ট ডিপার্টমেণ্টে যোগ দেন। এরপর কিছুদিন তাঁকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বিভিন্ন বিভাগে কাজ করতে হয়। সেট্‌ল্‌মেণ্ট ডিপার্ট-মেণ্ট থেকে তিনি যান স্ট্যাম্প এবং রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টে, তারপর কিছুদিন মহারাজের সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন।

মহারাজ সোয়াজি রাও একান্তভাবে শ্রীঅরবিন্দের গুণগ্রাহী ছিলেন। কাজকর্ম ছাড়াও উভয়ের মধ্যে এক নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এমনকি মহারাজ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ইংরাজী ব্যাকরণের খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁকে শিখিয়ে দিতে।

বিখ্যাত মারাঠী ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে তাঁরা তিন জন—সরদেশাই, শ্রীঅরবিন্দ এবং সোয়াজি রাও—প্রায়ই একত্রে মিলিত হতেন। মহারাজের অনেক ভাষণ শ্রীঅরবিন্দ খসড়া করে দিতেন। একবার মহারাজ কোন এক সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন, শ্রীঅরবিন্দ ভাষণটি লিখে দিয়েছেন। তিনজনে তাঁরা সেই ভাষণটি পাঠ করলেন। শ্রীঅরবিন্দের লিখিত ভাষণটি এত চমৎকার হয়েছিল যে মহারাজ

বললেন, "Can you not, Arabinda babu tone it down? Is it too fine to be mine."

সরদেশাই আরো বলেছেন, শ্রীঅরবিন্দকে দেখে মনে হ'ত কি এক রহস্যতন্ময়তা তাঁকে সর্বদা মণ্ডিত করে রেখেছে। শান্তি স্থির মৌন আত্মসমাহিত তাঁর ভাব। এক সঙ্গে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েছেন—শ্রীঅরবিন্দ সারাক্ষণ মৌন হয়েই থাকতেন, কোন প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে "হুঁ" অথবা "না" বলে উত্তর দিতেন, তার বেশি একটি কথাও বলতেন না।

এই সময় শ্রীঅরবিন্দ একাগ্র মনে ভারতের অন্তরাত্মার যে বাণী তারই সন্ধান করছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টাতেই সংস্কৃত ভাষা শিখে নিয়েছিলেন, তারপর অধ্যয়ন করতে লাগলেন বেদ বেদান্ত পুরাণ রামায়ণ মহাভারত। ইংরাজীতে তিনি মহাভারতের অনুবাদও করতে আরম্ভ করেছিলেন।

বিখ্যাত সিভিলিয়ন ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত সেই সময় মহারাজের আমন্ত্রণে বরোদায় আসেন। শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ-গুলির কথা কি করে যেন তাঁর কানে যায়। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর অনুবাদগুলি দেখাতে অনুরোধ করেন। শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ পাঠ করে রমেশচন্দ্র সবিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, "ইতিপূর্বে যদি আপনার রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদগুলি আমার চোখে পড়ত তাহলে কখনই আমার অনুবাদগুলি আমি ছাপাতে দিতাম না। আপনার এই অতুলনীয় অনুবাদের পাশে আমারগুলি মনে হচ্ছে যেন ছেলেখেলা।" রমেশচন্দ্রের রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়।

শ্রীঅরবিন্দ তখন বাংলাও ভাল জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, মধুসূদনের কবিতা ইত্যাদি তিনি সহজেই পড়তে পারতেন। তাঁর বাংলা উচ্চারণ সঠিকভাবে আয়ত্তের জন্য

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন। বাংলাভাষায় শ্রীঅরবিন্দের ব্যুৎপত্তি দেখে দীনেন্দ্রকুমার মন্তব্য করেছিলেন, "আপনাকে আর কি বাংলা শেখাব? আপনি নিজেই তো সব শিখে নিয়েছেন।"

দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের বরোদা-জীবনের এক চমৎকার আলেখ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এমন অদ্ভুৎ পাঠানুরাগ আমি আর কাহারও দেখি নাই।···অরবিন্দের পুস্তক কদাচিৎ বুকপোস্টে আসিত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিংবাক্সে বোঝাই হওয়া রেলপার্শেলে পুস্তকগুলি আসিত, এমন পার্শেল মাসে দুই তিনবারও আসিত। অরবিন্দ সেই সকল কেতাব আটদশ দিনের মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন। আবার নূতন নূতন পুস্তকের অর্ডার যাইত।"

বাংলাভাষায় অশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করে শ্রীঅরবিন্দ 'স্বর্ণলতা,' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি পড়েছিলেন। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের লেখা তো পড়তেনই। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ইংরাজীতে কবিতাও লিখেছিলেন। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পুস্তকব্যবসায়ী আত্মারাম রাধাবাঈ সেগুন ও থ্যাকার স্পিঙ্ক কোং শ্রীঅরবিন্দের বেশির ভাগ পুস্তক সরবরাহ করতেন। তাছাড়া কলকাতা থেকে বসুমতী প্রকাশনী ও গুরুদাস পুস্তকালয় থেকেও গ্রন্থ ক্রয় করতেন। আর গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত একটা টেবিল ল্যাম্পের আলোতে একাসনে বসে তপস্বীর একাগ্রতা নিয়ে তিনি সেই সব পুস্তকাবলী পাঠ করতেন। শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, এমনকি অসহ্য মশক্ দংশন পর্যন্ত তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। পড়তে পড়তে এতদূর তন্ময় হয়ে যেতেন তিনি যে আশেপাশের পরিবেশ এবং সবকিছুই ভুলে যেতেন।

শ্রীঅরবিন্দের ছাত্র এড্‌ভকেট শ্রীআর. এন. পাটকার একটি বর্ণনাতে বলেছেন, একদিন সন্ধ্যাবেলা চাকর এসে তাঁর টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে বলে গেল, "সাব, খানা রাখ্‌খা হ্যায়।"

শ্রীঅরবিন্দ শুধু বললেন, "আচ্ছা"।

অনেকক্ষণ পরে চাকর এসে দেখে যে যেমন খাবার তেমনি ঢাকা পড়ে আছে। মনিবকে আর বিরক্ত না করে সে এসে পাটকারকে খবর দিল। পাটকার গিয়ে ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিল খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মৃদু হেসে শ্রীঅরবিন্দ টেবিলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দু'টি খেয়েই আবার পাঠে মন দিলেন।

অনাড়ম্বর সাদাসিদে সরল জীবন-যাপন করতেন শ্রীঅরবিন্দ। সাজ পোষাকে কোন রকম পক্ষপাত ছিল না। তাঁর জীবনচর্যা এতদূর অনাড়ম্বর ছিল যে তাকে কৃচ্ছ্রসাধনই বলা যায়। পরনে সাধারণ আহমেদাবাদী ধুতি, গায়ে আঁটো মেরজাই। পাঁচ-সাত টাকা দামের নীল আলোয়ান তাঁর শীতবস্ত্র। দারুণ শীতেও তিনি লেপ ব্যবহার করতেন না। একখানি কম্বলই যথেষ্ট। সাধারণ লোহার খাট, তার উপরে কোন গদি নেই, কেবল নারকেলের ছোবড়ার আস্তরণ, উপরে মালাবারের ঘাসের মাদুর বিছানো—এই ছিল তাঁর শয্যা। দিনে একবার মাত্র তিনি আহার করতেন, রাত্রে সামান্য এক কাপ দুধ ও দু'একটি কলা—এই হল তাঁর নৈশ আহার। একদিন তাঁর ছাত্র পাটকার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "অমন শক্ত বিছানায় শোন কেন?"

উত্তরে শান্ত হাসি হেসে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেছিলেন, "জানো না, আমি ব্রহ্মচারী? আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর নরম বিছানা ব্যবহার করা নিষেধ আছে।"

দীনেন্দ্রকুমার রায়ও বলেছেন, "যতদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যনিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী

ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না।”

অর্থের প্রতিও তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। ঘরের মধ্যে টেবিলের উপরে একটা ট্রেতে দু’তিন মাসের বেতন ঢেলে রেখে দিতেন। টাকা পয়সা কখনও তালাচাবি দিয়ে বাক্সে তুলে রাখতেন না। খরচপত্রেরও কোন হিসাব রাখতেন না। পাটকার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

“আপনি টাকা পয়সা অমন খোলা অবস্থায় রেখে দেন কেন?”

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি নিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, “আমরা যে সবাই সৎলোকের সঙ্গে বাস করছি, এ থেকে তাই প্রমাণ হয় নাকি?”

—“হিসাব তো রাখেন না, কি করে বুঝলেন যে সৎসঙ্গেই রয়েছেন?”

—প্রশান্ত বদনে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, “আমার হিসাব ভগবান রাখেন। আর যতটুকু প্রয়োজন আমাকে দিয়ে বাকীটা তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। যাই হোক ভগবান যখন আমার কোন, অভাব ঘটতে দেন না তখন কেন আমি ও নিয়ে উতলা হব?···

কিছু দিনের মধ্যেই মহারাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষাদানই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে উপযুক্ত কর্ম, তাই বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। পরে ইংরাজীর অধ্যাপক এবং সর্বশেষে সহকারী অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। টেট্ সাহেব ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল। ছাত্ররা শ্রীঅরবিন্দকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করত। তিনি কলেজ ইউনিয়নের ও ডিবেটিং সোসাইটিরও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

এই সময়ে কেম্ব্রিজের সহপাঠী কে. জি দেশপাণ্ডের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দেশপাণ্ডে তখন বোম্বাইয়ের ব্যারিস্টার, আর ‘ইন্দ্রপ্রকাশ’ নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক।

দেশপাণ্ডের অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৩ সালের ৯ই আগষ্ট থেকে ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। "New lamps for Old" নামে সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলিতে শ্রীঅরবিন্দের গভীর দেশপ্রেম, তেজঃদীপ্ত জ্ঞান ও প্রখর আন্তরাগ্নির বহ্নিস্পর্শে দেশবাসী বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।*

তদানিন্তন কংগ্রেসের নরমপন্থী মনোভাব ও আবেদন-নিবেদনের নিষ্ক্রিয় পন্থাকে শ্রীঅরবিন্দ সমর্থন করতে পারেননি। তাছাড়া কংগ্রেস তখন ছিল কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিষ্ঠান। জাতির হৃদয়ের সঙ্গে, তার অন্তরাত্মার উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে এবং জাতির জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। জাতিকে তাই কংগ্রেস উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করতে পারেনি। এক স্থবির জড়তায় প্রাণহীন মুহ্যমান হয়ে ছিল।

অথচ কি করে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, কি করে দেশের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করা যায় এই ছিল তখন শ্রীঅরবিন্দের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তাঁর লেখনী যেন অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল। কেননা তিনি চেয়েছিলেন দেশমাতৃকার বোধন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে দেশ ছিল জাগ্রত মাতৃস্বরূপা। সহধর্মিণী মৃণালিনীদেবীর নিকট লিখিত পত্রে শ্রীঅরবিন্দ দেশমাতার এক অপূর্ব অভিজ্ঞান দিয়েছিলেন, "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা

* ওই 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রায় একই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। তারই মধ্যে এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন: "What Bengal thinks to-morrow, India will think to-morrow week," এই কথাটিই লোকে গোখলের মুখে বসিয়ে দিয়েছে এই প্রচলিত রূপান্তরে—What Bengal thinks to-day India will think to-morrow.

জড়পদার্থ, কতকগুলি মাঠ ক্ষেত্র পর্বত নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।" তাঁর তখনকার মনোভাবকে ব্যক্ত করেছিলেন এই ভাবে, "My country first, humanity afterwards and the rest nowhere."

তিনি 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তৎকালিন কংগ্রেসকে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে লাগলেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ক্ষুরধার যুক্তি, ভাষার তীব্র শক্তি ও অভাবনীয় বিশ্লেষণী ক্ষমতা এতখানি অমোঘ ছিল যে কংগ্রেসগোষ্ঠীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। মহারাষ্ট্রের মডারেট নেতা গোবিন্দ রাণাডে পত্রিকার সম্পাদক দেশপাণ্ডেকে ভয় প্রদর্শন করে চিঠি দিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের ওই রকম জ্বালাময়ী লেখা যদি প্রকাশ হতে থাকে তাহলে দেশপাণ্ডেকে রাজদ্রোহের অপরাধে শাস্তি পেতে হবে। রাণাডে শ্রীঅরবিন্দকেও বলেছিলেন তিনি যেন রাজনীতির চর্চায় বিরত হন, বরং কারাসংস্কার বিষয়ে কিছু লিখতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দের লেখনীর তূর্যনাদে তখন মডারেট দল যে কতটা ভীত হয়ে পড়েছিল এথেকেই তা বোঝা যায়।

অগত্যা দেশপাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করলেন, তিনি যদি সমালোচনায় কম ক্ষুরধার ভাষা ব্যবহার করেন তো ভাল হয়। এরপরে শ্রীঅরবিন্দ আর তেমন উৎসাহ বোধ করলেন না। যাই হোক, অতি মন্থরভাবে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ওই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি শেষ করেন। শ্রীঅরবিন্দ বুঝতে পারলেন, উপযুক্ত সময় তখনও আসেনি।

দেশপাণ্ডে তারপর ব্যারিস্টারী ত্যাগ করে ১৮৯৮ সালে বরোদার রাজকার্যে যোগ দেন। তিনি এইভাবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিলিত হন। দেশপাণ্ডে সেই সময় নিষ্ঠার সঙ্গে হঠযোগ, আসন, প্রাণায়াম ও বিভিন্ন ক্রিয়াদি অনুশীলন করা আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহজীবনবিমুখ ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের জন্য যে সাধনা তার

প্রতি শ্রীঅরবিন্দ কখনই আকৃষ্ট হতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, জীবন ও জগৎকে পরিত্যাগ করে যে সাধনা তা আমার নয়—"a yoga which required me to give up the world was not for me"। দেশের মুক্তিযজ্ঞের জন্য তিনি চেয়েছিলেন যোগ শক্তিকে আয়ত্ত করে প্রয়োগ করতে—"I learnt that yoga gives power, and I thought why the devil should I not get the power and use it to liberate my country ?"

শ্রীঅরবিন্দ এই সময় দিনে পাঁচ ছয় ঘণ্টা করে প্রাণায়াম করতেন। এর ফলে তিনি তাঁর চিত্তে ও আধারে এক হর্ষোৎফুল্ল শক্তি অনুভব করেন। বিশেষ করে তাঁর কাব্যপ্রতিভা আশাতীত-ভাবে স্ফূর্তিলাভ করে। তিনি বলেছেন, আগে তিনি দিনে ১০।১৫ পংক্তি করে কবিতা লিখতেন, এইভাবে মাসে দুইতিন শ' পংক্তি কবিতা তিনি রচনা করতেন। কিন্তু প্রাণায়াম অভ্যাস করার পর তিনি আধঘণ্টায় দু'শত পংক্তিরও বেশি কবিতা লিখে যেতেন। তাঁর লেখনী-মুখে যেন কাব্যের মন্দাকিনী উচ্ছলধারায় প্রবাহিত হ'ত। তাঁর মস্তিষ্ক ও মন প্রকাশানন্দ চিন্ময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় বরোদার ইঞ্জিনিয়র, তাঁর নাম দেবধার, তিনি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য, তাঁরই যোগাযোগে শ্রীঅরবিন্দ নর্মদার তীরে চান্দোদে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করেন। ব্রহ্মানন্দ সাধারণত মুদ্রিত নয়নে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন, দর্শনার্থীরা নীরবে তাঁকে প্রণাম করে চলে আসত। কিন্তু যখন শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে প্রণাম করলেন, ব্রহ্মানন্দ তখন বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে ছিলেন। হয়তো ব্রহ্মানন্দ তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, কে ওই সম্মুখে তাঁর।

বরোদাতে বিষ্ণুভাস্কর লেলে নামে এক মারাঠী যোগীর সঙ্গেও

শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ হয়। ডাণ্ডি-বাজারের কাছে কাশীরাও যাদবের বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দের সাথে লেলের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় সাহায্য করতে লেলে উৎসাহিত হয়েছিলেন। সর্দার মজুমদারের বাড়ীর উপরতলার ঘরে তিন দিন শ্রীঅরবিন্দ বাইরের সকল সংস্রব ত্যাগ করে নিরালায় লেলের সঙ্গে সাধনায় অতিবাহিত করেন। সেই সময় শ্রীঅরবিন্দের কতকগুলি আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়, যা দেখে লেলে-ও বিস্মিত হয়ে যান। বহুজন্মের সাধনাতেও যে-সিদ্ধি সহজলভ্য নয় এমন সব আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অত অনায়াসে শ্রীঅরবিন্দকে লাভ করতে দেখে লেলে মহারাজ অবাক হয়ে যান। শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর হৃদিস্থিত স্বয়ং ভগবান যে গুরুরূপে পরিচালনা করেছেন এ সত্য লেলে বুঝতে পেরেছিলেন।

বরোদায় একবার নারায়ণ জ্যোতিষী নামে এক বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীঅরবিন্দকে দেখে ভবিষ্যতবাণী করেন। তিনি কোন ঠিকুজিকুষ্ঠি না দেখেই বলেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে তিনবার রাজনৈতিক অভিযোগের বিচার হবে এবং "শ্বেতাঙ্গ শত্রু"দের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে বিপন্ন হবেন। পরবর্তীকালে নারায়ণ জ্যোতিষীর এই কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। অবশ্য সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার কথা ভাবেননি।

এরপরে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে শ্রীঅরবিন্দের সাথে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের সাক্ষাৎ হয়। প্যাণ্ডেলের বাইরে গিয়ে তিলক নিভৃতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের পরই মারাঠাকেশরী তিলকের সঙ্গে মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

তারপর দেখতে দেখতে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র ছড়িয়ে পড়ল ভারতের

মধ্যে সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রে ও বাংলায়। মহারাষ্ট্রে তখন ঠাকুর রামসিং নামে এক রাজপুত মহারাজের নেতৃত্বে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ ঐ সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

এই সময় শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী যুবককে বাংলা দেশে প্রেরণ করলেন উপযুক্ত পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে, দেশময় গুপ্ত সমিতি গঠন করে যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ করে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তুলতে।

যতীন্দ্রনাথকে বিপ্লবী সৈনিক হিসাবে প্রস্তুত করে তুলবার জন্য আগে থেকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বন্ধু কাশীরাও যাদব ও লেফ্‌টনান্ট মাধবরাও প্রমুখ ব্যক্তির সহযোগিতায় তাকে বরোদার সৈন্যবিভাগে ভর্তি করে নেন। যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে ব্যারিস্টার শ্রী পি. মিত্র ও বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সংগঠনগুলি শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করে শপথ পাঠ করে। তখন থেকেই বাংলা দেশে একটা রুদ্ধ বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। গুপ্ত সমিতি গঠন করে সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা তখন মানুষের মনে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথকে সংগঠনের কাজে সহায়তা করবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ তার অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে কলকাতায় পাঠান। যতীন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার ও অবিনাশ ভট্টাচার্য তাঁরা তিনজনে ১০৬নং আপার সার্কুলার রোডে এসে উঠলেন। সেখানে থেকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবের কথা প্রচার করতেন যতীন্দ্রনাথ। আর বারীন ও অবিনাশ সংগঠনের কাজ করতেন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে। তখন দেওঘরেও সত্যেন বসুর নেতৃত্বে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। বহু রাজপুরুষ সরকারী কর্মচারী এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে মাঝে মাঝে এসে এইসব সমিতির

বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে তাদেরকে দেশ-প্রেমের আদর্শে ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। বরোদার কাশীরাও যাদবের ভাই মাধব রাওকে শ্রীঅরবিন্দ নিজব্যয়ে ইংলণ্ডে পাঠান সেখানে সমরশিক্ষা, অস্ত্র সংগ্রহ, ও বোমা তৈরীর কৌশল শিখে আসবার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র দাসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তাঁর নেতৃত্বে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। "বন্দেমাতরম তাঁত শালা" নামে একটি আখড়া করে সেখানে অনেক বিপ্লবী তরুণ থাকতেন, গীতা ও কৃপাণ হাতে দিয়ে হেমচন্দ্র দাসকে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবের শপথমন্ত্র পাঠ করান।

দেখতে দেখতে বিপ্লবের যজ্ঞানলে দেশের আকাশ লাল হয়ে উঠল। জাতির জীবনে সে এক মহা সন্ধিক্ষণ। দেশে তখন এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বাঙালী আবার নতুন করে ক্ষাত্র তেজে, ওজঃশক্তিতে ও বীরত্বে জেগে উঠেছে। উত্তপ্ত বারুদের মত বহ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে জাতির চেতনা।

এই সময় লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইন পাশ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন তপ্তবারুদে অগ্নি সংযোগ ঘটল। বিরাট বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড শক্তিতে জাতির অন্তরাত্মা যেন দারুণ নির্ঘোষে প্রতিবাদ করে উঠল "বন্দে মাতরম"। শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে চলে এলেন বাংলাদেশে। শুরু হল আর এক পর্ব।

*

শতাব্দীর প্রণাম

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১

ব্যক্তির মহত্ত্ব তাঁর মধ্যে নির্ব্যক্তিকের মহত্ত্ব। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। তাঁর ভাবনা অনুভব কর্ম বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। যত বৃহৎ সে-ক্ষেত্র তত উঁচু তাঁর সত্তার মর্য্যাদা; মানব জীবন ও সমাজের গঠনে রয়েছে একটা ক্রমোর্ধ্বগামী আরোহনী। এই স্তরপরম্পরা সংকীর্ণতর সব ক্ষেত্র থেকে উঠে চলে—বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে, ব্যক্তিকে মহত্তর শুদ্ধতর মাত্রার নির্ব্যক্তিকতায় তুলে নিয়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা শুরু করি নিম্নতম ও সংকীর্ণতম ক্ষেত্র দিয়ে—যেমন, পরিবার,—নিজেদের ক্রমে আরো বাড়িয়ে ছাড়িয়ে পরবর্ত্তী ধাপে ওঠা—তা হল দেশ, তারপরে মানবজাতি এবং তাকেও ছাড়িয়ে শেষে তুরীয় পদের সোপানাবলি।

জন্মাবধি শ্রীঅরবিন্দ এই রকম একজন নির্ব্যক্তিক ব্যক্তি কথাটার সেরা অর্থে। সীমাবদ্ধ জনৈক ব্যক্তির চেতনা তাঁর কখনও ছিল না: তাঁর প্রকৃতি ও চরিত্র থেকে এরকম ব্যক্তিগত আধারের চিহ্ন সব মুছে গিয়েছিল। পারিবারিক পরিচয় কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তাও অনেকটা হেলা ফেলায়, পরবর্ত্তী উর্দ্ধতর ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার সম্বন্ধটিরই ওপর জোর দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি। যথাকালে স্বদেশী আধারটি দুর্বার হয়েছিল এবং তার মহৎ কর্ত্তব্য সাধন করেছিল; কিন্তু তারই মধ্যে সে শেষ হয়ে যায় নি, অন্তরালে বিশ্বমানবতা বরাবর প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে। বস্তুত

জাতীয়তার মুক্তিকে এটাই দিয়েছে বৃহত্তর মহত্তর মূল্য। জাতীয়তা তো বিশ্বমানবতায় উঠে যাবার সোপান, তা হল মানবগোষ্ঠীরই এক অঙ্গ বা অংশ। আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বব্যাপী কল্যাণের তা হল এক পন্থা, তবে তারও পরে আছে বৃহত্তর মুক্তি বা আধার, আত্মার মুক্তি বা আধার, তূরীয় চেতনা। প্রকৃতপক্ষে এই বস্তুটিই রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের চেতনার মূলে তাঁর সত্তার অটল ভিত্তি হিসাবে—এটিই দিয়েছে তাঁর জীবনের সমস্ত মহত্ত্ব ও মাধুর্য, অর্থ ও উদ্দেশ্য। যখন বাহিরে প্রকট হয়ে প্রকাশ পায়নি তখনও কিন্তু অন্তরালে এই অশরীরী ব্যক্তিত্ব তেমনি ছিল; এটিই তাঁর সমস্ত জীবনকে দিয়েছিল এক বিশেষ ছন্দ ও ছটা, আদ্যন্ত জীবনকে একটা নূতনত্ব, সজীবতা এবং উদ্দেশ্যমুখী গভীর এক উপাদান—জীবনের প্রথম দিকের সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত। এ যেন সকল জিনিষ অসীমতা ও শাশ্বতের দৃষ্টি দিয়ে দেখা—যে দৃষ্টি, বৈদিক ঋষি যেমন বলেছেন, আকাশব্যাপী প্রসারিত, তৃতীয় নয়ন। অন্য কথায়, শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যোগী, দিব্য নির্ব্যক্তিক মানুষটিই জন্মাবধি আসল মানুষ হয়ে ছিল। তাই তো দেখি যা দিয়ে অপরের সাধনার শেষ ঠিক তাই দিয়েই তাঁর জীবনের যাত্রা শুরু। আন্তর সত্তায় তাঁকে সাধারণের মতো ধাপের পর ধাপ ধরে ক্রমে ক্রমে চেতনা ও স্থিতির প্রসারণের শিখরে উঠতে হয় নি। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ব্যাপারে ও অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'কর্ত্তব্য কর্ম' করে এসেছেন নিঃস্বার্থ ও আত্মবর্জিত ভাবে, কিম্বা বলতে পারি—একান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠায় আসীন থেকে; আজন্ম যোগী, মানব দেবতার স্বভাব ও প্রকৃতিই এই। তাঁর পক্ষে কৃত কর্তব্য কর্ম জীবনক্ষেত্রের সীমানা সর্বদা ছাপিয়ে ছাড়িয়ে যায়, সীমিত সীমার নিষেধের মধ্যে তা যেন একান্ত আবদ্ধ থাকতেই পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা চলে, সাংসারিক জীবনে যখন তিনি আত্মীয়-

স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যখন, তখনও আসক্তি বা পার্থিব বন্ধন দ্বারা অভিভূত আবদ্ধ নন, অবস্থা বিশেষে যা করা কর্ত্তব্য তাই করেছেন—নিরাসক্ত, মুক্ত, অন্য এক আদেশের অধীনে। আবার বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ক্ষেত্র যখন গ্রহণ করেছেন সেখানেও সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকেন নি—তাঁর দেশপ্রেমের প্রশস্ত ভিত্তি সর্বমানবের একাত্মতা, আবার এই উদারভিত্তিক মানবতাও তাঁর অন্তর্নিহিত চেতনার পক্ষে যথেষ্ট সুপ্রসর নয়; মানবতা তো আর শুধু মানবিকতা, দানদাক্ষিণ্য, কৃপা বা মানবসেবা নয়। প্রকৃত মানবতায় পৌঁছান যেতে পারে, পৌঁছান যায়, তাকে আরো দূরে দেবত্বে টেনে তুলে ধরে, যেখানে মানুষ সব শুধু সহোদর কিম্বা ভগবানের অংশ পর্য্যন্ত হয় নি—হয়েছে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন, অনন্য সত্তা ও ব্যক্তিত্ব।

এই রকমে শ্রীঅরবিন্দ আদর্শ কর্মী, কারিগর যিনি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের কাজটি তার নীতি অনুসারে সার্থক করে চলেছেন, নিখুঁত তার প্রয়োগ পদ্ধতি। গৃহী, নাগরিক, স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে নির্দ্দিষ্ট কর্মটি নিষ্পন্ন করেছেন আত্মগত ভাবে কোনো ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের চেতনা বা বোধ না নিয়ে, করেছেন সেই অহংবিমুক্ত নির্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে যা জ্যোতির্ময় বিশ্বচেতনারই লক্ষণ, যার ভিত্তি আরো উর্দ্ধতর এক তুরীয় ধাপে।

শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ গীতোক্তভাবের কর্মযোগী। তিনি দিয়েছেন দৃষ্টান্ত, নিজের জীবনে ধরে দিয়েছেন উদাহরণ কিম আসীত ব্রজেত কিম্—কোন কর্ম করণীয় আর কি রূপে তা কর্ত্তব্য নিজের অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী। এর অর্থ অবশ্য নয় বর্তমানের আধারে বন্দী থাকা, চিরাচরিতে আবদ্ধ কিম্বা প্রচলিত, অস্থায়ী ও আধারে আসক্ত থাকা; বরং আগেই যেমন বলেছি, শ্রীঅরবিন্দ সর্বদাই পদক্ষেপে সীমানা মাড়িয়ে ছাড়িয়ে চলেছেন, তিনি ছিলেন বিপ্লবী,

একরকমের কালাপাহাড় প্রায় তাঁর ভিতরে চেতনার প্রবেগ চরম পরম পরিপূর্ণ সত্যটি ছাড়া কিছুতে তৃপ্ত হত না; এই দিক থেকে উত্তরণের প্রত্যেক ধাপ হয়েছে ঊর্দ্ধতরের দিকে—বলতে হয় প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত ঊর্দ্ধতমের দিকে লম্ফন দিয়ে উঠবার ক্ষেত্র।

এই গহন পরম সত্যটিই তাঁর জীবনের সকল স্তর সকল অবস্থা সকল কর্ম ঘিরে ছেয়ে ছিল; এসব শুধুই নিয়ে চলেছে তুরীয় সত্যে, কিন্তু এই বাস্তবের নিত্য বোধ তাঁর কর্মে দিয়েছে একটা বিশেষ অর্থ ও প্রকৃতি। এই পরম সত্যের দিকে, এই তুরীয়ের দিকে যাবার প্রবর্তনা তাঁর কাছে অতিক্রান্ত স্তরাবলির বর্জন নয়ঃ এ হল সংকীর্ণতর নিম্নতর স্তরকে আত্মগত করে ঊর্দ্ধে তুলে ধরা, ঊর্দ্ধের অঙ্গীভূত করে তোলা; যেমন গাছের শিকড়স্থ মাটি জীবন্ত রসে গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়ে চলে যায় একেবারে চূড়ায়, উপরের আলো ও তেজে।

সমষ্টিগত জীবনে যে স্তরবিন্যাস সেখানে লীলাশৃঙ্খলার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন পরম সত্যের খেলা সেইটিই বাস্তব প্রমূর্ত করে দেখিয়েছেন যা সর্ব অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করে চলেছে। পরম সৎ শুধুই পরম চিৎ নয়, তা আবার তেজ শক্তি; সেখানে এখনো নিহিত এমন এক গোপন উৎস যা আজো ছোঁয়া যায় নি; যাকে মানুষী চেতনা সজ্ঞানে ধরে পার্থিব জীবনের কাজে লাগাতে পারে নি। মানুষী প্রতিভা আজ জড় জগতের এমন এক জড়শক্তির সন্ধান পেয়েছে যা প্রায় অজড়—গ্রহাতীত বিকিরণ লেজার (Laser) রশ্মি এবং সমজাতীয় রশ্মি এবং সমজাতীয় শক্তি, যাদের ক্ষমতার মাত্রা প্রায় অবিশ্বাস্য। তেমনি চেতনার মধ্যে একটা শক্তির পাক আছে যা শুধুই এমন শক্তি নয় যা জানে, কিন্তু সৃষ্টিও করে, আবার কেবল সৃষ্টিই করেনা রূপান্তর পর্য্যন্ত এনে দেয়। যেই শক্তির গাঢ়তম তীব্রতা নিরেট জড়ে প্রবেশ করে তাকে রূপান্তরের পরে প্রদীপ্ত জড়ে পরিণত করে, প্রদীপ্ত স্থূল সৌরালোকে

নয়, ভাস্বর পরম আত্মার জ্যোতিতে। শ্রীঅরবিন্দ এই শক্তিই উদ্ঘাটিত করে মানুষের হাতে দিয়েছেন। তাঁরই দ্বারা শৃঙ্খলমুক্ত এই শক্তি নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করে চলেছে—দারুণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই—আমাদের এই প্রাচীন গোলকটি পুনর্গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত করে, যার অঙ্কে আবির্ভূত হবে সুবর্ণযুগের পৃথিবী।

২

শ্রীঅরবিন্দে, বিশেষ করে, এই নির্ব্যক্তিকতা বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তিকতার পুনর্গঠন। নির্ব্যক্তিকতা অর্থই ব্যক্তিকতা বর্জন নয়—অর্থাৎ গোটা ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত নেতি বা বিনাশ নয়; নির্ব্যক্তিকতার আসল অর্থ অহংয়ের নিঃশেষ, কিম্বা বলতে পারি অহংয়ের পরিবর্তে যথার্থ ব্যক্তিটির স্থাপনা, অহং তো শুধু বিকৃতি অথবা অধঃপতন। অহংবোধ মূলতঃ স্থান নিয়েছে ব্যক্তির মধ্যে; কিন্তু চেতনার না না পর্য্যায়ে নানা স্তরে সমষ্টির বিভিন্ন আধারেও তার অস্তিত্ব রয়েছে। পরিচয়ের ক্রমোচ্চ ধারার উল্লেখ করেছি—তাদের সংশ্লিষ্ট রয়েছে আবার পারিবারিক অহং, জাতীয় অহং, সর্বমানবতার অহং পর্য্যন্ত। সমষ্টিগত অহং ব্যক্তিগত অহংয়ের মতোই দুর্বার। একমাত্র তুরীয় চেতনাতেই—যিনি একমাত্র যথার্থ 'ব্যক্তি' সেই ভগবানের চেতনার মধ্যেই—নিম্নতর সব অহং উন্মূল বা উর্দ্ধায়িত হয়, পায় তাদের সত্যকারের ব্যক্তিকে।

তাহলে, নির্ব্যক্তিকতা লাভের আসল পদ্ধতি হল ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠন; অন্যভাবে বলতে পারি পন্থা হল অহং বস্তুটির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সত্তার যে প্রকৃত সত্য রূপটি তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাতে পুষ্টিলাভ এবং তা-ই হয়ে ওঠা। এর অর্থ ব্যক্তির দিব্যতা অর্জন। ব্যক্তি তখন ব্যক্তিগত ভগবানের মধ্যে নিজেকে ভগবতী করে তোলে এবং পরে—প্রথমে অবশ্য নিজের আন্তর চেতনায়—চতুর্দিকের

আধার বা ক্ষেত্রটিও ভাগবত সৌধে রূপান্তরিত হয়। এমন চেতনার কাছে পারিবারিক মেলারও সংজ্ঞা ও পরিধি ভিন্ন হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি তাঁর যথার্থ সংসারের সম্পর্কে কথাগুলি। একটা দেশও পায় তার দেবসত্তা, ভাগবত প্রেরণার প্রকাশে ফুটে ওঠে একটা তুরীয় ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেক দেশ আবার নিজস্ব ধরণে সার্থক করে বিশ্বলীলার উদ্দেশ্যটি। বেদোক্ত ঋষির 'সহস্রশীর্ষ পুরুষে'র মধ্যে মানবতার এক আমূল পরিবর্ত্তনের ফলে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই চিত্র—প্রমূর্ত্ত করেছেন নিজের চেতনায় তথা বিশ্বচেতনায়ও। ভবিষ্যকাল বিশ্বপুরুষের (কিম্বা বিশ্বপ্রকৃতি, বলা চলে) ভিতরে এই তুরীয় রচনাকে প্রস্তুত রেখেছে—দিন আগত যখন এই নব সৃষ্টি পৃথিবীর বুকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। সেই পরমে—পরব্রহ্মে—অনাদিকাল থেকে যাবতীয় জিনিষের সত্যটি নিহিত : সমস্যা হল কখন কী রূপে তাকে নামিয়ে আনতে হবে। যিনি তা করেন তিনি অবতার—যিনি অবতরণ করেন, তাকে সশরীরে ধারণ করেন।

পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়—নির্ব্যক্তিকতা লাভ অর্থ কিম্বা তার পরিণতি হল দিব্যতালাভ—ঊর্দ্ধ থেকে পরম ব্যক্তির, ভগবানের অবতরণ, অথবা অন্তরে তার আবির্ভাব (দুটি একই জিনিষ)—যার ফলে নিম্নতর ও স্থূল যত রূপায়তন ও গঠন তাদের গ্রহণ ও পরম সদ্বস্তুর মধ্যে আত্মস্থীকরণ যাতে এক অভিন্ন আধার ও ব্যক্তিত্ব লাভ হয়।

শ্রীঅরবিন্দের চেতনার তাৎপর্য এই রকম, নূতন ভাগবত বিশ্বের এই সংসিদ্ধর অভিমুখ এ চেতনার প্রভাবে কাজটি যে চলেছে তার প্রকৃতি এই।

শেষ করছি তাহলে যা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম সেখানে, যা

বলেছিলাম তার সুস্পষ্ট ঘোষণায়—মহতের মহত্ব মধ্যেকার দেবত্বের মহত্বে।

উপসংহারে পুনরুক্তি করি তাঁরই কথায়—কী তিনি ও কি তাঁর কাজ, মর্ত্য ও মানুষের জন্য কী তাঁর প্রতিশ্রুতি—

সব তখন পরিবর্তিত হবে
যাদুময় শৃঙ্খলা এক আসবে
এই যান্ত্রিক বিশ্বসৃষ্টির উপর ছেয়ে
মর্তের জগতে এসে বাস করবে
অধিকতর শক্তিমান জাতি এক
প্রকৃতির জ্যোতির্ময় চূড়ায় চূড়ায়
অধ্যাত্মের প্রতিষ্ঠায়
অতিমানুষ জীবনের রাজা হয়ে
শাসন করবে
পৃথিবীকে স্বর্গের প্রায় সহরে
সমরূপ করে ধরবে
আর মানুষের অজ্ঞান হৃদয়কে
নিয়ে যাবে স্বর্গের দিকে
সত্যের দিকে।
আর মানুষের মর্ত্য প্রকৃতিকে
তুলে ধরবে দেবত্বের দিকে।
প্রকৃতি বর্তে থাকবে প্রচ্ছন্ন
ভগবানকে প্রকাশ করবার জন্য
চিন্ময় পুরুষ মানুষী লীলায়
যোগ দেবে
এই পার্থিব জীবন হয়ে উঠবে
দিব্য জীবন।

মানুষীং তনুম্ আশ্রিতঃ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

মানুষীং তনুম্ আশ্রিতঃ—এই ভাবনা অবতারতত্ত্বের বীজ। এক-কথায়, যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ, তিনিই বিশ্বরূপ হয়েছেন, বিশ্ব তাঁর বিসৃষ্টি এবং অবতার।

অবতরণের দুটি রীতি—একটি মুমুক্ষু জীবরূপে, আরেকটি নিত্য মুক্ত শিবরূপে।

একটি universal incarnation, আরেকটি বিশ্বের প্রয়োজনে বিশিষ্ট যুগসন্ধিতে তাঁর সম্ভূতি—যাকে বলা যায় divine intervention বা পরমপুরুষের শক্তিপাত। এই দুটি ভাবনা ওতপ্রোত।

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের মূলে কাজ করছে দ্বিতীয় রীতিটি। কারণ তাঁর দিব্য জন্ম বিশ্বহিতের জন্য হলেও একটি বিশিষ্ট দেশে এবং কালে—যুগসন্ধিতে।

এইজন্য তাঁর ভাবনায় এসেছে একটা বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি। তার স্থান ভারতবর্ষ এবং কাল বিংশ শতাব্দী। তাঁর জন্মতিথিতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল—এই ঘটনার মূলে বিধাতার একটি নিগূঢ় অভিপ্রায়ের দ্যোতনা রয়েছে এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁর প্রদত্ত বাণীতে তিনি তাঁর আজীবন-লালীত পঞ্চস্বপ্নে তাকে রূপায়িত করেছেন।

বাল্যকালে শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্য ভাবনার আওতায় এসেও তাঁর অন্তর সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্যভাবনায় উদ্বুদ্ধ—এটি একটি গূঢ়ার্থ বহন করছে।

একই আর্যমনের দুটি প্রকাশ—বৈজ্ঞানিক ভাবনায় এবং

অধ্যাত্মসাধনায়। প্রকৃতি-পুরুষের যুগনদ্ধতার মত দুটি এসে সঙ্গত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে একটি সংবর্তুল ভাবনায়। তাইতে জড়বাদ এবং চিদ্‌বাদের সমন্বয় সাধন তাঁর দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য।

আবার ব্যক্তি জীবনের বিশিষ্ট লক্ষ্যকে ধাপে-ধাপে বিশ্বজীবনে উত্তীর্ণ এবং বিশ্বোত্তরে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর যোগজীবনের লক্ষ্য। তাঁর কাছে সমস্ত জীবনটাই যোগ এবং সে-যোগ একার জন্য নয়—সবার জন্য। মুক্তিতে তার আদিপর্ব, আর অন্তিম পর্ব সিদ্ধিতে।

এককথায় তিনি মানব-পুরাণের প্রবক্তা। তাঁর প্রতিভা তাই যেমন বিশ্বতোমুখ, তেমনি বাচস্পত্য। অন্তর্গূঢ় ভাবনা প্রথম অভিব্যক্ত হয় অসাধারণ বাণীতে এবং তার চিন্ময় প্রবেগ কর্মে শক্তি সঞ্চার করে জীবনকে সর্বতো ভদ্র এবং সার্থক করে তোলে—এই তার রীতি। বাণীর এই লোকোত্তর প্রবেগই শ্রীঅরবিন্দে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাহিত্যে এবং দর্শনে—ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।

ভারতবর্ষের আবহমান চিন্তাধারার গভীরেও আছে এমনিতর একটা বিশ্বতোমুখীনতার প্রবেগ। এবং তাইতে শ্রীঅরবিন্দ বস্তুতই স্বদেশ আত্মার বাণী-মূর্তি এবং তাঁর স্বদেশ বিশ্বমানবের আত্মাভিব্যক্তির গঙ্গোত্রী যার প্রবাহ চলেছে এক মহাভবিষ্যের সাগরসঙ্গমের দিকে।

*

শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী শতবার্ষিকী

শ্রীহিমাংশু নিয়োগী

১৯৭২ সাল—শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী শতবার্ষিকী। এই বৎসরটি জগতের কাছে এবং আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে এক দিব্য মাধুর্য। যেদিক দিয়েই তাকাই না কেন, আমরা আজ মানব সভ্যতার এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। পৃথিবী যেন মোড় ঘুরে এসে পড়েছে এক বিরাট পরিবর্তনের রূপান্তরের মুখে। যখন পুরাতন প্রতিষ্ঠা সব নড়ে যায়, দেখা দেয় দারুণ বিশৃঙ্খলা। কিন্তু এই হল আবার অপূর্ব সুযোগ যখন মানুষ সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভবিষ্যতকে স্বাগত জানায়, গড়ে তোলে নতুন জগৎ, নতুন জীবন।

যুগ সঙ্কটের এই বেগ এ যেন মানব সভ্যতার এক মূলাধার-শক্তি, তার সুপ্তির কুণ্ডলী মোচন করে ক্রমশ জাগ্রত হয়ে উঠছে। এই যে শক্তি, মানুষের মধ্যে যে মহামানব, এ হল তার তপস্যা।

যুগের এই বর্তমান অবস্থার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে। কেননা সমগ্র বিশ্বমানবের ভিতর দিয়ে যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির যে বিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, সৃষ্টি যে লক্ষ্যকে উদ্দেশ্যের দিকে চলেছে, সমগ্র জগতের সেই মূলীভূত তপস্যাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আপন তপস্যা বলে গ্রহণ করেছেন। কেননা শ্রীঅরবিন্দের সাধনা তাঁর নিজের জন্য নয়; তিনি সাধনা করেছেন সমগ্র জগতের জন্য, সকল মানুষের জন্য। প্রকৃতির মধ্যে যে একটা ঘুমন্ত অর্ধচেতন শক্তি একান্ত শিথিলভাবে কাজ করে চলেছে, শ্রীঅরবিন্দ তপস্যা করেছেন তার মধ্যে একটা উদ্‌জীবনের বেগ সঞ্চার করে দিতে, যাতে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের ধারা

অতি দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাতে পারে।

কি সেই অভীষ্ট লক্ষ্য? শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এই সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে প্রকৃতি সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে ক্রমবিকাশের পথে। কোথাও সে থেমে যায়নি। বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে আমরা দেখব, মূলে ছিল সব জড়। ক্রমে এমন একটা অবস্থা এল যখন জড়ের মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, জড় হয়ে উঠল সজীব, এল উদ্ভিদ জগৎ। আস্তে আস্তে তার মধ্যে ফুটে উঠল চেতনা, দেখা দিল জন্তু। ক্রমে জন্তুর চেতনাও আরো মুক্ত আরো সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। সহজাত সংস্কার ইন্দ্রিয়বোধ নিয়ে এল স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তার ঝলক। আবির্ভাব হল মানুষের। কিন্তু মানুষই বিবর্তনের শেষ কথা নয়। মানুষের মধ্যে এসেই যে প্রকৃতির বিবর্তন থেমে যাবে এমন কথার কোন যুক্তি নেই। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, মানুষ হল "transitional being"। প্রকৃতির ভিতরে যে শক্তিবেগ একের পর এক স্তর পার হয়ে এসে আজ মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সেই একই বেগ মানুষের অন্তরেও কাজ করে চলেছে। বরং তারা আরো সচেতন হয়েছে, আরো একমুখী সামর্থ্য অর্জন করেছে। জড়, প্রাণ ও মন—এই যে তিনটি তত্ত্ব এ পর্যন্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, সে সবই মানুষ নিজের মধ্যে সংহত করে ধরেছে। সে তাই আজ হয়েছে মনোময় পুরুষ, প্রাণ শরীরের নেতা। কিন্তু মনই তো শেষ কথা নয়। মনের ঊর্ধ্বেও রয়েছে আরো সব তত্ত্ব, আরো সব শক্তি ও সম্ভাবনা। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, বিবর্তনের অনিবার্য গতিতে মানুষ তার মনের ঊর্ধ্বে লাভ করবে এক মানসোত্তর চেতনা, হয়ে উঠবে "অতিমানব"।

ভবিষ্যতের সেই সম্ভাবনা মানুষের জীবনকে আজ চাপ দিয়েছে প্রচণ্ড। সেই চাপে তার ব্যক্তি জীবন তার সমষ্টি জীবন অন্তরে

বাহিরে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। একে বলতে পারি বিবর্তনের সঙ্কট—evolutionary crises। বর্তমান এই মানুষের ভিতর থেকেই এক নূতন মানবজাতি গড়ে উঠেছে তার অন্তরস্থ ভাগবৎ সত্তা হতে। নূতন এক সমাজ তার ভাবী সব গঠনধারা নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে অন্তরাত্মার আলো নিয়ে। এক কথায় বলা যায়, মানুষ অগ্রসর হয়ে চলেছে সে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য।

বিগত শতবর্ষের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখব, শ্রীঅরবিন্দ সারা জীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখেছেন, যে সাধনা করেছেন, জগতের মধ্যে ধীরে ধীরে তাই সফল হয়ে উঠছে। মানুষের জীবনের সকল অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে ঘটে চলেছে অভূতপূর্ব সব পরিবর্তন। অবশ্য আজ যেটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি তা ভবিষ্যত পূর্ণতারই প্রস্তুতি ও প্রতিশ্রুতি। নূতন এক দৃষ্টি নিয়ে আগাগোড়া জীবনের সব কিছুকে দেখবার বিচার করবার যাচাই করবার সব তাগিদ দেখা দিয়েছে। নূতন আকারে নূতন ভাবে প্রকাশ করতে চাইছে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে। পুরাতন ভাবধারা, মূল্যবোধ, অভ্যাস, ধারণা সব আজকের পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে অকেজো হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের গড়া জগৎটাই যেন ভেঙে পড়ছে। কারণ বিগত দিনের জীবনের কাঠামোটা গড়ে উঠেছিল মানুষের মন-বুদ্ধির উপরে। মনের অসম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে গড়া ভাল-মন্দের সাময়িক নীতিধর্মের উপরে। কিন্তু মানুষ আজ তার মনের ভূমি ছাড়িয়ে উঠে চলেছে মানসোত্তর লোকে এক বৃহত্তর প্রসারের মধ্যে। তাই মন-বুদ্ধির ক্ষুদ্র সীমাটা তার ভেঙে যাচ্ছে।

মানুষের ভবিষ্যত জীবন দাঁড়াবে, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, বুদ্ধির উপরে নয়, বলের উপরে নয়, এমনকি নীতিধর্মের উপরেও নয়, জীবন দাঁড়াবে মানসোত্তর জ্ঞানের উপরে। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন

অতিমানস supermind। মানুষ নির্ভর করবে তার মনের উপরে নয়, তার অন্তরাত্মার উপরে, সত্যের উপরে।

পুরাতন সমাজ এতকাল তার মন-বুদ্ধিকে আশ্রয় করে চলে এসেছে পরস্পর প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে। তা থেকে উথলে উঠেছে যত বিদ্বেষ হিংসা আর সংঘর্ষ। কিন্তু নতুন সমাজ গড়ে উঠবে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে নয়, এমনকি সহযোগিতার ভিতর দিয়েও নয়, তা হবে সহধর্মীতার একাত্মতার ভিতর দিয়ে। কারণ অন্তরাত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষ হল মর্মে মর্মে এক ও একাত্ম।

অন্তদৃষ্টির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে মানুষের বাইরের জীবনটাই পালটায় তাই নয়, পাল্‌টে যায় তার ভিতরটাও। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের জীবনের কেবল বাহিরের পরিবর্তনই চাননি— তিনি চেয়েছেন তার অন্তরাত্মারও আমূল পরিবর্তন। মানুষ কেবল যে একটা নূতন জীবন লাভ করবে তাই নয়, সে তার মানুষী আত্মাকেও অতিক্রম করে যাবে। সে লাভ করবে দেবের আত্মা। স্বর্গরাজ্যের সত্যযুগের যে কল্পনা মানুষ এতকাল করে এসেছে তা অল্পবিস্তর এই রকম। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে জীবনের এক মহৎ প্রয়াস, এক অপরাজেয় অভিযান। যা তার সমগ্র জীবনকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বোঝাতে চেয়েছেন যখন তিনি বলেছেন, সমগ্র জীবনই যোগ— "All life is yoga"।

"স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি" শ্রীঅরবিন্দের এই বাণী হল জগতের কাছে ভারতবর্ষের বাণী। শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করেছেন সমগ্র জগতের তপস্যা আর ভারতবর্ষ হয়েছে সেই তপস্যার যজ্ঞগৃহ—জগতের শক্তিপীঠ। কারণ বহু সাধনার বহু আরাধনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ দেখেছে এই জীবনকে অতিক্রম করে আরো সব বৃহত্তর জীবনের

পরিমণ্ডল—ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডকে অতিক্রম করে বিপুল শক্তির সব ব্রহ্মাণ্ডকে, দেখেছে সকলের উপরে উদ্ভাসিত দিব্য চেতনার জ্যোতি ও মহিমাকে। তারই কল্যাণে সে পেয়েছে অন্তরাত্মার বল, মনের বল, প্রাণের বল। সেই বলে ভারতবর্ষ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে মানুষের অন্তরের দেবত্বকে। বলেছে, মানুষ দেবতা, সে স্বর্গকে অধিকার করতে পারে।

ভারতবর্ষ জগৎকে দেবে এই মহাবাণী। আর এই বাণীকে সার্থক করার জন্য দেবে তার যোগশক্তি। ভারতের এই যোগ-শক্তিকে জাগ্রত করে তুলতে শ্রীঅরবিন্দ সাধনা করেছেন। তাই আমরা দেখি, শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ সাধনা আর তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা এক হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে জাগ্রত মাতৃস্বরূপা—মা, ভবানী ভারতী। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের মুক্তি না হলে সারা পৃথিবীরও মুক্তি নেই। সমগ্র জগতের প্রতীক হল এই ভারতবর্ষ। তাই শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন ভারতের মুক্তি, এসিয়ার মুক্তি, সমগ্র মানবজাতির মুক্তি, আর সেই নব জাগ্রত মানুষের জয়যাত্রার অগ্রদূত হবে ভারতবর্ষ। ভারত হবে পৃথিবীর গুরু। তিনি দেখেছিলেন ভারতবর্ষের মধ্যে এক অখণ্ড সার্বভৌম শক্তি। তা কেবল কোটি কোটি ভারতবাসীর সম্মিলিত সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি নয়, তা হল সমস্ত ভারতের মাটি থেকে মানুষ পর্য্যন্ত, স্থাবর জঙ্গম চরাচর আধারের একটি জীবন্ত ঐক্য শক্তি—অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ভারত মাতা—Mother India। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সত্যকার স্বাধীনতা, যাতে জগতের কাছে সে খাঁটি উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের মানবজাতি কি হবে তার জাগ্রত প্রমাণ রূপে।

ভারত এক সময় স্বাধীন হল বটে, কিন্তু তার সেই জীবন্ত ঐক্যরূপ সে লাভ করতে পারল না। এল বিভক্ত দীর্ণ খণ্ডিত স্বাধীনতা। এই বিভেদ জন্ম দেয় গ্লানি, বিভেদ আনে বিদ্বেষ। তাই ১৯৪৭ সালে

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীতে বললেন, "But by whatever means, the division must and will go।" তিনি বললেন, এ হতে পারে না। জাতি কখনই এটাকে একটা সাময়িক ব্যবস্থার চেয়ে বেশি মূল্য দেবে না,—"the nation will not accept the settled fact as forever settled or as anything more than a temporary expediency"।

শ্রীঅরবিন্দের এই বাণীর ২৪ বৎসরের মধ্যেই আমরা দেখেছি, জাতি তার নিজের মধ্যে গড়া যতসব মিথ্যার প্রাচীর ভেঙে ফেলছে। এক ঐক্যমুখী শক্তি দুর্বার হয়ে উঠেছে। কারণ ভারতের ঐক্য ভারতের সংহতি ভগবদ্ অভিপ্রেত। তাই তো এক দুর্জয় শক্তি আজ দেশকে জাগিয়ে তুলেছে, যা নিয়ে যাবে মুক্তির সম্মেলনের সত্যকার মহত্ত্বের দিকে।

ভারতবর্ষ জগৎকে দেখাবে, একমাত্র সত্যের উপর নির্ভর করেই সত্যকে আশ্রয় করেই বাঁচা যায়; কেবল ধ্যানে ও সাধনায় নয়, কর্মে জীবনে সমাজে এবং রাষ্ট্রেও। ভারতবর্ষ জগৎকে দেবে এক নতুন জীবনের দৃষ্টান্ত—সে হল সত্যের জীবন, সত্যময় জীবন। ভারতবর্ষ প্রমাণ করে দেবে, কোন মানুষ কোন দেশ যত শক্তিমান যত অর্থবানই হোক না, তার সকল জ্ঞান বল ঐশ্বর্য যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে সে হবে অন্তরসারশূন্য—মহাশূন্যে একটা ফুৎকারের মত।

একমাত্র সত্যকে ধরেই সত্যের পথে চলা যায়। অন্ধকার দিয়ে যেমন অন্ধকার দূর করা যায় না, অন্ধকার বিদূরিত করতে হলে চাই আলো; তেমনি এই মিথ্যার প্রমাদের জীবন থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে, মিথ্যাকে ধরে নয়, শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, ভারতবর্ষকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। সত্যের মহাশক্তিকে আশ্রয় করা ছাড়া মানুষের আর কোন সাধ্য নাই।

তাই এই নিরালোকের মধ্যে সত্যের জ্যোতিকে নামিয়ে আনবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ সাধনা করেছেন, মানুষের মধ্যে যাতে সত্যের তপঃবীর্য জাগ্রত হয়। শ্রীমা-ও তাঁর যোগশক্তি দিয়ে অতন্দ্র সাধনা দিয়ে জগতের উপরে সেই মহাসত্যের অবতরণে সাহায্য করেছেন। তিনি বারবার সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, সত্যকে বরণ করে না নিলে জগৎ রসাতলে যাবে—

"Men, countries and continents !
The choice is imperative
Truth or abyss."

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের যোগসাধনা এক শক্তিসঞ্চারী বেগ নিয়ে মানুষের অন্তশ্চেতনার রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। আমাদের সাধারণ দৃষ্টি যা দেখতে পায় না সেই আধ্যাত্মিক নেপথ্য লোকে ঘটে গেছে এক বিরাট বিপ্লব। জগতের উপর পরমাশক্তির—অতিমানসের জ্যোতির আবির্ভাব হল তার তারণস্পর্শ নিয়ে।

এক নতুন যুগ আসছে, আসছে নতুন মানুষ। এই দেশকে এবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে ভগবদ্ সংসিদ্ধির কথা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করেছেন তার অগ্রদূত ও পথিকৃৎ হতে। এ হল দেব মুহূর্ত—Hour of God—যখন মানুষের মধ্যে বিচরণ করে চিন্ময় দেব। যখন ভগবানের মুখের সুরভি আমাদের জীবন সাগরের উপরে ছড়িয়ে পড়ে। এখন কেবল প্রশ্ন হল আমরা কে কতটা প্রস্তুত সেই অবশ্যম্ভাবীকে স্বাগত করতে, গ্রহণ করতে, তার অংশভাগী হতে? আজ মানব ইতিহাসের এক বিরাট পটপরিবর্তন হতে চলেছে, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলি—

"A few shall see what none yet understand ;
God shall grow up while wise man talk and sleep ;
For man shall not know the Coming till its hours
And belief shall be not till the work is done."

*